একুশ শতকের জনপ্রশাসন

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন
প্রতিবেদন

১ম খন্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
সমীপে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০০০

সৌজন্যে

এ টি এম শামসুল হক
চেয়ারম্যান
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

একুশ শতকের জনপ্রশাসন

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন
-এর প্রতিবেদন

১ম খন্ড

প্রেরণপত্র

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রথম পর্যায়ের মোট ৩ খন্ড প্রতিবেদন সানন্দে আপনার নিকট উপস্থাপন করছি।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে প্রদত্ত মোটামুটি দায়িত্বগুলো হলো স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ন, বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন, অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোধ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ পুণর্গঠন, দুর্নীতি রোধ, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও জনবল সুষমকরণ, এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদীয় পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আইনগত, নিয়ন্ত্রণমূলক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনে পরামর্শ প্রদান করাও কমিশনের কাজের আওতাভুক্ত।

কমিশন ব্যাপক মতৈক্যের ভিত্তিতে সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের কৌশল গ্রহণ করে। সাধারণভাবে জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের চেয়ে প্রথমে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কার বিষয়ে মতৈক্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সুপারিশ প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে সেগুলোর বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য দলমত নির্বিশেষে গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এজন্য অন্যান্যের মধ্যে রাজনৈতিক দলের, শিক্ষক সমাজের, এবং বেসরকারী সংস্থা ও এনজিওদের প্রতিনিধি, এবং সাংবাদিক, বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডার সমিতি ও সাধারণ নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করা হয়; প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ক একটি প্রশ্নমালা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় ও কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া হয়; ওয়ার্কশপ, ফোরাম, মতবিনিময় সভা, শিক্ষা সফর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করা হয়; এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে এমন এক সময় সরকার এ কমিশন গঠন করেন যখন সমগ্র বিশ্ব *নতুন জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা (New Public Management - NPM)* -এর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তুলনামূলকভাবে ভাল ও সহজপ্রাপ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্ভাব্যক্ষেত্রে *আউটসোর্সিং (outsourcing)* ও *কন্ট্রাকটিং আউট (contracting out)* -সহ যোগ্যতাভিত্তিক ফলাফলমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করছে। এনপিএম ধারণার আলোকে এ প্রতিবেদনে সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারী সেবাপ্রদান উন্নতকরণ, পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর *ফাংশনাল ক্লাষ্টার (functional cluster)* গঠন এবং আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব নিরসন, চাকরিতে সুযোগের সমতা সৃষ্টি ও দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ বিধানের লক্ষ্যে *সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (Senior Management Pool - SMP)* গঠনের প্রস্তাব; জনপ্রশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিতকরণ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনবল সুষমকরণ, আরও শক্তিশালী - দীর্ঘ মেয়াদে স্বাধীন - দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, প্রশাসনের উপর কার্যকরী সংসদীয় পর্যবেক্ষণ, বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ ও সরকারের সংস্কার কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে এবং এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৩৭টি সুপারিশ (অন্তর্বর্তীকালীন - ৩০, স্বল্পমেয়াদী - ৭০ ও দীর্ঘমেয়াদী - ৩৭) বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন গঠন। এ সকল সুপারিশমালার ফলাফল পাওয়া যাবে এগুলোর বাস্তবায়নে, যা যে কোন সংস্কার কর্মসূচীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কঠিন কাজ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সরকার কর্তৃক অথবা উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শক্রমে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত একুশটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে যার বড় অংশ

অবাস্তবায়িত থাকার ফলে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে অনেক দেশের চেয়ে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। আমরা আশা করি যে, একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের সাথে প্রশাসনকে খাপ খাওয়ানোর জন্য সরকার এ সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের আরও বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য যে, সরকার কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহ ক্রমান্বয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিবেচনার মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছেন।

প্রশাসনিক সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সমর্থন অপরিহার্য।

যদি চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়, তবে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা এ বিশেষ দিকটির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কমিশনের কার্যপরিধি সংস্কার কার্যক্রমের ব্যাপক পরিসর অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় রয়েছে। দু'বছর সময়ের মধ্যে কার্যপরিধির সকল বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা কঠিন কাজ। কমিশনের সদস্য ও কমিশনে কর্মরত স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এবং ইউএনডিপি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রশাসনিক সংস্কারের উপর এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কমিশন এখনো অর্পিত সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। অন্যান্য অসম্পন্ন কাজ, যার মধ্যে রয়েছে কর্পোরেশন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের উপর সংস্কার প্রস্তাব, প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সকল প্রতিবেদনেই কম-বেশী সীমাবদ্ধতা থাকে। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে কোন ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়-দায়িত্ব আমাদের।

তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান যুগে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দের ঊষালগ্ন উপযোগী প্রশাসনিক সংস্কারের উপর বিবেচিত মতামত প্রদান ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সুপারিশ প্রণয়নের যে গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার আমাদের উপর অর্পন করেছেন, সে জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

স্বাক্ষরিত ঃ ২৫শে জুন ২০০০

এ টি এম শামসুল হক
চেয়ারম্যান

সদস্য

খন্দকার আসাদুজ্জামান

কাজী সামসুল আলম (২৫/৬/২০০০)

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন (২৫/৬/২০০০)

ডঃ আকবর আলি খান

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী

ডঃ নাজমুন্নেছা মাহ্‌তাব

সদস্য

এডভোকেট মোঃ রহমত আলী

ডঃ এস এ সামাদ (২৫/৬/২০০০)

মোহাম্মদ ইনামুল হক

অধ্যাপক ডঃ এস এম নজরুল ইসলাম

মুহঃ খালেদ শাম্‌স

আমিনুল ইসলাম

আল-আমীন চৌধুরী
সদস্য-সচিব

শব্দসংক্ষেপ ও আদ্যোক্ষরসূচক শব্দের তালিকা

এসিসি (ACC)	: দুর্নীতি দমন কমিশন (Anti-Corruption Commission)
এসিএমএম (ACMM)	: অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম (Additional Chief Metropolitan Magistrate)
এসিআর (ACR)	: বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (Annual Confidential Report)
এডিএম (ADM)	: অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (Additional District Magistrate)
এডিপি (ADP)	: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Annual Development Programme)
এপিআরএ (APRA)	: বার্ষিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন মূল্যায়ন (Annual Performance Report Appraisal)
এআরসি (ARC)	: প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (Administrative Reorganisation Committee)
এএসআরসি (ASRC)	: প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটি (Administrative and Services Reorganisation Committee)
বিএসি (BAC)	: দুর্নীতি দমন ব্যুরো (Bureau of Anti- Corruption)
বিসিএএস (BCAS)	: বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (Bangladesh Centre for Advanced Studies)
বিসিএস (BCS)	: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (Bangladesh Civil Service)
বিসিএসআইআর (BCSIR)	: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research)
বেপজা (BEPZA)	: বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Export Processing Zones Authority)
বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA)	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Inland Water Transport Authority)
বিওআই (BOI)	: বিনিয়োগ বোর্ড (Board of Investment)
বিপিএটিসি (BPATC)	: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Bangladesh Public Administration Training Centre)
বিআরটিসি (BRTC)	: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (Bangladesh Road Transport Corporation)
বিএসসিআইসি (BSCIC)	: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation)
বিটিটিবি (BTTB)	: বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (Bangladesh Telegraph & Telephone Board)
বিডব্লিউডিবি (BWDB)	: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Water Development Board)
সিএণ্ডএজি (C&AG)	: মহাহিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক (Comptroller and Auditor General)
সিবিএ (CBA)	: কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট (Collective Bargaining Agent)
সিইও (CEO)	: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Chief Executive Officer)
সিআইএস (CIS)	: স্বাধীন দেশসমূহের কমনওয়েলথ্ (Commonwealth of Independent States)
সিজেসি (CJC)	: ক্রিমিনাল জাস্টিস কমিশন (Criminal Justice Commission)
সিএলআই (CLI)	: জীবন যাত্রা মান সূচক (Cost of Living Index)
সিএমএম (CMM)	: মুখ্য মহানগর হাকিম (Chief Metropolitan Magistrate)
সিপিডি (CPD)	: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (Centre for Policy Dialogue)
সিএসপি (CSP)	: সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (Civil Service of Pakistan)
ডেসা (DESA)	: ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (Dhaka Electric Supply Authority)
ইসি (EC)	: প্রাক্কলন কমিটি (Estimate Committee)
ইসিএনসিএসটি (ECNCST)	: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাতীয় কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee of the National Council for Science and Technology)
ইসিএনইসি (ECNEC)	: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee of National Economic Council)
ইপিজেড (EPZ)	: রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone)
এফবিসিসিআই (FBCCI)	: ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries)
এফডিআই (FDI)	: বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment)
ফেমা (FEMA)	: ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এ্যালায়েন্স (Fair Election Monitoring Alliance)

এফআইএ (FIA) : তথ্য স্বাধীনতা আইন (Freedom of Information Act)
এফএমএ (FMA) : আর্থিক ব্যবস্থাপনা একাডেমি (Financial Management Academy)
এফওয়াই (FY) : অর্থ বছর (Financial Year)
জিডিপি (GDP) : মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product)
জিওবি (GOB) : বাংলাদেশ সরকার (Government of Bangladesh)
জিপি (GP) : গ্রাম পরিষদ (Gram Parishad)
এইচকিউ (HQ) : সদর দপ্তর (Head Quarter)
আইএএস (IAS) : ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (Indian Administrative Service)
আইসিএসি (ICAC) : স্বাধীন দুর্নীতি দমনে কমিশন (Independent Commission Against Corruption)
আইসিএস (ICS) : ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service)
আইসিইউ (ICU) : ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোল ইউনিট (Independent Control Unit)
আইজিপি (IGP) : মহা পুলিশ পরিদর্শক (Inspector General of Police)
আইআইএম (IIM) : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (Indian Institute of Management)
আইএমইডি (IMED) : বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (Implementation Monitoring & Evaluation Division)
আইও (IO) : তদন্তকারী কর্মকর্তা (Investigating Officer)
আইপিএস (IPS) : ইন্সটিটিউট অফ পলিসি স্টাডিজ (Institute of Policy Studies)
আই আর (IR) : অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ (Interim Recommendation)
আইটি (IT) : তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)
আইটিইউ (ITU) : তথ্য প্রযুক্তি ইউনিট (Information Technology Unit)
এলএএন (LAN) : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network)
এলজিসি (LGC) : স্থানীয় সরকার কমিশন (Local Government Commission)
এলজিইডি (LGED) : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (Local Government Engineering Department)
এমএএমপিইউ (MAMPU) : মালয়েশিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ মডার্নাইজেশন এন্ড প্ল্যানিং ইউনিট (Malaysian Administrative Modernisation and Planning Unit)
এমএইউ (MAU) : ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট ইউনিট (Management Account Unit)
এমসিসিআই (MCCI) : মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (Metropolitan Chamber of Commerce & Industries)
এমএলএসএস (MLSS) : মেম্বার অব দি লোয়ার সাবঅর্ডিনেট ষ্টাফ (Member of the Lower Subordinate Staff)
এমএম (MM) : মহানগর হাকিম (Metropolitan Magistrate)
এমওই (MOE) : সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (Ministry of Establishment)
এমওএফ (MOF) : অর্থ মন্ত্রণালয় (Ministry of Finance)
এমওএফই (MO E &F) : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)
এমওএফএ (MOFA) : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Ministry of Foreign Affairs)
এমপি (MP) : জাতীয় সংসদ সদস্য (Member of Parliament)
এমডব্লিউসিএ (MWCA) : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women and Children Affairs)
এনবিআর (NBR) : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue)
এনসিবি (NCB) : জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক (Nationalised Commercial Bank)
এনসিআরজি (NCRG) : সরকারের সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশন (National Commission for Reforming Government)
এনজিও (NGO) : বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organisation)
এনআইপি (NIP) : নতুন শিল্পনীতি (New Industrial Policy)
এনএনজিএসপি (NNGSP) : নতুন জাতীয় বেতন গ্রেড ও স্কেল (New National Grade and Scales of Pay)
এনপিএম (NPM) : নতুন জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা (New Public Management)
এনপিআর (NPR) : জাতীয় কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা (National Performance Review)
এনআরবি (NRB) : অনিবাসী বাংলাদেশী (Non Resident Bangladeshi)
ওএন্ডএম (O&M) : সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (Organisation & Management)
পিএন্ডএসসি (P&SC) : বেতন ও চাকুরী কমিশন (Pay and Services Commission)
পিএসি (PAC) : সরকারী হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee)

পিএইএস (PAES)	: জনপ্রশাসন দক্ষতা সমীক্ষা (Public Administration Efficiency Study)
পিএআরসি (PARC)	: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (Public Administration Reform Commission)
পিএআরএমওসি(PARMOC)	: জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (Public Administration Reform Monitoring Commission)
পিসি (PC)	: পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)
পিডিবি (PDB)	: বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (Power Development Board)
পিএলএজিই (PLAGE)	: পলিসি লীডারশিপ এন্ড এডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality)
পিএম (PM)	: প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister)
পিএমও (PMO)	: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Prime Minister's Office)
পিপি (PP)	: সরকারি কৌসুলী (Public Prosecutor)
পিএসসি (PSC)	: সরকারী কর্ম কমিশন (Public Service Commission)
পিইউসি (PUC)	: পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি (Public Undertaking Committee)
আরএন্ডডি (R&D)	: গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development)
রাজউক (RAJUK)	: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Rajdhani Unnayan Katripakha)
আরডি (RD)	: পল্লী উন্নয়ন (Rural Development)
আরইবি (REB)	: পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড (Rural Electrification Board)
আরআইবিইসি (RIBEC)	: রিফর্মস ইন বাজেট এন্ড এক্সপেনডিচার(Reforms in Budget and Expenditure Control)
এসইসি (SEC)	: সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (Security & Exchange Commission)
এসএমপি (SMP)	: সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (Senior Management Pool)
এসওই (SOE)	: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (State Owned Enterprise)
এসপি (SP)	: সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ (Superintendent of Police)
এসআরও (SRO)	: স্ট্যাটিউটরি রেগুলেটরি অর্ডার (Statutory Regulatory Order)
এসএসবি (SSB)	: সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (Superior Selection Board)
এসএসপি (SSP)	: সিনিয়র সার্ভিস পুল (Senior Services Pool)
টিআইবি (TIB)	: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ অধ্যায় (Transparency International Bangladesh Chapter)
টিওআর (TOR)	: কার্যপরিধি (Terms of Reference)
টিইউ (TU)	: ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union)
ইউকে (UK)	: যুক্তরাজ্য (United Kingdom)
ইউএনডিপি (UNDP)	: জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (United Nations Development Programme)
ইউএনও (UNO)	: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (Upazila Nirbahi Officer)
ইউপি (UP)	: ইউনিয়ন পরিষদ (Union Parishad)
ইউএস (US)	: যুক্তরাষ্ট্র (United States)
ইউজেডডিসিসি (UZDCC)	: উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (Upazila Development Coordination Committee)
ইউজেডপি (UZP)	: উপজেলা পরিষদ (Upazila Parishad)
ভিডিপি (VDP)	: গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (Village Defence Party)
ভিএফএম (VFM)	: ভ্যালু ফর মানি–অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবা (Value for Money)
ভিজিডি (VGD)	: ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (Vulnerable Group Development)
ডব্লিউএএন (WAN)	: ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network)
ওয়াসা (WASA)	: পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (Water and Sewerage Authority)
ডব্লিউএফপি (WFP)	: বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম (World Food Programme)
ডব্লিউটিও (WTO)	: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation)
জেডপি (ZP)	: জেলা পরিষদ (Zila Parishad)

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		xi-xxvii
অধ্যায় ১	ভূমিকা	১-৬
অধ্যায় ২	সরকারী সেবাপ্রদান উন্নতকরণ	৭-২৮
অধ্যায় ৩	সিভিল সার্ভিস সংস্কার	২৯-৫০
অধ্যায় ৪	সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ	৫১-৭৪
অধ্যায় ৫	মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ	৭৫-৮৮
অধ্যায় ৬	দুর্নীতি দমন	৮৯-১০৪
অধ্যায় ৭	অপচয়-হ্রাস ও অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়ন	১০৫-১১৫
অধ্যায় ৮	সংসদীয় পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ	১১৬-১২১
অধ্যায় ৯	বেসরকারী বিনিয়োগ সহজীকরণ	১২২-১২৭
অধ্যায় ১০	সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	১২৮-১৩৮
সূত্রনির্দেশ তালিকা		১৩৯-১৪০
পরিশিষ্টসমূহের তালিকা		১৪১

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি) ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে গঠিত হয়। এর *ম্যান্ডেট* ছিল জনপ্রশাসনের, তথা সরকারী সংস্থাগুলোর দক্ষতা, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার স্তর উন্নীত করার জন্য নীতি, কার্যক্রম ও কার্যকলাপের সুপারিশ প্রণয়ন করা, যাতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জন্য তার সুফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে এসব সংস্থা সক্ষম হয়।

মূল আলোচিত বিষয়সমূহ ও কমিশনের সুপারিশ

কমিশন মনে করে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব এবং এ জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন নেই। এতে খুব একটা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আশু সুফল দেখা দিবে। কমিশন এ কারণে সরকারের কাছে কতিপয় অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ রাখা আবশ্যক মনে করে যাতে কমিশনের মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেও ঐ সব প্রশ্নের সুরাহা করা সম্ভব হয়। কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরণের মোট ৩০টি সুপারিশ পেশ করে। অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন; বিভিন্ন সরকারী সংগঠনের জবাবদিহিতা এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা; একজন ন্যায়পাল নিয়োগ; একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন; উপযোগ বিল (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইত্যাদি) একই স্থানে পরিশোধ করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; সরকারী চাকরিতে ক্রমান্বয়ে কোটা পদ্ধতির বিলুপ্তি; পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান এবং ভ্রমণ কর পরিশোধ পদ্ধতির সহজীকরণ; সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোতে কর্মসম্পাদন মান প্রবর্তন; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য কার্যসম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এগুলোর মধ্যে ছয়টি, যেমন - সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা ও কাজের মানোন্নয়ন, একই স্থানে উপযোগ বিল পরিশোধ ব্যবস্থা, ভ্রমণ কর পরিশোধ পদ্ধতির সহজীকরণ, সরকারী দপ্তরে কার্য উন্নয়ন দল (Work Improvement Team - WIT) গঠন, সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার সহজীকরণের সুপারিশ, **'জনসেবার জন্য প্রশাসন'** এ শ্লোগানের বহুল প্রচার সরকার অনুমোদন করেন এবং কমিশনের সহযোগিতায় এগুলো এখন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

কমিশন বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় নিম্নমানের দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতার পেছনের কারণগুলো তলিয়ে দেখে, আলোচনা করে, এবং সরকারী সেবা প্রদান উন্নয়নের বিকল্পসমূহও পরীক্ষা করে (অধ্যায়-২)। কমিশন লক্ষ্য করে যে, উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণগুলো হলো: (ক) সরকারী সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য, কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কে কার্যপরিচালনগত সংজ্ঞার অভাব; (খ) এসব সংজ্ঞা জনসাধারণকে অবহিত করার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক সরকারী নীতি এবং পদ্ধতির অভাব; (গ) সরকারী চাকরিতে গোপনীয়তার প্রথাগত চর্চা; (ঘ) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অতিশয় কেন্দ্রীকরণ; (ঙ) নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থাগুলোর দুর্বলতা, (চ) তথ্য প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার; এবং (ছ) দৃষ্টিভঙ্গীগত অন্তরায় এবং নিম্নস্তরের বেতনসহ কর্মচারী ব্যবস্থাপনার নানা বিষয়। কমিশন এসব প্রশ্নে অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত উভয় ধরনের সুপারিশই প্রণয়ন করে। **গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে: সরকারী অফিসের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সংজ্ঞায়িতকরণ; সিভিল সার্ভিসে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারী অফিসে কার্যসম্পাদন মনিটরিং ও ফলাফলমুখী নিরীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন; অধস্তন/মাঠস্তরের অফিসসমূহকে ক্ষমতা অর্পন; সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার স্তরগুলো কমানোর জন্য সকল সরকারী সংগঠনে মাত্র তিন ধাপ বিশিষ্ট পদের প্রবর্তন; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে সকল কমিশন/কমিটির প্রতিবেদন সহজলভ্যকরণ; রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এবং সেই সাথে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা; সরকারী হিসাব ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার পৃথকীকরণ; *কর্মসম্পাদন মান* (performance standard) ও *নাগরিক সনদ* (citizen's charter) প্রবর্তন; সেকেলে আইন, বিধি, ধারা, ফরম সহজীকরণ; সরকারী গোপনীয়তা আইন ১৯২৩-এর সংশোধন এবং তথ্য স্বাধীনতা আইন সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন; তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তন এবং *লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক* (Local Area Network - LAN) এবং *ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক* (Wide Area Network - WAN) স্থাপন ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বাজারভিত্তিক বেতন প্রদান।**

সাধারণভাবে **সিভিল সার্ভিসের সংস্কার** ও বিশেষভাবে বিভিন্ন **সার্ভিসের পুনর্গঠনের** প্রশ্নটি বহুকাল ধরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রয়েছে। কমিশন এ প্রশ্নের মোকাবেলায় প্রথমেই চাকরিতে নিয়োগের নীতিমালাসমূহ বিশ্লেষণ করে, যা অদক্ষ সেবার মূল কারণ (অধ্যায় ৩)। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ও বাস্তব চিত্রের মধ্যে যে বড় রকমের অসঙ্গতি রয়েছে, তা কোটা পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়ার পক্ষে সুপারিশ দেয়ার যৌক্তিকতাকেই তুলে ধরে। *নতুন জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা* (New Public Management - NPM) -এর ধারনা এ অসঙ্গত নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মেধার নীতি গ্রহনে সাহায্য করবে। **জটিল আন্তঃক্যাডার সমস্যা এবং সাধারন ও পেশাদার ক্যাডারের মধ্যে দ্বন্দ বিশ্লেষনের পর তা নিরসনে সচিবালয়ে একই ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে *ফাংশনাল ক্লাষ্টার* (functional cluster) প্রবর্তন ও উপ-সচিব পর্যায় থেকে *সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট পুল* (Senior Management Pool - SMP) নামে পেশাদারী নীতি নির্ধারণ গ্রুপ চালু করার সুপারিশ করা হয় যা দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করবে। সরকার সচিব পর্যায়ের পদে ১৫% এবং উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদসমূহে ১০% হারে পার্শ্বিক প্রবেশের (lateral entry) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।** উল্লেখিত পদসহ সকল কর্পোরেশন প্রধানের পদ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, ইত্যাদির প্রধানের পদসমূহ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূরণ করা যাবে। এসকল পদ লাভের জন্য পূরণযোগ্য পদের দু'ধাপ নীচের স্কেল পর্যন্ত কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী খাতের নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যোগ্য হবেন। উপ-সচিব পদসমূহ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সকল ক্যাডার থেকে পূরণ করা হবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়, যেমন - **মহিলাদের নিয়োগ ও তাদের জন্য কর্মসহায়ক পরিবেশ তৈরির আবশ্যকতা; কর্মসম্পাদনের সাথে পদোন্নতির বিষয়টিকে সম্পর্কিত করার অপরিহার্যতা; বার্ধক্যজনিত অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে বাড়ানো ও যে কোনো কর্তব্য পদে (duty post) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করা,** পর্যাপ্ত বেতন ও প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদান এবং সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও কাজের সমৃদ্ধি আনয়ন করা। সরকারী কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থাটি খতিয়ে দেখে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ করে **ঢাকায় একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন** করার সুপারিশ করা হয়। বিদ্যমান একটির পরিবর্তে **তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন** (পিএসসি) - সাধারণ, কারিগরি এবং শিক্ষা - গঠনের সুপারিশ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ (অধ্যায়-৪) হচ্ছে জনপ্রশাসনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্যাসঙ্কুল ক্ষেত্র যার সাথে দক্ষতা, কার্যসম্পাদন, সেবাপ্রদান ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোর বর্তমান বৃহদাকার কাঠামো ও জনবলের (৩৬টি মন্ত্রণালয়সহ ২৩১টি সরকারী সংস্থা) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অধ্যায়ের সূচনা করা হয়। পিএআরসি সরকারী সংস্থাগুলোর সংখ্যা ও সেগুলোর জনবল প্রয়োজনীয় হ্রাসের সুপারিশ করে। কমিশন তার কাজ করতে গিয়ে একই বিষয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট পরীক্ষা করে ও যথাযথ ব্যবহার করে। **মূল সুপারিশগুলো হলো: ৪টি বিভাগের একীভূতকরণ ও মন্ত্রণালয়গুলোর সংখ্যা ৩৬ থেকে ২৫ -এ হ্রাস; ৬টি সংস্থার অবলুপ্তি; ২টি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা, যথা ঃ (১) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ও (২) ন্যায়পালের অফিস; ৪০৬৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি (প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যথাক্রমে +১৭৫৯ ও +২৩০৯ টি পদ) ও ২৯৯৭৪ জনবল হ্রাস (যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর -১৩১৭৬ ও -১৬৭৯৮ জন), যার ফলে মোট উদ্বৃত্ত জনবল দাঁড়াবে বর্তমান পদগুলোর বিপরীতে ২৫৯০৬ -এ (৪.৪৬%)। জনবলের এ প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের ফলে ৭৫ কোটি টাকারও বেশী সাশ্রয় ঘটবে।** অবশ্য মঞ্জুরিকৃত পদগুলো থেকে মোট যে জনবল উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ ১২২২২৩ বা ১৮.০৫%) হবে বলে প্রস্তাব করা হয় তাতে সাশ্রয় হবে অনেক বেশী। উদ্বৃত্ত পদ বা জনবল প্রধানত চিহ্নিত হয় ঐ সব কর্ম এলাকায়, যেখানকার কাজগুলো সহজেই চুক্তিভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যায়। তাতে একদিকে দক্ষতা উন্নত করা যায়, অন্যদিকে ব্যয় সাশ্রয়তা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো যায়। উন্নততর আর্থ-ব্যবস্থাপনার বিষয় বিবেচনা করে পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠন ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা সেলসমূহকে যথাযথ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে শক্তিশালী করার সুপারিশ করা হয়। **প্রস্তাবিত জনবল যৌক্তিকীকরণের ক্ষেত্রে পিএআরসি কর্মরত কোনো সরকারী কর্মচারীকে ছাঁটাই করার সুপারিশ করে না।**

মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রীকরণ শীর্ষক অধ্যায়ের (অধ্যায়-৫) ১ম ও ২য় ভাগে যথাক্রমে নিম্নস্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর (devolution) ও ক্ষমতা অর্পন (delegation) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয় ও সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চলমান স্থানীয় সরকার সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে চারটি স্তর, যথা - গ্রাম, ইউনিয়ন,

উপজেলা ও জেলায় গণতান্ত্রিক বৈশিষ্টের স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তোলা। অবশ্য সামগ্রিক সংস্কার পরিকল্পনার বিশদ পরীক্ষায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে সত্যিকারভাবে স্ব-শাসিত করে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এও লক্ষ্য করা গেছে যে, পরিকল্পনাটি বেশ মন্থরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে; তবু তারপরেও স্থানীয় পরিষদগুলোর এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং তাদের হাতে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলার সম্ভাবনা এ পরিকল্পনায় রয়েছে। মাঠ স্তরের প্রশাসনের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সংক্রান্ত বিভাগীয় (divisional) পর্যায়ের অফিসসমূহের কাঠামোর পুনর্গঠন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কর রাজস্বের সুষ্ঠু ভাগবণ্টন এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসমূহ দ্বারা নিজ কর্মচারী নিয়োগ ও নানা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন। উপজেলা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের পরামর্শ মেনে চলার বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনায় তাদের সম্পৃক্ত করা। স্বল্পমেয়াদী কৌশল হিসেবে বর্তমানে যেসব নির্দেশিকা রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনাক্রমে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা বই (প্ল্যান বুক) প্রণয়নের বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে; সরকারের সাতটি দপ্তরের কার্যাবলী, কর্মচারীবর্গ ও বাজেট জেলা পরিষদে ও অনুরূপ নয়টি দপ্তরের একই বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করা যেতে পারে। **সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি পরিষদগুলোতে প্রেষণে ন্যস্ত করা যেতে পারে; জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমন্বয়ের সার্বিক ক্ষমতা অর্পন করা যেতে পারে।** অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে যেখানে নিম্নস্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল সমস্যা অর্থাৎ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন সংস্থার কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপের কারণে প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্বশাসন খর্ব করার বিষয়টি প্রদর্শিত হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধি হবে সরকারের কার্যপরিচালনার দৃঢ় ভিত্তি। কোনো মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যাতে অধিদপ্তর ও অন্যান্য অধস্তন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (PARMOC) নিম্নতর পর্যায়ে ক্ষমতা অর্পনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করতে পারে।

দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অধ্যায়-৬ এ আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির নানা বহিঃপ্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো হলো: সরকারী কর্মচারীদের অপ্রতুল বেতন এবং যার কারণে তাদের মধ্যে আত্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অভাব, আইন ও বিধি-বিধানের দুর্বল প্রয়োগ, স্বচ্ছতার অভাব, আমলাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার (discretionary power) অপপ্রয়োগ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহের ব্যর্থতা। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (বিএসি) কার্যাবলী ও এ প্রতিষ্ঠানের নৈরাশ্যজনক কার্যসম্পাদনের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো: ন্যায়পাল নিয়োগ দ্রুততর করা ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা; সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োজনীয় সঙ্কোচন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেমন - একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (Independent Commission Against Corruption - ICAC) ও একটি ফৌজদারী বিচার কমিশন (Criminal Justice Commission) প্রতিষ্ঠা। শেষোক্ত কমিশনের মূল কাজ হবে পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা। দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশগুলোর আওতায় রয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য একটি নতুন *আচরণ বিধি* (code of conduct) প্রণয়ন; রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা প্রদানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বিবেচনা, রাজনৈতিক লেনদেনে আরও বেশি স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি নিয়ামক আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা এবং জনসাধারণকে তথ্য জানাবার জন্য ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ সুবিধাদির প্রবর্তন।

সকল মহল থেকেই **সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপচয় হ্রাস ও প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়ন** (অধ্যায়-৭) -এর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপচয়ের প্রধান কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অপচয়ের উৎসগুলো, বিশেষ করে সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর আর্থসম্পদ ব্যবস্থাপনায়, উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মঞ্জুরি প্রদানে, কাজের বিনিময় খাদ্য কার্যক্রমে এবং পণ্য ও সেবা সংগ্রহে নিহিত রয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে অতিরিক্ত ব্যয়, প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অপচয়, সরকারী সেবা সুবিধার ব্যবস্থাদি (বিশেষ করে, গৃহ সংস্থান, যানবাহন ও টেলিফোন) এবং জমিসহ সরকারী সম্পত্তির অপচয়পূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর হিসাব নিরীক্ষণ জোরদার ও হালনাগাদ করা, সরকারী সুযোগ সুবিধা নগদায়ন (অর্থাৎ নগদ অর্থের আকারে প্রদান), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমের আওতায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপকার লাভ নিশ্চিতকরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর (State Owned Enterprise

-SOE) বেসরকারীকরণ, বিভিন্ন খাতে যথা - বিদ্যুৎ, পানি, ইত্যাদিতে অযৌক্তিক সিস্টেম লস বন্ধ করা, অপচয় কমানোর লক্ষ্যে সংগ্রহ/ক্রয় সংক্রান্ত আইন যুগোপযোগী করতে হবে এবং প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সেবা লাভ নিশ্চিত করার জন্য ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা আইন প্রণয়ন, ইত্যাদির সুপারিশ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসনে সেবাপ্রদানে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **সংসদীয় পর্যবেক্ষন** খুবই দুর্বল বলে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানে সংজ্ঞায়িত কমিটি ব্যবস্থা মাত্র কয়েক বছর হ'ল গড়ে উঠেছে; কাঙ্খিত ফল পেতে (অধ্যায় ৮) হলে এ কমিটির আরও অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যকার সম্পর্কটি নির্বাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠত্বের পুরনো ধারণায় প্রভাবিত। এ বিভাগ প্রথাগত গোপনীয়তার এমন পরিবেশে কর্মসম্পাদন করে যেখানে স্বচ্ছতা গোপনীয়তার শিকারে পরিনত হয়। সরকারী হিসাব কমিটির (পিএসি) ভূমিকা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ কমিটির সদস্যদেরসহ সংসদীয় কমিটিগুলোর সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কাজের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে **পর্যবেক্ষন** কাজ জোরদার করার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। কমিটির প্রকাশ্য সভাগুলোতে বিভিন্ন গণ মাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তাতে স্বচ্ছতা ও জনসাধারণের জানার সুযোগ বাড়বে। **তথ্য সংগ্রহ ও সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য তাঁদের প্রত্যেককে একটি অফিস, একটি কম্পিউটার, একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগত সহকারী এবং কিছু তহবিল দিতে হবে। ব্যক্তিগত সহকারী সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের মেয়াদকালের জন্যই নিযুক্ত হবেন**। এছাড়া সরকার পরিচালনার কাজ, সংসদীয় কার্যপদ্ধতি ও বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে পরিচিতি ও প্রশিক্ষণে সংসদ সদস্যদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া কতিপয় সংসদীয় কমিটির প্রধান সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করার এবং প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে কমপক্ষে এক জন করে মহিলা সদস্য রাখার সুপারিশ প্রণীত হয়।

অধ্যায়-৯ এ প্রধানত **বেসরকারী বিনিয়োগ সহজীকরণে জনপ্রশাসনের ভূমিকা** নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে স্থানীয় ও বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগের সার্বিক পরিস্থিতি খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে মূল সমস্যা রয়েছে বাস্তবায়ন স্তরে, যেখানে সরকারী সংস্থাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সংস্থার সাংগঠনিক, কার্যপদ্ধতিগত, আইনগত ও সার্বিক পদ্ধতিগত সমস্যাদিও রয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই) ও বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা *বেপজা* -র মতো দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিচালন সমস্যায় আক্রান্ত। এরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার উপর নির্ভরশীল; এদের কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাব; লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সময়সীমা রক্ষায় ব্যর্থতা; অপর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন; পেশাদারিত্বের অভাব এবং মনিটরিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও দুর্বল। তাছাড়া, দেশে গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সমস্যা রয়েছে, যেমন - চাঁদাবাজি ও মাস্তানি এবং মুক্তিপণ আদায়ের মতো গুরুতর অপরাধ। এসব সমস্যা স্থানীয় ও বৈদেশিক সকল বিনিয়োগকারীর জন্য প্রচণ্ড হতাশার কারণ। সিকিউরিটি বাজারে প্রতারণা ও নানা ধরণের অসাধুতা হচ্ছে সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে প্রধান সুপারিশগুলো হলো: আইন প্রয়োগ পদ্ধতিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করে বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা বিধান করা; বিদ্যমান আইনের আওতায় সকল বে-আইনী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ বন্ধ করা; মহিলা শ্রমিকদের জন্য উপযোগী কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা; বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইনগুলো উন্নত করা এবং বিরোধ নিস্পত্তিতে জটিল পদ্ধতির সুরাহা করা; বিনিয়োগ বোর্ডে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' দলের সদস্যদেরকে কৌশলগত ক্ষমতা প্রদান; চলমান ব্যাংকিং সংস্কার কার্যক্রম দ্রুততর করা; প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদেরকে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ প্রদান; রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো ও অন্যান্য শিল্পপার্ক এলাকার কয়েকটি সেবাব্যবস্থা, যেমন - নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, উপযোগ বিল তৈরি, ক্ষুদে উপযোগ সেবা প্রদান ইত্যাদি চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া; বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো কর্তৃক বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টি এবং মিশনগুলোকে শুধুমাত্র কূটনৈতিক অফিসের পরিবর্তে সত্যিকার অর্থনৈতিক দূতাবাসে রূপান্তরিত করা; লেনদেনের নিরাপত্তা ও জালিয়াতি রোধের লক্ষ্যে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ই-ট্রেড এবং ই-কমার্স প্রবর্তন করা।

অধ্যায়-১০ এ সাধারণভাবে প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা এবং বিশেষভাবে পিএআরসির সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এতে ইতিপূর্বে পেশকৃত (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ২৮) **জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (Public Administration Reform Monitoring Commission - PARMOC)** প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনরুল্লেখ করা হয়। এ কমিশনের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং তা প্রধানতঃ বর্তমান কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে PARMOC প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা হবে ১৬

(৩ জন পূর্ণকালীন ও ১৩ জন খণ্ডকালীন)। প্রস্তাবিত এ কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন একজন মন্ত্রী/মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। এ কমিশনের মূল কাজ হবে সংস্কার প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে সরাসরি সহায়তা করা এবং সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা।

কমিশন তিন ধরণের সুপারিশ করেছে: (১) অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহ, যেগুলো ইতিমধ্যেই বিবেচনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে; (২) স্বল্পমেয়াদী সুপারিশসমূহ, যেগুলো ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য; এবং (৩) দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ, যেগুলো বাস্তবায়নে ২ বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে।

এ প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০টি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহের একটি তালিকা এবং অধ্যায়ভিত্তিক ৭০টি স্বল্পমেয়াদী ও ৩৭টি দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশের একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হ'লঃ

অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১. **সরকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা** শীর্ষক প্রস্তাবে সকল সেবামূলক সরকারী অফিসসমূহ যে সব সেবা প্রদান করে থাকে, সেসব সেবা সম্পর্কে প্রকাশ্য বিলবোর্ড স্থাপন অথবা বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

২. **সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ, ঐ সব চিঠিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথিপত্র নিষ্পত্তিকরণ** প্রতিবেদনে সচিবালয়ের প্রবেশপথে ডাক গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বিভিন্ন চিঠিপত্রের নিষ্□ত্তির বিষয়ে জনগনের জিজ্ঞাস্যের জবাব দেয়ার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ রয়েছে।

৩. **উৎসাহজনক প্রাপ্য ব্যবস্থাসহ আগাম অবসর গ্রহণ** -এ প্রস্তাবে ২৫ বছরের চাকরির পরিবর্তে ২০ বছরের চাকরি সম্পূর্ণ করার পর পূর্ণ সুবিধাসহ স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. **ন্যায়পাল নিয়োগ** -এ সুপারিশে প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোসহ ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি ও দপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫. **ভ্রমণকর পরিশোধ সহজীকরণ** সংক্রান্ত সুপারিশে বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে ব্যাংকে কর পরিশোধের পরিবর্তে টিকেটের মূল্যের সাথে এই কর যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬. **রাজস্ব বাজেটভুক্ত বর্তমান জনবলের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা** শীর্ষক সুপারিশে কতিপয় অত্যাবশ্যক ও টেক্‌নিক্যাল পদ ছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত কোনো শূন্য পদ পূরণ বা কোনো নতুন পদ সৃষ্টি না করা এবং এক বছর বা তদুর্ধ্বকাল শুন্য থাকা পদ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

৭. **পেনশন পরিশোধ পদ্ধতি সহজীকরণ** প্রতিবেদনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পেনশন প্রদান পদ্ধতি সহজ করে তোলার জন্য কয়েকটি উপায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮. **প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন** শীর্ষক সুপারিশে সরকারী গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে নিজের গাড়ী কেনার জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রাপ্য হিসেবে ৪(চার) লাখ টাকার ঋণ সুবিধা ও প্রতিমাসে ঐ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৮(আট) হাজার টাকার ভাতা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

৯. **বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন আধুনিকায়ন** শীর্ষক প্রস্তাবে ভূমি মালিকানার পদ্ধতিগুলোকে সহজ করা ও জমির মালিকদেরকে জমির মালিকানা সনদ বা প্রত্যয়নপত্র দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সুপারিশে পিএআরসি'র সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য **একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার** প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১. **উপযোগ বিলসমূহ একস্থানে পরিশোধ ব্যবস্থার** সুপারিশে বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্ন উপযোগ বিল পরিশোধের জন্য যে প্রচলিত ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিবর্তে সকল উপযোগ বিল একই সময়ে একটি কাউন্টারে পরিশোধের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২. **পাসপোর্ট প্রদান সহজীকরণ** শীর্ষক সুপারিশে পাসপোর্টের ফরম ও পাসপোর্ট ইস্যু করার পদ্ধতি সহজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩. **ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু পদ্ধতি সহজীকরণ** প্রস্তাবে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ফরম ও লাইসেন্স ইস্যু পদ্ধতি সহজ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

১৪. **মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে কার্য উন্নয়ন টিম গঠন** সংক্রান্ত সুপারিশে অফিসে কাজের পদ্ধতি উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনমূলক ধ্যানধারণাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য মধ্য ও জুনিয়র স্তরের ৩/৪জন কর্মকর্তা নিয়ে কার্য উন্নয়ন টীম গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৫. **জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ** শীর্ষক প্রস্তাবে সরকারী দপ্তরগুলোতে স্বচ্ছতা আনার জন্য একমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয় ছাড়া সরকারী দলিলাদি ও প্রকাশনা জনসাধারণের জন্য সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

১৬. **সড়ক ও জনপথে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি** শীর্ষক সুপারিশের লক্ষ্য জনচলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মহাসড়ক ও অন্যত্র জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

১৭. **কতিপয় অধিদপ্তর/দপ্তর বিলুপ্তি এবং একত্রীকরণের সুপারিশের** আওতায় চারটি অধিদপ্তর/দপ্তর বিলুপ্ত ও আটটি অধিদপ্তর/অফিসকে চারটি অফিসে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রয়েছে।

১৮. **প্রচলিত আইন, বিধি, প্রবিধি/প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির প্রয়োগ/বাস্তবায়ন** প্রস্তাবের আওতায় প্রচলিত বিধি-বিধান সরকারী খাতের সংস্থাগুলোতে কঠোরভাবে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

১৯. **শ্রেণীভিত্তিক পরিচিতির পরিবর্তে কর্মচারীদের গ্রেডভিত্তিক পরিচিতি দানের প্রস্তাব** এর সুপারিশের মূল বিষয় হ'ল কর্মচারীদের চাকরির গ্রেড অনুসারে তাদেরকে শনাক্তকরণ।

২০. **প্রশাসন সংস্কারের উপর শ্লোগান** শীর্ষক সুপারিশের লক্ষ্য হ'ল প্রশাসনের শীর্ষতম স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত "**জনসেবার জন্য প্রশাসন**" - এ শ্লোগানের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মনমানসিকতার পরিবর্তন।

২১. **তিন বছর পূর্বের বকেয়া আবাসিক সকল উপযোগ বিল তামাদি ঘোষণা** - এতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে তিন বছরের পুরনো আবাসিক উপযোগ বিল পরিশোধ তামাদি ঘোষণার সুপারিশ করা হয়।

২২. **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের ছক** শীর্ষক প্রস্তাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ছকের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশের পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

২৩. **কার্য সম্পাদন মান ও নাগরিক সনদ** - এ সুপারিশে বিভিন্ন সংস্থার জন্য কার্যসম্পাদন মান ও নাগরিক সনদ তৈরির লক্ষ্যে মডেল হিসেবে তিন মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া কার্যসম্পাদন মান এবং পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার জন্য কার্যসম্পাদন সূচক (performance indicators) ও নাগরিক সনদ (citizen's charter) ব্যবহার করার প্রস্তাব রয়েছে।

২৪. **সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রণীত মেধার অনুকূলে কোটা পদ্ধতির উদারিকরণ** - এ সুপারিশের আওতায় প্রচলিত কোটা পদ্ধতির সংশোধন করে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদগুলোতে মেধার ভিত্তিতে নবনিয়োগের যে কোটা নির্ধারিত রয়েছে তা ১০% বৃদ্ধি করে ৪৫% থেকে ৫৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৫. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন**. শীর্ষক সুপারিশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা পরিদর্শন; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ; আদর্শ থানা প্রতিষ্ঠা এবং থানায় পৃথক তদন্ত ও নিবারণ (preventive) †সল (cell) স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৬. **জনপ্রশাসনের সকল স্তরে দুর্নীতি রোধের জন্য একটি কার্যকর সংস্থা প্রতিষ্ঠা** সংক্রান্ত সুপারিশে বর্তমান দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিবর্তে অধিকতর স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও কর্তৃত্বসহ একটি দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭. **ইলেক্ট্রনিক সরকার ঃ সরকারের কার্য পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন ও এ সব প্রযুক্তির সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যবহার** শীর্ষক প্রতিবেদনে জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে কার্যপরিচালনার জন্য সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা; ফাইবার অপটিকস প্রযুক্তি সুবিধার ক্রমবর্ধিত ব্যবহার; টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স ও অন্যান্য আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সদ্ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে।

২৮. **সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রস্তাবের আওতায় একটি জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন** (পারমক) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমান কমিশনের মেয়াদ শেষে পারমক তিন বছর মেয়াদে কাজ করবে ও এর কাজ হবে পিএআরসি'র সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সাহায্য করা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটরিং করা।

২৯. **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হ্রাস** - এ প্রস্তাবে contracting out ও outsourcing প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ন্যূনতম পর্যায়ে কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে। শনাক্তকৃত ক্ষেত্রগুলো হ'ল কর্মচারী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও গাড়ি সংগ্রহ, প্রকল্প কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ, জরিপ, গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, ইত্যাদি।

৩০. সরকারী দপ্তরগুলোতে **এ ৪ (A4) আকারের কাগজ ব্যবহার** শীর্ষক সুপারিশের আওতায় বর্তমানে প্রচলিত ২১.৮×৪৩.৩ সে.মি. সাইজের কাগজের পরিবর্তে এ ৪ (A4) বা ২১×২৯.৭ সে.মি. আকারের কাগজের ব্যবহার প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ

অধ্যায় ২ ঃ সরকারী সেবাপ্রদান উন্নতকরণ

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ সকল সরকারী অফিসকে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীকে সংজ্ঞায়িত এবং পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল পদের জন্য কর্মবিবরণী তৈরি করতে হবে ।

২ সিভিল সার্ভিসে **পেশাদারিত্ব** অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোর কার্য সম্পাদনের মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪ অধস্তন/মাঠস্তরের অফিসসমূহকে যথাযথ **প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা** অর্পন করতে হবে।

৫ **প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট এমন ভাবে ক্ষমতা অর্পন করবে যে, কোন সিদ্ধান্ত তিনটি স্তরের বেশী অতিক্রম করবে না** । উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সে অনুযায়ী সচিবালয় নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট প্যারার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৬ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল কমিশন ও কমিটির প্রতিবেদন** জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে হবে।

৭ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে **বিচার বিভাগকে নির্বাহী অঙ্গ থেকে আলাদা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় গঠন করতে হবে** এবং ম্যাজিস্ট্রেসিসহ বিচার বিভাগের প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। পুলিশের উপর ম্যাজিস্ট্রেসিসহ বিচার বিভাগের তদারকির যে বিধান রয়েছে, তা জোরদার করতে হবে।

৮ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল অফিসে **ফলাফলমুখী কার্যসম্পাদনগত নিরীক্ষণ ব্যবস্থা** (result oriented performance auditing) প্রবর্তন করতে হবে।

৯ অন্তর্বিভাগ (intra-departmental) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য **লোক্যাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (এলএএন)** অবিলম্বে প্রবর্তন করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ **হিসাব নিরীক্ষণ (অডিট) থেকে হিসাব রক্ষণকে (একাউন্টস) আলাদা করতে হবে** । হিসাব নিরীক্ষণকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতায়ন করতে হবে।

২ সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন জ্ঞান বিকশিত করা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিসমূহের মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে।

৩ তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তনের পর সরকারী অফিসের যে কোন প্রাথমিক ইউনিট, যেমন - **মন্ত্রণালয়ের একটি সেকশন একজন কর্মকর্তা ও বর্তমান তিনজন সহায়ক কর্মচারীর পরিবর্তে একজন কর্মকর্তা ও একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত সহায়ক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হবে** । একটি ব্রাঞ্চে বার্তাবহনসহ নির্দেশিত অন্যান্য কার্যসম্পাদনের জন্য ২০ নং গ্রেডের একজন কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রথমে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুপাত ১ঃ১ হবে। এতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

৪ সকল সেকেলে আইন-কানুন, বিধি-বিধান, রেজোলিউশন এবং ফর্ম হালনাগাদ ও সহজতর করতে হবে।

৫ **সেবা প্রদান করে এমন সকল সরকারী সংস্থায় 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তন করতে হবে** ।

৬ জনগণের সরকারী সেবাপ্রাপ্তি, তাদের অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগের সন্তোষজনক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষিত ও অবহিত করে তোলার জন্য গণমাধ্যমগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।

৭ **তথ্য স্বাধীনতা আইন** (Freedom of Information Act) প্রবর্তন এবং ১৯২৩ সনের সরকারী গোপনীয়তা আইন (Official Secrets Act 1923), ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের (Evidence Act 1872) ১২৩ ও ১২৪ ধারা, এবং সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯ -এর ১৯তম বিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

৮ আন্তঃবিভাগ (inter-departmental) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডব্লিউএএন)** প্রবর্তন করতে হবে।

৯ সরকারের সকল কর্মকর্তাকে সরকারের আয়তন যথাযথ করা সাপেক্ষে **বাজারভিত্তিক বেতন** দিতে হবে। অধিকন্তু ব্যক্তিখাতের ন্যায় এটার ভিত্তি হবে নিয়োগ ও অপসারণ নীতি। এ ধরণের বাজার ভিত্তিক বেতন পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে চালু করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৩ ঃ সিভিল সার্ভিস সংস্কার

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ **জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে নিয়োগ, পদায়ন (posting) ও পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা।**

২ **জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে শৃংখলা বলবৎ করতে হবে।**

৩ **সচিবালয়ের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদ সমন্বয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের তিনটি গুচ্ছ গঠন করতে হবে** । এ তিনটি হচ্ছে, সাধারণ, অর্থনৈতিক, এবং ভৌত-সামাজিক অবকাঠামো গুচ্ছ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সকল গুচ্ছের বাইরে থাকতে পারে।

৪ সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের সমন্বয়ে সচিবালয়-এ *সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (এসএমপি)* গঠন করতে হবে। **উপ-সচিব পদে নিযুক্তি হবে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে** । মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের গুচ্ছের উপ-সচিব পদের জন্য সকল ক্যাডারের সিনিয়র স্কেলভুক্ত এবং ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য হবেন। **এর ফলে সচিবালয়ে সকল ক্যাডারের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নিশ্চিত হবে এবং প্রতিভাবান কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হবে।**

৫ বর্তমানে বিভিন্ন গ্রেডে সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের পদে বহাল থাকবেন। তবে জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণ গুচ্ছে যোগদানের জন্য তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারবেন। কোন গুচ্ছের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কার্যসম্পাদন বিবেচনা করে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের তিনটি গুচ্ছের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে এসএসবি একটি পর্যালোচনা চালাবে। তবে এসএমপি-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের পূর্বে সকল ক্যাডার কর্মকর্তা তাদের গুচ্ছে যোগদানের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে *অপশন* (option) প্রদান করবেন। এ ধরনের *অপশন* একবার প্রদান করা হলে তা প্রত্যাহার করা যাবে না এবং এসএমপি-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন কমকর্তা যোগ্য বিবেচিত হলে তিনি স্ব ক্যাডার পদের *লিয়েন* হারাবেন। **জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা এবং সকল সহায়ক কর্মচারী গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আবর্তিত হবেন।** গুচ্ছভুক্ত কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের মোট পদের ১০% বিশেষ প্রয়োজনে অন্য গুচ্ছছভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বদলীর মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

৬ **সরকার, সচিব পর্যায়ের পদে ১৫% এবং উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদসমূহে ১০% হারে পার্শ্বিক প্রবেশের (lateral entry) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।** উল্লেখিত পদসহ, সকল কর্পোরেশন প্রধানের পদ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, ইত্যাদির প্রধানের পদসমূহ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূরণ করা যাবে। এসকল পদ লাভের জন্য পূরণযোগ্য পদের দু'ধাপ নীচের স্কেল পর্যন্ত কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী খাতের নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যোগ্য হবেন।

৭ **বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে কর্মজীবনে উন্নতি নিয়ে পার্থক্য ও বিরোধ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সকল ক্যাডার সার্ভিসের জন্য পদোন্নতির সুষম সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে।** উপযুক্ত পদাধিকারীদের জন্য শূন্য পদ পাওয়া না গেলে এসএমপি'র মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮ কোন পদে নিয়োগের মেয়াদ স্বাভাবিক অবস্থায় ৩ থেকে ৫ বছর হতে পারে।

৯ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দানের ক্ষেত্রে প্রধান দিকনির্দেশক নীতি হবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ভিত্তিতে মূল্যায়নকৃত মেধা, দক্ষতা, চারিত্রিক সততা, প্রশিক্ষণ ও চাকরির রেকর্ড। এলক্ষ্যে প্রচলিত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ফরম সংশোধন করা যেতে পারে।

১০ মহিলাদের কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত আবাসন, পরিবহন, দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র ও পৃথক প্রক্ষালনকক্ষসহ কর্মজীবী মহিলাদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১১ **প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা যেতে পারে** এবং **সরকারের *ডিউটি পোষ্ট*-এ কোনো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যাবে না।**

১২ **পরীক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) গঠন করা যেতে পারে** – একটি সাধারণ সার্ভিসের জন্য, অপরটি কারিগরি সার্ভিসের জন্য এবং তৃতীয়টি শিক্ষা সার্ভিসের জন্য। সম্ভব হলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পিএসসিগুলোর চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১৩ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সনের জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ সমীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে।

১৪ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ও প্রধানগণকে কাজের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট পদের কাজের বিবরণের ভিত্তিতে সরকারের ভেতর বা বাইরে থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৫ প্রশাসনের পরিবর্তনশীল নানা কৌশল ও প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ চাকরির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। সহায়ক কর্মচারীদের পরিবর্তিত প্রযুক্তির আলোকে *কম্পিউটার লিটারেসী* ও দক্ষতায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এধরনের প্রশিক্ষণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও বিশেষভাবে প্রণীত হতে হবে।

১৬ দ্রুত বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে সরকারী চাকরিজীবীদের প্রতিকার প্রদানের লক্ষ্যে, বিশেষ করে ঢাকায় একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে।

১৭ সময়ে সময়ে এডহক ভিত্তিতে বেতন সংশোধন করার পরিবর্তে **সরকারকে একটি প্রাগ্রসর ইতিবাচক বেতন নীতি** (forward-looking positive pay policy) গ্রহণ করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে যাতে মজুরি ও বেতন সংকুচিত না হয়ে পড়ে, সেজন্য **মজুরি ও বেতনের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচককে (সিএলআই) সম্পর্কিত করতে হবে**। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচকের সঙ্গে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি বেতন গবেষনা/সমন্বয় সেল গঠন করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ পশ্চাৎপদ এলাকা ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে **সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে কোটা পদ্ধতি বিলুপ্ত করতে হবে।**

২ চাকরির প্রারম্ভিক বেতনে ভিন্নতা প্রদান এবং বেতন বৃদ্ধিকে কার্যসম্পাদনের মানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার লক্ষ্যে *পাইলট ভিত্তিতে ব্রড ব্যান্ড বেতন* (broad band salary) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৪ ঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ **চারটি বিভাগ একীভূতকরে মন্ত্রণালয়গুলোর সংখ্যা ২৫ এ নির্ধারণ করা যেতে পারে** ।

২ **অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ১৭ এ উল্লেখিত চারটি যথাঃ ১) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (বেনবেইস); ২) সরবরাহ ও পরিদর্শন পরিদপ্তর; ৩) বস্ত্র পরিদপ্তর; এবং ৪) ঢাকা মশক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর -এর অতিরিক্ত আরও দুইটি সংস্থা যথাঃ (১) কৃষি বিপণন ও শ্রেণী নির্ধারণ পরিদপ্তর; ও (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন অভিযোগ পরিদপ্তর বিলুপ্তির সুপারিশ করা হচ্ছে।**

৩ **২টি নতুন অফিস স্থাপন করা যেতে পারে। সেগুলো হল ঃ (১) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়; এবং (২) ন্যায়পালের দপ্তর।**

৪ **২৩১টি সরকারী অফিসের মধ্যে ১৮১টির বিষয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি যে সুপারিশ করেছে তার কোন পরিবর্তন হবে না** । অবশিষ্ট ৫০টি অফিসের জনবল সুষমকরণের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সরকার ২৩১টি সরকারী অফিসের জনবল যৌক্তিকীকরণের ভিত্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক প্রোফাইলগুলো কাজে লাগাতে পারেন।

৫ বর্তমান পরিকল্পনা কমিশনকে পুনর্গঠিত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর পরিকল্পনা সেলগুলোকে যথাযথ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

৬ **কমিশন ৪০৬৮ (+১৭৫৯ এবং +২৩০৯ যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণী)টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির এবং ২৯৯৭৪ (-১৩১৭৬ এবং -১৬৭৯৮ যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) জনবল হ্রাসের মাধ্যমে বিদ্যমান জনবলের ২৫৯০৬টি পদ (৪.৪৬%) উদ্বৃত্ত করার সুপারিশ করছে। এর ফলে বৎসরে ৭৫ কোটি টাকারও বেশী সাশ্রয় হবে।** তবে মঞ্জুরিকৃত জনবলের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত হিসাব করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১২২২২৩ (১৮.০৫%)। **কমিশন কোন কর্মরত কর্মচারীর ছাটাই সুপারিশ করে না** । সরকারের উচিত হবে শূণ্যপদগুলো উদ্বৃত্ত জনবল দিয়ে পূরণ করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় রি-ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত সংস্থায় নিয়োগ দেয়া।

৭ **কমিশন ২৮টি সংস্থার কোন কোন চিহ্নিত কার্যকলাপ চুক্তিভিত্তিতে ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করছে** । কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, মন্ত্রণালয় ও সরকারী সংস্থাসমূহকে কয়েক ধরণের কাজ যেমন, টাইপিং, বার্তা বহন, চা তৈরি, অফিসঘর ঝাড়ু দেয়া ও টয়লেট পরিষ্কার, ইত্যাদির মতো কাজগুলোকে চুক্তির আওতায় ছেড়ে দেয়ার সম্ভাব্যতা চিহ্নিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

অধ্যায় ৫ ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ

১ম ভাগ ঃ নতুন স্থানীয় সরকার কাঠামো

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ সাতটি সরকারী অফিস/সংস্থার কার্যক্রম, কর্মচারী ও বাজেট জেলা পরিষদে ও অনুরূপভাবে নয়টি সরকারী অফিস/সংস্থার একই বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। ঐসব সরকারী অফিস/সংস্থার কর্মকর্তাদের চাকরি যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করতে হবে।

২ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর প্রয়াস হবে কর আদায় সর্বাধিক করা এবং বিভিন্ন বিকল্প উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি করা।

৩ ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)/এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে প্রেষণে নিয়োগ করা হলে পরিষদের সামর্থ্য বাড়তে পারে।

৪ *কাজের বিনিময়ে খাদ্য* সহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

৫ অংশগ্রহনমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এসম্পর্কিত পুরনো ও অকেজো নির্দেশিকাগুলোর যথাযথ সংশোধন ও পরিবর্তন করতে হবে।

৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৭ **জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারে সরকারী কার্যাবলী সমন্বয় করবে। ঐ সকল এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনারত বেসরকারী সংস্থাগুলোর (এনজিও-র) প্রতিনিধিরা জেলা ও উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। এসব পরিষদের (জেলা ও উপজেলা পরিষদ) চেয়ারম্যানগণ মুখ্য সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন।**

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সংক্রান্ত সরকারী অফিস/সংস্থাগুলো বিলুপ্ত করে সেগুলো প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সঙ্গে একীভূত করে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন ও সেইসঙ্গে স্থানীয় সরকারের ইউনিটগুলোকে আরও জোরদার করা যেতে পারে।

২ বিভাগীয় স্তরের কর্মকর্তাদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের নিজ নিজ মূল সংগঠনগুলোতে আত্মীকরন করে উপযুক্ত পদে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

৩ **কেন্দ্রীয় পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (পিএইচই) -এর অফিস বিলুপ্ত করে এর যাবতীয় কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে জেলা এবং উপজেলা পরিষদে স্থানান্তর করা যেতে পারে।**

৪ জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন এলাকায় সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কেন্দ্র থেকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার সময়ে সময়ে কমিটি গঠন করে রিভিউ করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৫ **সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করবে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কর্মকমিশন পরিচালিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।**

৬ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ ও প্রয়োগের জন্য, প্রস্তুতকৃত মডেল *সার্ভিস রেগুলেশন* বা চাকরিবিধি (নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সম্বলিত) হালনাগাদ করবে।

৭ উপজেলা উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্যের ভূমিকা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে তাকে শুধু তার এখতিয়ারের অধীন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৮ সকল সরকারী অফিস/সংস্থা (হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়) তাদের বিভাগীয় প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো জেলা পরিষদের কাছে দাখিল করতে পারে। প্রতিটি জেলা পরিষদে একটি করে জেলা পরিকল্পনা ইউনিট থাকবে। এ ইউনিট জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে সেতু হিসাবে জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৯ জেলা পরিষদের মতো সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী অফিস/সংস্থা (হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়) উপজেলাভিত্তিক তাদের প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো উপজেলা পরিষদে পেশ করতে পারে।

১০ যে সকল পরিষদ সৃজনশীল কাজ করবে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত কর আদায় বৃদ্ধি করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে সরকার তাদের অতিরিক্ত বরাদ্ধ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

২য় ভাগ ঃ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা অর্পণ

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ যেন একদিকে কোন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অন্যান্য আধা-সরকারী অফিসকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে, অন্যদিকে কোন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর যেন তাদের অধস্তন অফিস/ইউনিটগুলোকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপ না করে তা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

২ বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর প্রধান তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জনগণকে পণ্য ও নির্দিষ্ট মানের গ্রাহকমুখী সেবা সরবরাহ প্রদানের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম তৈরি করবেন।

৩ প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (পারমক) কিংবা অন্য কোনো সংস্থা, যা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, নিম্নস্তরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধিকার অর্পণের বর্তমান পরিস্থিতির একটি সমীক্ষা করে এ ব্যাপারে উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে পারে ।

৪ সরকারী পণ্য ও সেবা যোগান দেয় এমন প্রতিটি সরকারী অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাকে তাদের এসব পণ্য ও সেবা সরবরাহ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য বলা যেতে পারে এবং জনগণের নিকট ঐ সকল প্রতিবেদনের প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা যেতে পারে ।

অধ্যায় ৬ ঃ দুর্নীতি দমন

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ পরিহারযোগ্য বিলম্ব এড়িয়ে অচিরেই ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে ।

২ একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য বিকল্প স্থান ও উৎস থেকে সরকারী সেবা গ্রহণের সুযোগ নাগরিকদের দিতে হবে।

৩ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যে ক্ষেত্রেই সম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে কমাতে ও পরিহার করতে হবে। অনুমোদিত ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের নীতিগুলোর পরিস্কার উল্লেখ থাকতে হবে।

৪ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দুর্নীতি দমন আইনগুলোকে দৃঢ় ও সংহত করতে হবে। দুর্নীতির অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে আইনগত যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করার লক্ষ্যে গঠিত আইন কমিশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বলা যেতে পারে।

৫ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে তার সংক্ষুব্ধতা নিরসনের জন্য সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিলের সত্যায়িত কপি সরবরাহ করতে হবে।

৬ অসদুপায়/দুর্নীতির সুযোগ কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারের উচিত সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর (যেমন, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বেসরকারী কোম্পানি গঠনের সুযোগ দেওয়া।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সকল সরকারী কর্মচারীর জন্য একটি আধুনিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে। অনুরূপভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্বাচিত কর্মকতাদের (**elected officials**) জন্য আচরণ বিধি তৈরি করতে পারে।

২ সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়/বেসরকারী খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জন্য একটি আচরণবিধি গ্রহণে সম্মত করাতে পারেন যা লঙ্ঘিত হলে তাদেরকে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

৩ সকল আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার এবং এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার রাজনৈতিক দলসমূহের চাঁদা সংগ্রহ ও অনুদান গ্রহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করতে পারেন। সরকার জাতীয় সংসদে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে তহবিল প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারেন।

৪ দুর্নীতি দমনে একটি স্বাধীন কমিশন (**Independent Commission Against Corruption- ICAC**) গঠন করা যেতে পারে।

৫ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অসদাচরন এবং দুর্নীতি দমনের জন্য ফৌজদারী বিচার কমিশন (**Criminal Justice Commission-CJC**) নামে একটি কমিশন গঠন করতে হবে।

৬ নাগরিকদেরকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ এবং দক্ষ ও স্বচ্ছ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনে এগিয়ে যেতে হবে।

৭ নাগরিকদের অযথা বিড়ম্বনা ও এ কারণে নানা ধরণের অপব্যবহার এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সরকার তার অমৌল (**non-core**) কাজ/কর্মতৎপরতাসমূহ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিতে পারেন।

অধ্যায় ৭ ঃ অপচয় হ্রাস ও অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়ন

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য হিসাব নিরীক্ষণ কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরীক্ষাকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তরকে শক্তিশালী করতে হবে।

২ যেসব স্থানে প্রাইভেট বাসাবাড়ি সহজলভ্য নয় সেসব স্থান ব্যতীত অন্যানো স্থানে সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মান বন্ধ করতে হবে।

৩ বিভিন্ন খাতে (যেমন, বিদ্যুৎ, পানি, ইত্যাদি) অযৌক্তিক 'সিস্টেম লস' বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

৪ বেসরকারী খাত যেসব ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকর ভাবে পরিবহন সেবা প্রদান করতে সক্ষম, সেসব ক্ষেত্রে পরিবহন পুলের বাসগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে বা ইজারা দিয়ে এই খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করা এবং সরকারী সংস্থাসমূহের এধরনের কর্মকাণ্ড হ্রাস করা উচিত।

৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য সহ "বিশেষ প্রকল্প" হিসেবে শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পগুলোর জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি ঠিক করতে হবে।

৬ অবিলম্বে একটি ব্যাপকভিত্তিক ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন (**Consumers Protection Act**) প্রণয়ন করতে হবে।

৭ প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন প্রতিটি সরকারী সংস্থার জন্য একটি করে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে, জমি খাতে আরও অপচয় বন্ধ করা।

৮ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে ও নতুন - উভয় ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প ভালোভাবে মূল্যায়ন করে যেগুলো বস্তনিষ্ঠ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেশি কেবল সেগুলোই গ্রহণ করতে হবে।

৯ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো নিরসনে জরুরী প্রয়াস চালাতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ বাজার সম্ভাব্যতা ও সামর্থ্যের আওতায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসওই) দ্রুত বেসরকারীকরণ করতে হবে।

২ পণ্য ও সেবা সংগ্রহের (**procurement**) জন্য বর্তমান বিধিবিধান ও পদ্ধতিকে হালনাগাদ ও স্বচ্ছ (**transparent**) করতে হবে।

৩ সরকারী খাতের হাসপাতালগুলোকে ক্রমান্বয়ে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারে শেয়ার বিক্রি করা যেতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার বেসরকারী খাতকে দেওয়া যেতে পারে।

৪ রেলওয়ের যেসব রুট ও সার্ভিস আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে এবং আরো ট্রেন সার্ভিস বেসরকারীকরণ, কিংবা লীজ বা চুক্তিভিত্তিতে চালানো যেতে পারে।

৫ সরকারী মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারী খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রাহক প্রদত্ত সকল প্রকার *ব্যবহার ফি* (users' fee) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।

৬ পর্যায়ক্রমে সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধার নগদায়ন করতে হবে।

অধ্যায় ৮ ঃ সংসদীয় পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ

১ তথ্য সংগ্রহ ও সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য তাঁদের প্রত্যেককে একটি অফিস, একটি কম্পিউটার, একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগত সহকারী এবং কিছু তহবিল দিতে হবে। ব্যক্তিগত সহকারী সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের মেয়াদকালের জন্যই নিযুক্ত হবেন। এছাড়া সরকার পরিচালনার কাজ, সংসদীয় কার্যপদ্ধতি ও বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে পরিচিতি ও প্রশিক্ষণে সংসদ সদস্যদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২ সংসদীয় কমিটিগুলোর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি কমিটির সাচিবিক সহায়তা লাভ এবং প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও তহবিল থাকতে হবে। সংসদে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো সাধারণত তাদের লিখিত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংসদে পেশ করবে।

৩ প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তত একজন করে মহিলা এমপিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

সরকারী হিসাব কমিটি (PAC) ও সরকারী আন্ডারটেকিং কমিটি (PUC) -র মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সংসদে বিরোধী দলীয় এমপিদের নিযুক্ত করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৯ ঃ বেসরকারী বিনিয়োগ সহজীকরণ

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১ বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২ শ্রমিক ইউনিয়ন/সিবিএগুলোর সকল অবৈধ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ রোধ ও অসদুপায় অবলম্বনের বিষয়ে প্রচলিত আইনের আওতায় কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩ শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছাকাছি এলাকায় মহিলা কর্মচারী/শ্রমিকদের জন্য আবাসন, তাদের শিশুদের স্বল্প ব্যয়ে দিবাপরিচর্যা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইত্যাদির ব্যবস্থাসহ মহিলাকর্মীদের অনুকূল কাজের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকার বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করতে পারেন।

৪ বিনিয়োগ সম্পর্কিত যেসব আইন এখনও হালনাগাদ করা হয়নি, বর্তমানের আবশ্যকতার আলোকে, সেগুলোকে অনতিবিলম্বে হালনাগাদ করতে হবে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রচলিত জটিল পদ্ধতির অচিরে সুরাহা করতে হবে।

৫ বিনিয়োগ বোর্ডে (বিওআই) নয়টি সংস্থা প্রদত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One Stop Service) কার্যকর করার জন্য টিম সদস্যদেরকে কৌশলগত ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল সংস্থা থেকে দ্রুত ব্যবস্থাপনা সহায়তা দেয়ার প্রয়োজন হবে।

৬ **অনাদায়ী ঋণের ব্যাপকতা, পুঁজির অপ্রতুলতা ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের বিরুদ্ধে গ্রহণ করার মতো ব্যবস্থার অভাব যথাশীঘ্র সম্ভব দূর করার জন্য চলমান ব্যাংকিং সংস্কার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে হবে।**

৭ সরকার শিল্প উন্নয়ন, কর সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা এবং আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রচারের মত অনেক কাজ চুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত করতে পারেন।

৮ সরকারী অথবা বেসরকারী মালিকানাধীন সকল শিল্পাঞ্চল/শিল্প এলাকাকে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য উপযোগমূলক সেবা দেয়ার জন্য মিনি-ইউটিলিটি কোম্পানী গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১ বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে দেশে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করার জন্য' বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল ও উন্নত করে তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে হবে।

২ লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ ও ব্যবসা সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ই-ট্রেড ও ই-কর্মাস প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

অধ্যায় ১০ ঃ সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনের ২য় খন্ডে সন্নিবেশিত অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ২৮ -এ প্রদত্ত প্রস্তাবিত **জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (পারমক)** গঠনের পুনঃ সুপারিশ করা হয়েছে।

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১.০১ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সরকারী সংস্থাসমূহ এবং সরকারী চাকরির কাঠামো ও কার্যপরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য সরকার প্রায় ১৬টির মতো প্রশাসনিক সংস্কার/পুনর্গঠন কমিশন ও কমিটি গঠন করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারের উদ্যোগে পাঁচটি প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয় (সংযুক্তি ১.১)। কিন্তু নানাবিধ অন্তরায় ও বিঘ্নের কারণে এসব কমিশন/কমিটির সুপারিশসমূহ হয় আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, অথবা আদৌ হয়নি। এর ফলে প্রশাসনের কাঠামো, কর্মপরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি ঔপনিবেশিক আমলের তুলনায় মৌলিকভাবে ভিন্ন হতে পারেনি। **একুশ শতকের প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে বিচার করলে তাই দেখা যায়, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ ও অর্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করার মতো ব্যাবস্থাপনা সামর্থ্য ও গতিশীলতা স্পষ্টতই সরকারের নেই।**

১.০২ ১৯৯৬ সনের ৮ই ডিসেম্বর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এসআরও নং -২৩৪/আইন/৯৬ বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ***জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন*** (পিএআরসি)[১] সংক্রান্ত রেজোলিউশন জারী করেন ও ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে কমিশন গঠন করেন। পরে ঐ এসআরওটি ১৯৯৭ সনের ২৮ অক্টোবর এসআরও নং-২৫০-আইন/৯৭ অনুযায়ী কেবিনেট বিভাগের এক সিদ্ধান্তে প্রতিস্থাপিত হয়[২] । এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনপ্রশাসনে সংস্কার সাধনের জন্য কমিশনকে বেশ কয়েকটি কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নাগরিকদের অধিকতর উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সরকারের অঙ্গীকার পূরণে সরকারী সংস্থাগুলোকে সমর্থ করে তোলা এবং এই লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতার মাত্রা উন্নয়নের জন্য নীতি, কার্যক্রম ও কার্যকলাপ সম্পর্কিত সুপারিশ দাভ করা।

১.০৩ কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিবসহ তিনজন পূর্ণকালীন সদস্য ও নিম্নবর্ণিত ১১ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিতঃ

(ক) কেবিনেট সচিব (পদাধিকার বলে);
(খ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব (পদাধিকার বলে);
(গ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি) (পদাধিকার বলে);
(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ (পদাধিকার বলে);
(ঙ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে);
(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'এফিসিয়েন্সী' সচিব (যদি থাকেন) (পদাধিকার বলে)[৩];
(ছ) দু'জন জনপ্রতিনিধি;
(জ) এনজিওসহ ব্যক্তিখাতের দু'জন প্রতিনিধি; এবং
(ঝ) শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি;

১.০৪ অবশ্য, ১৯৯৭ সনের ২৮ অক্টোবর গৃহীত রেজোলিউশনের বিধান অনুসারে, বেসরকারী খাত থেকে একজন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও ঐ নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, 'এফিসিয়েন্সী ইউনিট' স্থাপিত হয়নি বিধায় 'এফিসিয়েন্সী সচিব' পদেও পদাধিকার বলে কোনো সদস্যকে নিয়োগ করা যায়নি। অধিকন্তু, নারী-পুরুষ বৈষম্য সংক্রান্ত বিষয়াবলী দেখার জন্য সরকার অতিরিক্ত একজন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়োগ করেন। ফলে এ প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের সময় কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিবসহ দুজন পূর্ণকালীন সদস্য ও ১১ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল[৪]।

১.০৫ শুরুতে কমিশনের কার্যকাল দু'বছর নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান বদল হওয়ার প্রেক্ষিতে এ মেয়াদ পরে ৩০ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। প্রথমে কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মোঃ আইয়ুবুর রহমান (সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব), পরে কাজী ফজলুর রহমান, (১৯৯১-এর অন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা) এবং

---

[১] রেজোলিউশন নং এসআরও ২৩৪/আইন/৯৬, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (পরিশিষ্ট ১, ৩য় খন্ড)।

[২] এসআরও নং ২৫০-আইন/৯৭, ২৮ অক্টোবর ১৯৯৭ (পরিশিষ্ট ২, ৩য় খন্ড)।

[৩] ধারা ১ (চ), এসআরও নং ২৫০-আইন/৯৭, ২৮ অক্টোবর ১৯৯৭।

[৪] কমিশনের সদস্যদের নাম পরিশিষ্ট ৩, ৩য় খন্ড -এ সন্নিবেশিত রয়েছে।

১৯শে মে ১৯৯৮ থেকে এ টি এম শামসুল হক (প্রাক্তন সচিব এবং পরিচালক, সিরডাপ-এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র)। এ পুরো মেয়াদকালে কমিশনকে যে ম্যান্ডেট দেয়া হয় তা কমবেশি একই ছিল। **কমিশনের কাজের আওতায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর এবং অন্যান্য সকল প্রকার সরকারী অফিস এবং আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন করার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত।**

কমিশনের কার্যপরিধি

১.০৬ কমিশনের কার্যপরিধি (টিওআর) -এর আওতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য নয়টি সুনির্দিষ্ট কাজ দেয়া হয়। মোটামুটিভাবে সেগুলো হ'ল ঃ

(১) সরকারী প্রশাসনের সকল স্তরে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নের ব্যবস্থা;

(২) বেসরকারী খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ প্রসার ও আকর্ষণ করার জন্য সরকারী প্রশাসনের সকল স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য পরিবর্তন;

(৩) ব্যয় সাশ্রয়, অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার নিশ্চয়তাবিধানের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস ও সরকারী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা;

(৪) স্থানীয় সরকার আইনসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারী কার্যকলাপের বিকেন্দ্রীকরণ ও নিম্নস্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর ও ক্ষমতা অর্পণের জন্য সরকারী দপ্তর ও স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন;

(৫) সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও কার্যপদ্ধতিগত সংস্কার;

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং সরকারী প্রশাসনে জনবল যৌক্তিকীকরণ;

(৭) সরকারী প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ;

(৮) কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগ্রহণ;

(৯) আইনগত, নিয়ামক পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সেগুলো প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান।

১.০৭ কমিশনের কার্যপরিচালনায় সহায়ক হতে পারে এরকম সকল তথ্য ও দলিল সকল সরকারী সংস্থার কাছে চাওয়া ও সংগ্রহ করা, এবং সরকারী-বেসরকারী সকল ব্যক্তিকে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা কমিশনকে দেয়া হয়। আইন কমিশন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'রিফরমস্ ইন বাজেট এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল (রিবেক) প্রকল্পসহ কমিশনের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজ কাজের সমন্বয় করে নেয়ার জন্য কমিশনকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এ ছাড়াও, বিভিন্ন কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা লাভের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা[৫] নিয়োগের অধিকারও কমিশনকে দেয়া হয়।

কমিশনের কার্যপদ্ধতি

১.০৮ কমিশন স্বীয় ম্যান্ডেটের আলোকে তার ওপর অর্পিত কাজগুলো বিবেচনা করে এবং সরকারের চাহিদার প্রতি সবচেয়ে কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার জন্য কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে । সময়ের অভাবে কমিশনের পক্ষে সরকারী কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরে, পিএআরসি'র মেয়াদ আরও বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ২১টি কর্পোরেশনের পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.০৯ **কমিশন পূর্ববর্তী প্রশাসন সংস্কার কমিশন/কমিটিসমূহের প্রতিবেদনগুলো** এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট/নিবন্ধ/উপসম্পাদকীয় ও সে সাথে দেশী বিশেষজ্ঞ এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন

[৫] কমিশন ইউএনডিপি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বিজিডি/৯৭/০১০ -এর আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে ।

কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখে। কমিশন বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলসমূহ, বিভিন্ন নারী সংগঠন, এনজিও, শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ, শিক্ষাবিদ ও সংবাদ মাধ্যমসমূহের বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তি এবং জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাব্য সকল উপায় ব্যবহার করে তাদের মতামত গ্রহণ করে।

১.১০ ***সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের*** **সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা হয়, যাতে সংস্কারের নানা বিষয় সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কমিশন দেশে ও বিদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উন্মুক্ত যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য সংস্কার কর্মসূচির বিষয়ে তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার সকল প্রয়াস নিয়েছে।** এর উদ্দেশ্য ছিল দেশ-বিদেশে বৃহত্তর জনসাধারণের সাথে উন্মুক্ত যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখা। এ লক্ষ্যে কমিশন একটি ওয়েব সাইটের ব্যবস্থা করে (*http://www.Bangladesh Online. com/PARC*) যেখানে কমিশনকে অর্পিত দায়িত্বের মূল বিষয়গুলো এবং কমিশনের সদস্যদের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা রয়েছে। এতে কমিশন যে প্রশ্নমালা[৬] জরিপ পরিচালনা করে ও ওয়েব সাইটের সাহায্যে জরিপের প্রশ্নগুলো বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনের কাছে পাঠিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চায়, তারও প্রচার-প্রসার ঘটে। একই প্রশ্নমালা জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমেও প্রচার করা হয়। এ প্রশ্নমালা জরিপে যারা সাড়া দেন, তাদের অভিমত বিশ্লেষণ করে যেগুলো প্রাসঙ্গিক, সেগুলো বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়।

১.১১ কমিশনের অনুরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস অব বাংলাদেশ (এডাব) এবং ইনষ্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ (আইপিএস) প্রশাসনিক সংস্কারের মূল বিষয়গুলো সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিমত সংগ্রহের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ১৯৯৯ সনের মে থেকে ২০০০ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত কমিশন বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস, সমিতির প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাভিত্তিক সংস্থা, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং অন্যদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় করে। এতে কমিশনের কাজ সমৃদ্ধ হয় এবং এ থেকে জনপ্রশাসন সংস্কার এবং তার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৌশলগত বিভিন্ন বিকল্প কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের অভিমত পাওয়া যায়।

১.১২ **কমিশন তার এ ধরণের আলোচনা ও মতবিনিময় চালিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও বেশ কিছু সংখ্যক এনজিও প্রতিনিধি সংস্কারের মূলবিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন।** প্রতিটি আলোচনায় একটি করে মূল নিবন্ধ পাঠ ও তার উপর মতবিনিময় করা হয়। এসব আলোচনা[৭] রেকর্ড করা হয় এবং তা পরবর্তীতে তথ্য নির্দেশ হিসেবে কাজ করে।

১.১৩ কমিশন দু'টি সম্প্রসারিত জরিপ পরিচালনা করায়। এগুলো হলো: (১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত সরকারী দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কিত; ও (২) ইনষ্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ (আইপিএস) কর্তৃক সম্পাদিত বাংলাদেশে বেসরকারী (বিদেশী ও দেশী) বিনিয়োগ সহজীকরণে সরকারী প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কিত।

১.১৪ ১৯৯৯ সনের মার্চে কমিশন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (বিইউপি) সহায়তায় *বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার* শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সেমিনারে দিকনির্দেশমূলক ভাষণ প্রদান করেন। সেমিনারে আন্তর্জাতিক ও দেশী বিশেষজ্ঞরা সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন । অন্যান্যের মধ্যে ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাঙ্ক ও ডিএফআইডি'র প্রতিনিধিরা এ ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ সংগঠনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সেমিনারের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়।

১.১৫ কমিশনের ম্যান্ডেটের অধীন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেসব দেশী ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টাদের নিয়োগ করা হয়, তাঁদের কাজে কমিশন উপকৃত হয়। কাজের অংশ হিসেবে তাঁদের প্রণীত নিবন্ধগুলো কমিশনের প্রতিবেদনের জন্য একটি ওয়ার্কশপে আলোচিত হয়, যেখানে বহু বিশেষজ্ঞ ও অভিমতপ্রণেতা অংশগ্রহণ করেন।

---

[৬] পূর্ণ প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট ৪, ৩য় খন্ড -এ সন্নিবেশিত।

[৭] আলোচনা বৈঠকসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ৫, ৩য় খন্ড -এ দ্রষ্টব্য।

১.১৬ এ ছাড়াও, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, উগাণ্ডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন শিক্ষা সফরকালে ঐ সব দেশের সংস্কার সম্পর্কিত নানা সাফল্য থেকে কমিশন অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে এবং মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, ও ফিলিপাইনে আয়োজিত ছয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কমিশনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন।

১.১৭ কমিশন উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে। ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, ডিএফআইডি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। সেজন্য কমিশন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১.১৮ কমিশন সরকারের কাছে এসব বিষয়ের উপর ৩০টি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ করে, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো রকম বিলম্ব ও ব্যাপক গবেষণা ছাড়াই ব্যবস্থা নেয়া যাবে এবং খুব একটা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই সরকারী সেবা প্রদানের উপর তাদের আশু ফলদায়ক প্রভাব পড়তে পারে। এ সুপারিশগুলোর আওতায় নানা ধরনের/ব্যাপ্তির বিষয় রয়েছে, যেমন বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনের আধুনিকায়ন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জন্য অনুসরণীয় একটি কার্যসম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন ব্যবস্থার পরিকল্পনা; সরকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা; ন্যায়পাল নিয়োগ; ভ্রমণ কর পরিশোধ ব্যবস্থা সহজীকরণ; পেনশন পদ্ধতি সরলীকরণ; প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন; কতিপয় অধিদপ্তর ও দপ্তরের বিলুপ্তি এবং একত্রীকরণ, ইত্যাদি[৮]। এসব সুপারিশের মধ্যে ছয়টি সুপারিশ, যেমন - সরকারী সংস্থার জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়ন, উপযোগ বিল এক স্থানে পরিশোধের ব্যবস্থা, ভ্রমণ কর পরিশোধ ব্যবস্থা সরলীকরণ, কার্য উন্নয়ন টীম গঠন, সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার ব্যবস্থা এবং 'সেবার জন্য প্রশাসন' -এ শ্লোগানের প্রচার-প্রসারের বিষয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় ও এগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিবেদনের কাঠামো

১.১৯ **এ প্রতিবেদন তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত**। প্রথম খণ্ডটি হচ্ছে মূল প্রতিবেদন। এর দশটি অধ্যায়ে কমিশনের কার্যপরিধিতে বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা রয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহের সারাংশসহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি (০-২ বছর) ও দীর্ঘমেয়াদি (২ বছরের বেশী) সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ অংশে কমিশনের ম্যান্ডেটের প্রতিফলন রয়েছে। যে সব সংস্কার হাতে নিতে হবে সেগুলোর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সরকারের কাছে ইতোমধ্যেই পেশকৃত ৩০টি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশের সবগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রথম খন্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত পরিশিষ্টগুলো সংকলিত হয়েছে। ১ম খন্ডের অধ্যায়-১-এ কাজের পরিসর এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য গৃহীত পদ্ধতিসমূহের বিবরণ রয়েছে; অধ্যায়-২-এ ক্রমাবনতিশীল সরকারী সার্ভিস প্রদান ব্যবস্থা উন্নয়নের আলোচনা রয়েছে। অধ্যায়-৩-এর আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারী অফিসগুলোতে দক্ষতা, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা উন্নয়নের জন্য সিভিল সার্ভিসের সংস্কার। অধ্যায়-৪-এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল যৌক্তিকীকরণের আলোচনা রয়েছে। অধ্যায়- ৫-এ মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং অধ্যায়-৬-এ সর্বব্যাপী দুর্নীতি দমনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়-৭-এ রয়েছে সরকারী খাতে অপচয় হ্রাস ও গ্রাহকদের দেয়া টাকার বিনিময়ে যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা। অধ্যায়-৮ এ সংসদীয় ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয় বিশ্লেষন করা হয়েছে এবং অধ্যায় ৯-এ রয়েছে বাংলাদেশে বেসরকারী বিনিয়োগ সহজীকরণের বিষয়ে আলোচনা। অধ্যায়-১০ এ উপরোল্লিখিত সকল অধ্যায়ে প্রণীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৮] প্রতিবেদনের ২য় খন্ডে অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৯৭১-১৯৯৭ মেয়াদকালে জনপ্রশাসন সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়াবলী সমীক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন ও কমিটিসমূহ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা প্রণীত প্রতিবেদনসমূহের তালিকা

ক. সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন/কমিটিসমূহ

ক্রমিক নং	কমিশন/ কমিটির নাম	প্রধান বিষয়
১.	প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (এআরসি), ১৯৭১	*বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সরকারের জন্য সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন*
২.	প্রশাসনিক ও সার্ভিস কাঠামো পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৭২	*সার্ভিস কাঠামো*
৩.	জাতীয় বেতন কমিশন, ১৯৭২	*বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলি*
৪.	বেতন ও সার্ভিস কমিশন, ১৯৭৭	*সার্ভিস কাঠামো ও বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলি*
৫.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ পরিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি, ১৯৮২	*সরকারি খাতের সংস্থাসমূহের সংগঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ*
৬.	প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৮২	*জেলা/উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের পুনর্গঠন*
৭.	জাতীয় বেতন কমিশন, ১৯৮৪	*বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলি*
৮.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, ১৯৮৫	*পদোন্নতির বিষয়াবলি*
৯.	সিনিয়র সার্ভিস পুল কাঠামো পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি, ১৯৮৫	*সিনিয়র সার্ভিস পুল কাঠামো (এসএসপি)*
১০.	মন্ত্রীপরিষদ উপ কমিটি ১৯৮৭	*এসএসপি পর্যালোচনা ও পদোন্নতির বিভিন্ন বিষয়*
১১.	পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে কতিপয় সরকারি দপ্তর রাখার প্রয়োজনীয়তা পুনঃপরীক্ষা কমিটি, ১৯৮৯	*কতিপয় সরকারি দপ্তর রাখা বা না রাখার প্রয়োজনীয়তা*
১২.	জাতীয় বেতন কমিশন, ১৯৮৯	*বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলি*
১৩.	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন, ১৯৯১	*স্থানীয় সরকারের কাঠামো*
১৪.	জাতীয় বেতন কমিশন, ১৯৯৬	*বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলি*
১৫.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি), ১৯৯৬	*মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ইত্যাদির কাঠামো ও জনবল যৌক্তিকীকরণ*
১৬.	স্থানীয় সরকার কমিশন, ১৯৯৭	*স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি বৃদ্ধি*

খ. উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় ১৯৭১-১৯৯৭ মেয়াদে প্রণীত অন্যান্য প্রতিবেদন

	প্রতিবেদনের নাম	প্রধান বিষয়
১.	জনপ্রশাসন দক্ষতা সমীক্ষা, ১৯৮৯ (জড়িত সংস্থা ঃ ইউএসএআইডি)	*সচিবালয় ব্যবস্থা। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক*
২.	বাংলাদেশে জনপ্রশাসন খাত সমীক্ষা প্রতিবেদন, ১৯৯৩ (জড়িত সংস্থা ঃ ইউএনডিপি)	*কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে জনপ্রশাসন সংস্কার*
৩.	বাংলাদেশে উন্নততর সরকারের লক্ষ্যে, ১৯৯৩ (৪ সচিবের প্রতিবেদন) - (জড়িত সংস্থাঃ ডিএফআইডি)	*প্রশাসনিক ও কার্যপদ্ধতিগত বিষয়াবলির উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়*
৪.	একটি দক্ষ সরকারে রূপরেখাঃ সরকারি খাতের সংস্কার, ১৯৯৬ (জড়িত সংস্থা ঃ বিশ্ব ব্যাংক)	*সর্বাঙ্গীন প্রশাসনিক সংস্কার, বেসরকারিকরণ ও সরকারের হ্রাসকৃত স্তরসমূহ*
৫.	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার-- শাসনের এক কর্মসূচি, ১৯৯৬ (জড়িত সংস্থা ঃ ইউএনডিপি)	*স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বিষয়াবলি*

অধ্যায় ২

সরকারী সেবাপ্রদান উন্নতকরণ

২.০১ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি)-এর কাজের পরিসর সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সরকার জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল স্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন। সাফল্যের সঙ্গে সরকারী সেবা প্রদানের জন্য এসব বিষয়ে উন্নতি অপরিহার্য। এদের ভিতর যথার্থ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক সমর্থনই শেষ পর্যন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের উন্নতি ঘটায় এবং এর ফলে তারা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। অবশ্য, এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে হলে কাঙ্খিত ফল লাভের জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত থাকতে হবে। মৌলিক উদ্দেশ্যটি হবে জাতীয় অগ্রগতি তরান্বিত করা, দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং জনগণকে দেয়া সেবা উন্নতি করে তাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

২.০২ বাংলাদেশের সকল স্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের যে সমালোচনা হচ্ছে, সেগুলো কয়েকটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। পিএআরসি এসব প্রতিবেদন, বিশেষ করে গত দশ বছরে প্রণীত প্রতিবেদনগুলো, পর্যালোচনা করে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণত **অনড়, অসংবেদনশীল, অদক্ষ, অকার্যকর ফলাফলের চাইতে প্রক্রিয়া নিয়েই বেশি ব্যতিব্যস্ত এবং সেকেলে আইন ও বিধান দ্বারা চালিত বলে অভিহিত করা** হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের পরিবর্তনশীল চাহিদার ব্যাপারে অসংবেদনশীল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা সাধারণত জনগণের *সেবকের* মতো আচরণ করেননি, বরং করেছেন *প্রভু* -র মতো; তারা অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত; জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার দায় থেকে তারা মুক্ত বলেই যেন মনে করেন, এবং তাদের প্রকৃত চর্চা থেকে *দক্ষতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা* -এর ধারণাগুলো যেন বহু দূরে অবস্থিত। কোনো কোনো সরকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো আধুনিক সরকারী ব্যবস্থাপনায় যেসব পরিবর্তন ঘটেছে কিংবা ঘটছে সে সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু কাজের পরিবেশের কারণে এসব পরিবর্তন তাদের প্রশাসনিক আচরণে এবং জনসেবায় তাদের সরকারী দায়িত্বের ক্ষেত্রে পৌছায়নি। আজকের এ উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী মূল কারণগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

দূরদৃষ্টি ও প্রত্যয়ী উদ্দেশ্যের অভাব

২.০৩ প্রচলিত একটি সাধারণ ধারণা এই যে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সরকারী কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানি ও অবমাননা করেন। সরকারী কর্মকর্তা ও জনসাধারণের মধ্যকার সম্পর্কটি *সুবিধাদানকারী* ও *সুবিধাভোগীর* রূপ নিয়েছে – যদিও সরকারী কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা। সাধারণ মানুষ জানে না কেমন করে এবং কোথায় নির্দিষ্ট সেবাগুলো পাওয়া যাবে; এজন্য প্রায়শই তারা দালালদের ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের শিকার হয়। জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ কার্যপদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সেবার মন্থর গতির জন্য জনগণের দুর্ভোগ ঘটে এবং সময় ও সম্পদের অপচয় হয়। এ কারণে **জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় 'সিটিজেনস চার্টার' বা নাগরিকদের অধিকার সম্বলিত 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তনের প্রয়োজন। এ নাগরিক অধিকার সনদ মূলত একটি দলিল, যাতে থাকবে প্রাপ্য সেবার একটি তালিকা এবং এ ধরণের সেবা যেসব সংস্থা দিয়ে থাকে তাদের তরফ থেকে দক্ষতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে তা দেয়ার অঙ্গীকার**। এর ফলে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে যথার্থ সেবা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে। অতীতে সরকারী সংস্থাগুলোকে তাদের টিকে থাকার যুক্তিটি পরিষ্কারভাবে সজ্ঞায়িত করা এবং তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড, তারা কি পেয়েছে এবং কি দিয়েছে, এসবের একটা সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ফল লাভ করা যায়নি। নাগরিক সনদ চালু করা হলে তা সেবা প্রদানের একটি সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে ও তাকে পরিপুষ্ট করবে এবং গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান উন্নত করবে। কমিশন ইতোমধ্যে এ উদ্দেশ্যে সেবা প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান ও নাগরিক সনদ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করেছে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং -২৩)।

২.০৪ প্রতিটি সংস্থারই একটি ভিশন (Vision) ও মিশন (Mission) থাকা প্রয়োজন। **প্রচলিত বিধিবিধানসমূহ প্রয়োগে বড় ধরনের ব্যর্থতার জন্য শৈথিল্যের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে**। কমিশন প্রচলিত আইন-কানুন, বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ, ইত্যাদির কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে

(অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং-৮)। আজকের শিথিল পরিবেশে তাই যেখানে সম্ভব "কার্য সম্পাদনের মান" নির্ধারণ করা অথবা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা খুবই প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমিশন কার্যসম্পাদন মান প্রবর্তন ও অর্জিতব্য লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং-২৩)। বহুক্ষেত্রেই কার্যসম্পাদন পরিমাপ করা কঠিন; একই কারণে, **দক্ষতা ও কার্যকারিতা** পরিমাপ করাও শক্ত। একটি প্রতিষ্ঠানে গতিশীলতা আসবে কেবল তখনই যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে এর উদ্দেশ্য ও কাজগুলোকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য অনুপ্রেরণা থাকবে।

গোপনীয়তার সংস্কৃতি

২.০৫ একজন সরকারী কর্মকর্তা যদি তার প্রতিষ্ঠান কি কি সেবা দিয়ে থাকে তা গ্রাহকদের জানাতে চান, তাহলেও আজকের গোপনীয়তার পরিবেশ তাকে বিরত রাখবে। আইন কর্তৃক আরোপিত গোপনীয়তার সংস্কৃতির কোনো পরিবেশে *স্বচ্ছতার* মূল নির্যাসই হারিয়ে যায়। সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণ এবং কর্মকান্ড সরকারী গোপনীয়তা আইন ১৯২৩[১], সাক্ষ্য আইন ১৮৭২[২] ও সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯[৩], ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট আইনের নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হলে এসব আইন বিধির সংশোধন প্রয়োজন। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোপনীয় নয় – এমন তথ্যাদির বেলাতেও , একই সংস্থা কিংবা সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে এমন প্রায় সকল ধরণের তথ্য লাভের অধিকার প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানে নিষিদ্ধ – যা সরকারের স্বচ্ছতার মূল বিষয়টিকে নস্যাৎ করে দেয়। **সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত এবং উন্মুক্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হলেই জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়ে থাকে**। এভাবেই স্বচ্ছতা সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন ফর্ম হালনাগাদ ও সহজীকরণ

২.০৬ জনসাধারণকে উন্নততর সেবা প্রদানের একটি উপায় হল সরকারী অফিসগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্ম সহজীকরণ ও হালনাগাদ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ফর্মগুলো (যাদের বেশিরভাগই ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি) বাতিল করা। প্রয়োজনে সরকারের নাম বদলানোর মতো ছোটখাটো কিছু রদবদল করা ছাড়া, ফর্মগুলো কার্যতঃ সেই ঔপনিবেশিক আমলেরই রয়ে গেছে যা আজকের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। এ কারণে, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, বিশেষ করে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোতে ব্যবহৃত ফর্মগুলো সরল ও সহজ করে তোলা অপরিহার্য। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ফর্মগুলোর ব্যবহারও বন্ধ করা আবশ্যক। ফর্ম সহজীকরণ ও বাতিল করার কাজটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানগুলোকে করতে হবে। **এক্ষেত্রে পিএআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন -এর (১০ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ন্যায় একটি সংস্কার প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারে**।

অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ

২.০৭ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষমতা ও ব্যবস্থা গ্রহণের কর্তৃত্ব বাস্তবে বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত কেন্দ্রীকৃত এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান নির্দেশাবলির লঙ্ঘণও বটে। সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলি এবং আর্থিক সম্পদ ও ব্যয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত। কঠোরভাবে নির্ধারিত ও মেনে চলা বিধিবিধানের ভিতরে থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত নির্দেশাবলি লঙ্ঘন করে শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রতি একান্ত আনুগত্যের কারণে আমলাতন্ত্রের নিম্নতর স্তরগুলোতে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। **সেকেলে ক্রম-পরম্পরার আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্থর প্রক্রিয়া এবং ঝামেলাপূর্ণ রীতিপদ্ধতির কারণে**

---

[১] ১৯২৩ সনের সরকারী গোপনীয়তা আইনের মূল বিষয় হল: সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকা আছে যেখানে কারও প্রবেশ বা ফটো তোলা নিষিদ্ধ এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি ছাড়া কেউ এসব নিষিদ্ধ এলাকার কোনো তথ্য, দলিল, পরিকল্পনা, মডেল, নকশা ইত্যাদি পেতে পারবে না ও সেগুলো দেশের শত্রু বা বিদেশী চরদের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না যাতে দেশের নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিপন্ন না হয়।

[২] সাক্ষ্য আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার আওতায় বিশেষ অধিকারমূলক হিসাবে বিবেচিত দলিল ও যোগাযোগমূলক উপকরণাদি প্রকাশের বিষয়টি সংরক্ষিত। ১২৩ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে অপ্রকাশিত রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে কেউ সাক্ষ্য দিতে পারবে না। অনুমতি দেয়ার ব্যাপারটা দপ্তর প্রদানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

[৩] ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধির ১৯ নং বিধানের আওতায়, কোনো সরকারী কর্মচারী সরকার প্রদত্ত কর্তৃত্বাধিকার ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ কার্যকলাপে নিয়োজিত অন্য কোনো সরকারী কর্মকর্তাকে কোনো সরকারী দলিলের বিষয়বস্তু সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জানাতে, বা সরকারী দায়িত্ব পালনকালে তার হাতে আসা কোনো তথ্য দিতে পারবেন না।

দায়িত্বশীলতা কমে যায় এবং জবাবদিহিতার ধারণাটি অচল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীভূতকরণের সম্পূরক হিসেবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বাড়াবাড়ি ঘটে যা স্বেচ্ছাচারী কাজ, ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার ও দূর্নীতি প্রসারের একটি ফর্মুলা এবং সেইসাথে দূর্নীতি প্রসারের উর্বরক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন কেন্দ্রীকৃত হলে ও সকল স্তরে অধস্তনদের কাছে দায়িত্বভার অর্পণের অভাব থাকলে স্বচ্ছতা সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার স্তরসমূহ

২.০৮ এ রকম একটি সাধারণ অভিযোগ রয়েছে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারী মালিকানাধীন সংস্থাগুলোতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি জটিল, ভারাক্রান্ত ও দীর্ঘসূত্রী। সাধারণত পাঁচটি স্তরে এ প্রক্রিয়াটি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় কোনো বিষয়ের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় ও জনসাধারণের হয়রানি বাড়ে, যদিও ১৯৭৬ সনের সচিবালয় নির্দেশমালায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তিনটির বেশি স্তর সংশ্লিষ্ট থাকবে না। তবুও লক্ষ্য করা গেছে যে, কোনো কোনো সময় বড় ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ দশটিরও বেশি স্তর জড়িত হয়ে পড়ে। কাজেই প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট এমন ভাবে ক্ষমতা অর্পন করবে যে, কোন সিদ্ধান্ত যেন তিনটি স্তরের বেশী অতিক্রম না করে।

অপর্যাপ্ত বেতন

২.০৯ কাজ ও বেতনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। সরকারী কর্মচারীরা যে কাজ করেন সে জন্য তাদের অবশ্যই যথাযথ বেতন দেয়া দরকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কাজের মূল্য টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তবে তাদেরকে অবশ্যই পর্যাপ্ত বেতন দিতে হবে। একটি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য বেতননীতি সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ কর্মমান, মনোভাব, দক্ষতা ও সততা সমুন্নত রাখতে সহায়ক হতে পারে। শুধু ভালো বেতনই সরকারী কর্মচারীদের সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দক্ষতার গ্যারান্টি না হলেও এ কথাও সত্যি যে, একজন সরকারী কর্মচারীর বেতন তার বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হলে দুর্নীতি ও অদক্ষতার সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে ব্যাপক অদক্ষতার অন্যতম কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি কম বলে অনেক সময় অভিযোগ করা হয়। বর্তমানে সিনিয়র কর্মকর্তাদেরকে যে বেতন ভাতা ও সুবিধাদি দেয়া হয় তা দিয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোও মেটানো সম্ভব হয় না। মনে রাখা দরকার, অপর্যাপ্ত বেতন কোনো সাশ্রয় নয় বরং ব্যয়। সরকারের সকল কর্মকর্তাকে সরকারের আয়তন যথাযথ করা সাপেক্ষে বাজারভিত্তিক বেতন দিতে হবে। অধিকন্তু ব্যক্তিখাতের ন্যায় এটার ভিত্তি হবে নিয়োগ ও অপসারণ নীতি। এ ধরণের বাজার ভিত্তিক বেতন পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে চালু করা যেতে পারে। সিভিল সার্ভিস সংস্কার শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা প্রয়োগে দুর্বলতা

২.১০ নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষা ও জবাবদিহিতার উপায়-পদ্ধতিগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও এগুলো দুর্বল ও প্রায়শই নিষ্ক্রিয়। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থাগুলোও দুর্বল আর জমে থাকা কাজের স্তুপ ও জটিল কার্যপদ্ধতির গুরুভারে ভারাক্রান্ত। হিসাব নিরীক্ষার কোনো ''ফল'' দেখা যায় না; প্রক্রিয়াটি বরং শুধুই বিধিবিধান মেনে চলা ও সেগুলোর প্রয়োগের ব্যাপারেই মনোযোগী। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব নিরীক্ষণ — এ উভয় কাজ একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে সমন্বিত থাকায় প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড ও অবৈধ ব্যবস্থাগ্রহণ সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠান যেসব প্রতিবেদন প্রদান করে সেগুলো বহুকাল আগের ঘটনার উপর তৈরি। প্রতিবেদনগুলো অপরীক্ষিত থেকে যায় এবং অভিযুক্ত অনেকেই শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যায়। এর ফলে এ থেকে অন্যেরা অপরাধের প্রেরণা পায়। প্রায়শ অনিয়মের উপর দেয়া রিপোর্টগুলো অপর্যাপ্ত প্রমাণ এবং হিসাব নিরীক্ষণে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে অমূলক বলে খণ্ডন করা হয়। বলা হয়, এসব নিরীক্ষা যারা চালান তারা জুনিয়র পর্যায়ের এবং তাদের দক্ষতাও তেমন উন্নত নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রিফর্মস্ ইন বাজেট এন্ড এক্সপেনডিচার কন্ট্রোল (আরআইবিইসি বা রিবেক) প্রকল্প বাজেটগত সংস্কারের বিষয়ে কাজ করছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন অফিসে এ সংস্কার বাস্তবায়নের গতি মন্থর বলে প্রতীয়মান হয়।

২.১১ বর্তমানে প্রচলিত বাজেট প্রক্রিয়া ও অধিদপ্তরগুলোর হিসাব সংরক্ষণ রীতি ও চর্চায় কোনো লেনদেনের সঠিক ব্যয় সবসময় নির্ধারণ করা যায় না। বাজেটের সঙ্গে কার্যক্রমগুলোর সাধারণত কোনো সম্পর্ক থাকে না বলেই মনে হয়; পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ (cost accounting) কার্যত অনুপস্থিত, এবং যথাযথ প্রযুক্তি ও সংরক্ষণ ব্যয়, সুনির্দিষ্ট ও পরিমাণগত প্রয়োজনের বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সনাতন ধারায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া, মজুত সামগ্রীর ফর্দ নিয়ন্ত্রণের কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিও নেই বলে মনে হয়। কাজেই *ইনপুট* (input) ও *আউটপুট* (output) -এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করা কঠিন ও তা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে দক্ষতার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর আর্থিক সিদ্ধান্ত ও লেনদেনের দায়দায়িত্বও একইভাবে অনুপস্থিত।

২.১২ বর্তমানে বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বেলায় কার্যসম্পাদন হিসাব নিরীক্ষণ (performance audit) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য,সরকারী খাতের সংস্থাগুলো কি সেবা দিচ্ছে এবং প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে সেগুলো থেকে সমাজের প্রাপ্ত সেবা পর্যাপ্ত কিনা (যে উদ্দেশ্যে এসব সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল) এ আলোকে তাদের কার্যসম্পাদনের নিরীক্ষণ করা হয় না। নাগরিকদের উন্নততর সেবা দানের জন্য সরকারী মালিকানাধীন সকল সংস্থার কার্যসম্পাদন নিরীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। বর্তমান হিসাব নিরীক্ষণ ব্যবস্থা কোনো সরকারী সংস্থার বছর/মাসওয়ারি প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের নিরীক্ষণ হওয়ার পরিবর্তে প্রধানতঃ বিধিবিধান প্রতিপালনমূলক ব্যবস্থা মাত্র। **নিরীক্ষণ (audit) এর কার্যকারিতার জন্য এটিকে হিসাবরক্ষণ (accounts) থেকে আলাদা করা উচিত**। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি) -এর জন্য কেবল নিরীক্ষণের কাজটি রেখে দিতে হবে। বর্তমানে নিয়মকানুন রক্ষার যে হিসাব নিরীক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার পরিবর্তে সার্বিক (comprehensive) হিসাব নিরীক্ষণের জন্য চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসহ যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। ১৯৯৬ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি) গোটা হিসাব রক্ষণ কার্যক্রমকে বিভাজিত করার, অর্থাৎ প্রতিটি সরকারী বিভাগ বা দপ্তরে হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখার যে প্রস্তাব করেছিল তার আওতায় যথাযথ, সময়মত ও দ্রুত উপযোজন(appropriation) ও আর্থহিসাবগুলো প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে। প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থায় সরকারের হিসাব খাতগুলো বর্তমানের মতো 'বকেয়া' না থেকে 'হালনাগাদ' থাকবে।

২.১৩ কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার জন্য বরাদ্দ দেয়া সম্পদ কাজে লাগিয়ে বাস্তবে সমাজের জন্য পর্যাপ্ত সেবা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি থাকে। **কোনো সংস্থার সাফল্য বা ব্যর্থতার বিচার সংস্থাটি কোন্ বিধিবিধান অনুসরণ করে তার আলোকে নয়, বরং এ সংস্থার কার্য সম্পাদন/প্রদেয় সেবার ভিত্তিতেই করা উচিত**। যে কোনো সংস্থায় মেধাভিত্তিক **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা** (এইচআরএম) প্রেরণা যোগাতে পারে ও শাস্তি আরোপ করতে পারে এবং সেইসাথে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের জন্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে অক্ষমদের সরিয়ে দিতে পারে।

২.১৪ বিচার বিভাগ জবাবদিহিতার আরেকটি অবলম্বন হলেও এ বিভাগের সুবিধা বহুলাংশেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। সরকারের নির্বাহী শাখা থেকে এ বিভাগের পৃথক হওয়া এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও[৪] বিশেষ করে, বিচার বিভাগীয় নিম্নতর স্তরটি সরকারের নির্বাহী শাখার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে। এটি সংবিধানের বিধান থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী, বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ কিংবা বিচারবিভাগীয় কাজ পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ, পদায়ন (posting) ও বদলি হওয়াসহ চাকরির অন্যান্য শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে (এবং তিনি সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনাক্রমে)[৫]। তবে বাস্তবে এ যাবতকালের চর্চা অনুযায়ী, বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ কিংবা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ প্রদানের কাজটি করেছে সরকারের নির্বাহী শাখা। এ বিভাগ মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) , অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম (এসিএমএম), মহানগর হাকিম (এমএম) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) পদে নিয়োগের বেলায় সুপ্রিম কোর্টের সাথে ইতোপূর্বে পরামর্শ করেনি। তবে সাম্প্রতিককালে সিএমএম, এসিএমএম, ও এমএম নিয়োগের বেলায় সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে। বিচার বিভাগীয় পদের নিম্নস্তরের কর্মকর্তা এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যথাক্রমে আইন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

---

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ সমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন"।

[৫] সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২.১৫ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষিত নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ থেকে বিচার অঙ্গ আলাদা করার কাজগুলো পরিচালনার জন্য এআরসি একটি সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব করে, যার নাম দেয়া হয় **সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়**। উক্ত কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল অধস্তন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার বদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের দায়িত্ব সম্পাদন করবে সুপ্রিম কোর্ট। কমিটির মতে, সুপ্রিম কোর্টের হাতে বিচার বিভাগের প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ অর্থপূর্ণ হতে পারে না। একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হওয়ার পর যা করার থাকবে, তা হ'ল প্রয়োজনীয় আইন পাশ করে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তর করা।

২.১৬ সংবিধানের আরেকটি বিধান হ'ল, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার, সরকারী সেবার অকার্যকর যোগান এবং সরকারী কর্মকর্তাদের হাতে নাগরিকরা সাধারণত যেসব অন্যায় আচরণ পেয়ে থাকেন সেগুলো থেকে উদ্ভূত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ন্যায়পাল-এর পদ সৃষ্টি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। ১৯৮১ সালে সত্যিকার অর্থে ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইন পাশ করা হয়, যদিও এ আইন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ইতোমধ্যেই পিএআরসি যতো শীঘ্র সম্ভব ন্যায়পাল-এর পদ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং -৪)।

২.১৭ সংসদীয় পর্যবেক্ষণ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার হলেও বাস্তবে অত্যন্ত দুর্বল বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এ প্রতিবেদনের অধ্যায়-৮-এ নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদীয় পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের আলোচনা রয়েছে। নির্বাহী বিভাগের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেমনটি প্রত্যাশিত সেরকম কাজ করছে না।

২.১৮ জাতীয় সংসদ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেসব তহবিলের বরাদ্দ প্রদান করে সে সব যথাযথভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা এবং তার সঠিক হিসাব রাখা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার ম্যান্ডেট সরকারী হিসাব কমিটি (পিএসি) -এর রয়েছে। পিএসি এ কাজটি সিএন্ডএজি'র নেতৃত্বে হিসাব নিরীক্ষণ দপ্তরের সহায়তায় করে থাকে। সিএন্ডএজি সরকারী তহবিল প্রাপ্ত সরকারের সকল বিভাগ ও সংস্থার আর্থিক কার্যকলাপ পরীক্ষা করে থাকেন। সিএন্ডএজি'র প্রতিবেদন সময়মতো পাওয়া গেলে পিএসি তার কাজ যথাযথভাবে করতে পারে। বস্তুত, পিএসি ও সিএন্ডএজি-র অফিস জবাবদিহিতা এবং আর্থিক স্বচ্ছতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার কাজে একে অন্যের সম্পূরক। তবে **বিগত কয়েক দশকে পিএসির কর্মসম্পাদন ও কার্যকারিতা নূন্যতম বা নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিএসিতে সরকারী তহবিলের অপব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে সিএন্ডএজি'র সুপারিশগুলো বহু বছর যাবৎ পড়ে থাকে**। নানা কারণে সরকারী বিভাগ ও সংস্থাগুলোর নেয়া বহু প্রকল্প তাদের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে না। এসব প্রকল্পে অর্থের অপব্যয়ের হিসেব পাওয়া যায় না। এমনকি, পিএসি জনপ্রতিনিধিদের একটি শক্তিশালী ফোরাম হলেও এ কমিটির হাতে তার নিজ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কোনো উপায় নেই। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করে নির্বাহী শাখা। সংসদে কমিটির সুপারিশ নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলেও এগুলো সব সময় বাকি সদস্যদের যথাযথ মনোযোগ পায় না। **সংসদীয় পর্যবেক্ষণ** শীর্ষক অধ্যায়ে বিষয়টির বিশদ আলোচনা রয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

২.১৯ বাংলাদেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) -র ব্যবহার বলতে গেলে বিরল এবং হয়ে থাকলেও অত্যন্ত দুর্বল। তথ্যের নানা মাধ্যম ব্যবহারের সহজাত সুবিধা ও লাভ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা থাকলেও এবং স্বচ্ছতাকামী যে কোনো সংস্থার জন্য তথ্য যে *জীবন-প্রবাহ* স্বরূপ - এ উপলব্ধি থাকলেও, **সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনও তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তন সম্পর্কিত নীতির এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাব রয়েছে**। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত জনসম্পদের অভাবও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের নিম্নহারের কারণ। তথ্য প্রযুক্তির সরঞ্জামগুলো লোক-দেখানোর জন্য অযথা সাজিয়ে না রেখে এগুলোকে তথ্য-পরিবেশ সৃষ্টি এবং সরকারী সংস্থাগুলোতে দক্ষতা, কার্যকারিতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কাজে যথাযথ ব্যবহার করা যেতো। গ্রাহকদের আরও উন্নততর সেবা প্রদানের জন্য উপযোগ সংস্থাগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার সম্ভব। তথ্য প্রচার ও বিস্তারের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই-মেইল, অন-লাইন সার্ভিস ইত্যাদিকে কাজে লাগানো যায়।

২.২০ কোনো বিশেষ অধিদপ্তর/দপ্তর কিংবা সংস্থার গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিস বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যর্থনা কক্ষে স্থাপিত কম্পিউটার সেবা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, যেমন কর্মপদ্ধতি, কি কি সেবা পাওয়া যায় সেগুলোর তালিকা, সেবা লাভের শর্তাবলী, ইত্যাদি রাখা যায়, যেখান থেকে একজন গ্রাহক যে সেবা চান সে সম্পর্কে সহজেই তথ্যাদি পেতে পারেন। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ও বিভাগের ভেতরের নানা শাখার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়; যেমন, একটি বিভাগের মধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (এলএএন) ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের (ডব্লিউএএন) মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। এর ফলে আরও সহজে ও দ্রুততার সাথে গ্রাহকদেরকে সেবা দেয়া যাবে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকজনের তরফ থেকে কথিত গ্রাহক হয়রানিও কমে যাবে। যোগাযোগের আধুনিক উপায়গুলোর ব্যবহার ও তথ্যের দ্রুত বিনিময় উৎসাহিত করার জন্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি বদলাতে হবে।

২.২১ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণ করা হলে জনবলের পরিমাণ কমে যায় ও বহু পদ অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক[৬] হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক আকারে ও পদ্ধতিসম্মত উপায়ে তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এটি তাই অনীহা ও নিশ্চলতার জন্ম দেয়, এবং আমলাতন্ত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রবণতা দেখা দেয়। **জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব ফাইবার অপটিক্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সমুদ্রের নিচ দিয়ে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল -এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য মহাসড়কের (Information Super Highway) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।** বাংলাদেশ রেলওয়ের হাতে বর্তমানে যে ফাইবার অপটিক্স রয়েছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিৎ। তবে আশার বিষয় এই যে, সম্প্রতি এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং সাবমেরিণ ক্যাবল সংযোগের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলছে। **তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাজেটে আরও বেশি বরাদ্দের এবং এ প্রযুক্তির দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারে সর্বাঙ্গীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য।** পিএআরসি তহবিলের সীমাবদ্ধতা, প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাব ও অন্যান্য কারণ বিবেচনায় রেখে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং -২৭)।

দৃষ্টিভঙ্গীগত অন্তরায় এবং কর্মচারী ব্যবস্থাপনা

২.২২ সরকারী সংস্থাগুলোতে দক্ষতা, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে উল্লিখিত সকল ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ভিতর থেকে অনুপ্রেরণা এবং বাইরে থেকে কিছু নিয়ন্ত্রণ ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাদের কাজের মনিটরিং হচ্ছে ও তাদের উৎপাদনশীলতার পরিমাপ হচ্ছে — এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়াও, চলতি সব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নিজেদের অবহিত ও হালনাগাদ রাখার দক্ষতা ও পদ্ধতির দরকারও তাদের রয়েছে। কর্মকর্তা নিয়োগ ও পদোন্নতির পদ্ধতিটি আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিৎ যেহেতু সরকারী চাকরিতে তা সবসময় শুধু মেধার ভিত্তিতেই হয় না। বার্ষিকভিত্তিতে তাদের মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব রয়ে যায় ও সে কারণে বেশিরভাগ কর্মকর্তাকে উচ্চহারে মূল্যায়ন করা হয়। এ পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের কোনো বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহন সম্ভব নয়। সাধারণত এরকম ভাবা হয় যে, রাজনৈতিক আনুগত্য, স্বজনপ্রীতি ও আনুকূল্যের মতো বিষয়ই অনেক ক্ষেত্রে সরকারী চাকরিতে উন্নতির নির্ণায়ক। সরকারী কর্মকর্তারা কাজ ভালো করুন বা নাই করুন দীর্ঘকাল চাকরি করার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই মিলিতভাবে এক উজ্জ্বল ক্যারিয়ার নিশ্চিত করে। পিএআরসি **জনসেবার জন্য প্রশাসন** – এ মর্মে একটি শ্লোগান প্রবর্তনের বিষয় সুপারিশ করেছে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ২০) যা প্রশাসনের সদস্যদের প্রেরণা দিয়ে ও তাদের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে নাগরিক বা গ্রাহকদের প্রতি তাদের সেকেলে মানসিকতার পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

[৬] তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সকল সরকারী অফিসের 'শাখা', 'ব্রাঞ্চ' ও 'উপবিভাগ' বর্তমান জনবল অর্ধেকে কমানো যায়, যেমন - একটি মন্ত্রণালয়ের শাখায় চারজন কর্মচারী-সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টেনো-টাইপিস্ট ও এমএলএসএস -এর পরিবর্তে তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তিত হলে কম পক্ষে দু'টি পদ সেখানে অতিরিক্ত হয়ে পড়বে।

২.২৩ জনসেবা প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করছেঃ

ক. অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

পিএআরসি তার অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহে[৭] সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সেবামুখী সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নের প্রস্তাব করেছে। এসব সুপারিশের মধ্যে সরকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা ও সেবার মানোন্নয়ন; সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন; একটি নির্ধারিত সময় কাঠামোর মধ্যে নথি নিষ্পত্তি, উৎসাহপ্রদানমূলক ব্যবস্থাসহ সময়ের আগেই অবসর গ্রহণ; ভ্রমণ কর পরিশোধ পদ্ধতির সহজীকরণ; পেনশন প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ; বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসনের আধুনিকায়ন; সকল উপযোগ বিল এক স্থানে (*ওয়ান স্টপ*) পরিশোধ পদ্ধতি প্রবর্তন; পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজীকরণ; ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থা সহজীকরণ; মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে কর্মউন্নয়ন টীম গঠন; জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রবর্তন; সড়ক ও জনপথে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন; বিদ্যমান আইন, বিধিবিধান, আদেশ-নির্দেশসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন; শ্রেণীভিত্তিক পরিচিতির পরিবর্তে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেড/ক্রমিকভিত্তিক পরিচিতি ব্যবস্থার প্রবর্তন; "জনসেবার জন্য প্রশাসন" — এ শ্লোগানটির প্রচলন; তিন বছরের বকেয়া উপযোগ (utility) বিলগুলোকে তামাদি ঘোষণা; মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কার্যসম্পাদনের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন পদ্ধতির প্রচলন; কার্যসম্পাদন মান ও নাগরিক সনদ প্রবর্তন; সেবা প্রদান উন্নয়নে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সম্ভাব্য সহায়তার জন্য সরকারের কাজে সব ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সেগুলোর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার, বিশেষ করে সকল সরকারী অফিসে তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং এ-৪ (A4) আকৃতির কাগজের ব্যবহার প্রবর্তন। পিএআরসি সরকারী অফিসগুলোতে সেবার মান উন্নয়নের জন্য এসব সুপারিশের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

খ. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১. সকল সরকারী অফিসকে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীকে সংজ্ঞায়িত এবং পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল পদের জন্য কর্মবিবরণী তৈরি করতে হবে ।

২. সিভিল সার্ভিসে পেশাদারিত্ব অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের সেবার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগন যাতে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোর কার্য সম্পাদনের মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মন্ত্রালয়/বিভাগসমূহ তাদের অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের কার্যসম্পাদন মান/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম মনিটরিং করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব পর্যায়ের কর্মকান্ড মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিত মনিটরিং করবে। পিএআরসি কর্তৃক যে উন্নততর বার্ষিক প্রতিবেদন ছক (অন্তর্বর্তীকালীনকালীন সুপারিশ নং -২২) পেশ করা হয়েছে তা মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো ব্যবহার করতে পারে ।

৪. অধস্তন/মাঠস্তরের অফিসসমূহকে যথাযথ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন করতে হবে।

৫. প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট এমন ভাবে ক্ষমতা অর্পন করবে যে, কোন সিদ্ধান্ত তিনটি স্তরের বেশী অতিক্রম করবে না। উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সে অনুযায়ী সচিবালয় নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট প্যারার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

---

[৭] অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ১,২,৩,৫,৭,৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,১৬, ১৮,১৯,২০,২১, ২২, ২৩, ২৭ ও ৩০ সেবা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় খণ্ডে-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল কমিশন ও কমিটির প্রতিবেদন জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে হবে**। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও সরকারী খাতের সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখার জন্য প্রেস ব্রিফিং -এর ব্যবস্থা করতে পারে।

৭. বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৫, ১১৬ ও ১১৬ক নং অনুচ্ছেদের আলোকে **বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে**। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার কারণে উদ্ভূত সকল কাজ সম্পাদনের জন্য **সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় নামে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে**। বিচার বিভাগের অধস্তন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সুপ্রিম কোর্ট করবে। **মেজিস্ট্রেসিসহ বিচার বিভাগের প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকতে হবে**। পুলিশের উপর ম্যাজিস্ট্রেসিসহ বিচার বিভাগের তদারকির যে বিধান রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাহী শাখা থেকে বিচার শাখাকে আলাদা করার মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি নেয়া যেতে পারে:

ক) বিচার বিভাগের চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি বা বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদনকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ ও বদলি সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে করতে হবে;

খ) বিচার বিভাগের চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী পরিচালনাকারী ম্যজিস্ট্রেটগণকে সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রেষণে দায়িত্বরত বলে গণ্য করা হবে;

গ) জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকবেন। এ সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া অন্য কোনোভাবে কাজ করার অনুমোদন দেয়া হবে না;

ঘ) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপিত হওয়ার পর এই সচিবালয় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলোতে নিয়োগ দানের জন্য নীতি নির্ধারণী কাজ ও অন্যান্য চাকরি সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখাশোনার কাজ শুরু করবে। বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদে নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগদানের পাশাপাশি যেসব ব্যক্তি এখন নিম্ন আদালতে ম্যজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করছেন তাদেরকে বিচার বিভাগীয় চাকরিতে থেকে যাবার বিকল্পটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

৮. বিধি-বিধান প্রতিপালন সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল অফিসে **ফলাফলমুখী কার্যসম্পাদনগত নিরীক্ষণ ব্যবস্থা** (Result oriented performance auditing) প্রবর্তন করতে হবে।

৯. অন্তর্বিভাগ (intra-departmental) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য লোক্যাল এরিয়া **নেটওয়ার্ক (এলএএন)** অবিলম্বে প্রবর্তন করতে হবে।

গ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ ঃ

১. **হিসাব নিরীক্ষণ (অডিট) থেকে হিসাব রক্ষণকে (একাউন্টস) আলাদা করতে হবে। হিসাব নিরীক্ষণকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতায়ন করতে হবে।**

২. সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন জ্ঞান বিকশিত করা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিসমূহের মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে জনসেবার মনোভাব জাগাতে হবে, আর সে জন্য আচরণগত প্রশিক্ষণ পেশাগত মানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. তথ্য প্রযুক্তি প্রবর্তনের পর সরকারী অফিসের যে কোন প্রাথমিক ইউনিট, যেমন — **মন্ত্রণালয়ের একটি সেকশন একজন কর্মকর্তা ও বর্তমান তিনজন সহায়ক কর্মচারীর পরিবর্তে একজন কর্মকর্তা ও একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত সহায়ক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হবে**। একটি ব্রাঞ্চে বার্তাবহনসহ নির্দেশিত অন্যান্য কার্যসম্পাদনের জন্য ২০ নং গ্রেডের একজন কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রথমে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুপাত হবে ১ঃ১। এতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

৪. সকল সেকেলে ফর্মকে হালনাগাদ ও সহজ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ফর্ম বিলুপ্ত করতে হবে। ফর্মগুলো সহজ করার কাজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকেই করতে হবে।

৫. **সেবা প্রদান করে এমন সকল সরকারী সংস্থায় 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে নাগরিকদের কি কি অধিকার রয়েছে সেগুলো জানতে তাদের সমর্থ করা, নিজ নিজ সেবা প্রদানের বিষয়ে সংস্থাগুলোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করা এবং এসব সার্ভিসের জন্য প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা** ।

৬. গণমাধ্যমগুলোর উচিত সরকারী সেবাপ্রাপ্তি, তাদের অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগের সন্তোষজনক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে জনগনকে শিক্ষিত ও অবহিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি ও আয়োজন করা।

৭. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের যে পরীক্ষিত কার্যকারিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে *তথ্য স্বাধীনতা আইন* (Freedom of Information Act) -এর একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থার হাতে থাকা অশ্রেণীবদ্ধ (non-classified) তথ্য চাহিদা মোতাবেক প্রতিটি ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিত করা। এ ছাড়া, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের (Evidence Act 1872) ১২৩ ও ১২৪ ধারা, ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন (Official Secrets Act 1923), এবং সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধির ১৯তম বিধান সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে (সংযুক্তি ২.১)। একটি জাতীয় নিরাপত্তা আইনের রূপরেখাও প্রস্তাব করা হয়েছে (সংযুক্তি ২.২)।

৮. আন্তঃবিভাগ (Inter-departmental) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডব্লিউএএন)** প্রবর্তন করতে হবে।

৯. সরকারের সকল কর্মকর্তাকে সরকারের আয়তন যথাযথ করা সাপেক্ষে **বাজারভিত্তিক বেতন** দিতে হবে। অধিকন্তু, ব্যক্তিখাতের মতো এর ভিত্তি হবে নিয়োগ ও অপসারণ নীতি। এ ধরণের বাজার ভিত্তিক বেতন পরীক্ষমূলকভাবে সরকারী নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে চালু করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত তথ্য স্বাধীনতা আইন (এফআইএ)

রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ হচ্ছে সরকারের গোপন এখতিয়ার -এরকম একটি সেকেলে ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্ত আজকের যুগে তার বিপরীতে যে ধারণা অধিপত্য লাভ করছে তাহ'ল তথ্যের স্বাধীনতা। আজকে তথ্য পাওয়ার অধিকার কেবল একটি কৌশলমাত্র নয় বরং ক্রমশঃই এ ধারণাটি বদ্ধমূল হচ্ছে যে, তথ্য লাভের বিষয়টি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একজন ব্যক্তির আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা পালনের একটি উপায়।

তথ্যে অধিকারের ধারণা

তথ্যের স্বাধীনতাকে ক্রমশঃই মত বা ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার সামগ্রিক বা সমন্বিত ধারণার একটি দিক বলে মনে করা হচ্ছে। তথ্যের স্বাধীনতা মানবীয় ব্যক্তিত্বের সুশৃঙ্খল বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। তথ্যের স্বাধীনতায় যে এক বহুমতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ ধারণারও পরিপূরক। তথ্যের অধিকার আজকে মানবাধিকারের আধুনিক জুরিসপ্রুডেন্সের একটি প্রধান বিষয় (বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮, সংশোধনের আন্তর্জাতিক অধিকার কনভেনশন, ১৯৫২, (UDHR, 1948, Convention on the International Right of Correction, 1952, ICCPR 1966 etc.)।

যেসব দেশের সংবিধানে অবাধ মতপ্রকাশের গ্যারান্টিকেই কেবল সমুন্নত করা হয়েছে অথচ তথ্যলাভের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন নেই এমন সব দেশের জাতীয় আদালতগুলি বর্ধিতহারে এ ধরণের অভিমত প্রকাশ করছেন যে, এসব বিধান/আইনে তথ্য পাওয়ার অধিকারটিরও নিশ্চয়তা থাকা উচিত। একটি পথিকৃৎ মামলা (landmark case) হল *এসপি গুপ্ত বনাম ভারত ইউনিয়ন* (১৯৮১ এসইউপিপি, সুপ্রিম কোর্ট মামলা, ৮৭)। এই মামলায় আদালত এই বলে অভিমত প্রদান করে যে ঃ

> জবাবদিহিতা ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক সরকার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। আর জবাবদিহিতার মৌলিক স্বীকার্য হল এই যে, সরকার যেভাবে করে কাজ করে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত হতে হবে। সরকার কি ভাবে, কেমন করে কাজ করছে বিষয়ে জনসাধারণ অবহিত হতে পারলেই কেবল তারা গণতন্ত্রে তাদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকাগুলি পালন করতে পারে ও গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থেই কার্যকরভাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে পারে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আদালত তথ্য লাভের অধিকারের আদল গড়ায় এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যবিধান ইত্যাদির মতো গণতান্ত্রিক শাসনের মূল ধারণাগুলির যোগসূত্র রয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনের পূর্বশর্ত হল সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও তাদের নিজ কল্যাণে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। জনজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে প্রভাবিত করে-সরকারের এমন দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণকে দেয়া না হলে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়া কিংবা অর্থবহভাবে সুষ্ঠু নীতি বিকল্প বাছাইয়ে সক্ষম হওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

তথ্য জনসাধারণের হাতে নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হতে পারে। কেননা, শুধু অবহিত জনসাধারণই সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করে সরকারী নীতির সমালোচনা করতে পারে এবং জনগণের অভিব্যক্ত ইচ্ছা ও নীতিসমূহের মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করে তথ্য রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা, তথ্যাদি গোপন করা, তথ্য না দেওয়া ও নীতি প্রণয়ন থেকে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন রাখা মুক্ত সরকারের মৌল ধারণারই পরিপন্থী। এসবের মধ্যে গোপনীয়তাই 'আদি সমস্যা' ও বাকিগুলি ঐ গোপনীয়তারই যৌক্তিক পরিণাম হিসেবে বিবেচিত। গোপনীয়তামূলক একাধিক আইনের প্রবল উপস্থিতিই স্বৈর শাসনকে কায়েমি রাখে ও সঙ্কীর্ণমনা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবেশ রচনা করে।

সরকারী গোপনীয়তার নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ও সমীক্ষামূলক অনুসন্ধানও চলছে। বর্তমান পরিস্থিতি ও অপব্যবহারের আলোকে সরকারী গোপনীয়তার সত্যিকারের প্রয়োজন, প্রাসঙ্গিকতা ও এর সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে

এই অনুসন্ধান চলছে। সরকারী গোপনীয়তা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার অস্ত্র হওয়ার পরিবর্তে বরং দমন-নিপীড়নের হাতিয়ার হয়ে উঠছে — এমন ধারণাই ক্রমে জোরদার হচ্ছে।

তথ্যলাভের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে যেসব আইন

অনেক আইন সরকারী দলিলপত্র ও তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হবে ঐ সব আইন যেগুলির নানা বিধান যথেষ্টরকমে গোপনীয়তা সংক্রান্ত। এসব আইনের মধ্যে সরকারী গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯৭৫, ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারি (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯ তথ্যের অবাধ প্রবাহে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাধার সৃষ্টি করে। সরকারী গোপনীয়তা আইন অনুযায়ী সরকারী তথ্যের যেকোনো প্রকাশ ও ব্যবহার ফৌজদারি অপরাধ। এই আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো সরকারী কর্মকর্তা আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে কোনো দলিল বা তথ্য দিয়ে থাকেন, অথবা সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে যদি কেউ এরকম দলিল বা তথ্যের অধিকারী হন, তাহলে তিনি যদি

ক) ইচ্ছাকৃতভাবে তা অননুমোদিত কোনো ব্যক্তিকে দেন,

খ) বিদেশী শক্তির সুবিধার জন্য কাজে লাগান,

গ) কর্তব্য লঙ্ঘন করে রেখে দেন,

ঘ) এসবের যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিতে ব্যর্থ হন যাতে এগুলির নিরাপত্তা বিপন্ন হয় - তিনি সেক্ষেত্রে অপরাধের জন্য দোষী হবেন।

এছাড়াও, ৫ ধারার (২) দফায় এই মর্মে বিধান রয়েছে যে, এই আইন লঙ্ঘন করে দেয়া হয়েছে -এ বিষয়টি জানা কিংবা এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকার পরও যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরণের কোনো গোপন সরকারী তথ্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁর ঐ কাজ দণ্ডযোগ্য অপরাধ হবে।

এ ভাবে আইনের এই ধারায় সরকারী তথ্য বলতে অত্যন্ত ব্যাপক একটা বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। যে কোনো তথ্য 'গোপনীয়' বলে গন্য হলেই তা এ ধারার আওতায় আসবে। এই আইনের কোথাও 'গোপনীয়' বা 'সরকারীভাবে গোপনীয়' শব্দগুলির কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি; ফলে কি গোপনীয় গণ্য হবে বা হবে না তা সরকারই নির্ধারণ করেন।

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন

সাক্ষ্য আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারা বলে অধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত দলিলাদি বা আদান প্রদান করা তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ। ১২৩ ধারা অনুযায়ী, একমাত্র বিভাগীয় প্রধানের পূর্বানুমতি ছাড়া (এই অনুমতি তিনি দিতেও পারেন , না-ও দিতে পারেন) কেউ "রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কিত" কোনো সরকারী অপ্রকাশিত রেকর্ডের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিতে পারবেন না।

কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯৭৫

কার্যপ্রণালী বিধির ২৬ (১) ধারা অনুযায়ী, কোনো সরকারী কর্মচারি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী দলিল বা সরকারী বিষয় সম্পর্কিত দলিল থেকে গৃহীত তথ্য সংবাদপত্র, কর্মকর্তা নন এমন কাউকে, এমনকি অন্যান্য সরকারী অফিসের কোনো কর্মকর্তাকেও প্রদান করতে বা জানাতে পারবেন না।

সরকারী কর্মচারি (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯

এই আইনের ১৯ ধারায় সন্নিবেশিত বিধান অনুযায়ী, কোনো সরকারী কর্মচারি কোনো সরকারী দলিলের বিষয়বস্তু বা সরকারী প্রকৃতির কোনো তথ্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরের কোনো সরকারী কর্মচারীকে কিংবা সরকারী নন এমন কাউকে কিংবা সংবাদপত্রকে দিতে পারবেন না।

উল্লিখিত আইনগুলি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বাস্তব তথ্য জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখার ব্যাপারে প্রশাসনের ওপর আইনগত বিধিনিষেধের একটি বাধ্যবাধকতা গড়ে তোলে। আইনগুলির উল্লিখিত বিধিবিধান প্রশাসক কর্তৃপক্ষের নানা অসাবধানতাবশত ভুল ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা ভুল কাজকে আড়াল করে রাখতে 'প্রশাসনিক স্বাধীন বিচার-বিবেচনা' প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করে দেয়। বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মূল বিবেচনায় রেখে প্রণীত সরকারী গোপনীয়তা আইনের ব্যাপক প্রয়োগ কেবল প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

নিরাপত্তার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এই আইনটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কেননা, আজকের তথ্য প্রযুক্তি কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ, ইন্টারনেট, বিশ্বব্যাপী নানা তথ্যজ্ঞাপন ব্যবস্থা ও উপাত্ত ব্যাংকের মধ্য দিয়ে দেশের জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিপুল তথ্য সম্ভার সাড়া বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এ ছাড়াও, এসব আইনের দ্বৈধতা ও অস্পষ্টতার কারণেও তথ্যের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এগুলির নানা বিধিবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে, যার ফলে এসব আইনের অপব্যবহার হতে পারে। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণকে তথ্যলাভ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যই এই আইন অনেকটাই অবদান রেখেছে।

তাই আজকের প্রেক্ষাপটে জনসমাজের পরিবর্তনশীয় চাহিদা মেটাতে এই কঠোর আইনের সংশোধন বা এই আইন বাতিল করা একান্ত অপরিহার্য।

তথ্যের স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অল্পকিছু বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে জনসাধারণের অবাধ তথ্যলাভের অধিকার থাকা উচিত। সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপক প্রচার হলে জনমত সুপরিজ্ঞাত হয়ে উঠতে পারে। তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ওপর অবহিত জনবিতর্ক অনুষ্ঠানের আলোকে নীতি প্রণয়ণ উন্নত হয়, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জনগ্রাহ্যতা বাড়ে ও দক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

তথ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের ক্ষেত্রে যে এক অনুঘটকের কাজ করে তা এখন স্বীকৃত। এখন এও স্বীকৃত যে, সরকারের কার্যাবলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকলেই কেবল কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণ তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে। এর বিপরীত পরিস্থিতি থাকলে, অর্থাৎ তথ্য গোপন রাখা হলে, তাতে কেবল জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যায় এবং দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুণগত উৎকর্ষ কমে যায়।

তথ্যের স্বাধীনতা আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারী তহবিল তসরুফ ও তার অসাধু ব্যবহার আমাদের সরকারী সংস্থাগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মোকাবেলায় সকল সরকারী লেন-দেনে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা থাকা একান্ত জরুরি এবং তথ্য লাভের ক্ষেত্রেও জনসাধারণের অবাধ অধিকার থাকতে হবে; এ তথ্য শুধু কোনো সরকারী ব্যয়ের বেলাতেই নয় বরং দাতা তরফের সাহায্য ও ঋণদাতাদের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে হবে।

তথ্য স্বাধীনতার সাংবিধানিক ও আইনগত কাঠামোর তুলানামূলক বিচার

সুইডেন, সেশেলস, নিউজিল্যান্ড, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি ইত্যাদি বহু দেশে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে তথ্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে।

সাংবিধানিক ম্যান্ডেট ছাড়াও, বহু সংখ্যক দেশ তাদের প্রচলিত গোপনীয়তা আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কিংবা স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের বেলায় তথ্য স্বাধীনতার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব আইন তথ্যের স্বাধীনতার প্রশ্নে নানারকমের আদর্শ বা নিয়মাচার গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যুক্তরাজ্যের ১৯৮৯ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন, ১৯৬৬ সনের মার্কিন তথ্য স্বাধীনতা আইন (১৯৯৬-এ সংশোধিত), কানাডার ১৯৮২ সালের তথ্যলাভ আইন (১৯৯২-এ সংশোধিত) ইত্যাদিতে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডও নতুন তথ্যলাভের স্বাধীনতা আইন পাশ করেছে। এইসব তথ্য স্বাধীনতা আইনের মোটামুটি লক্ষ্যগুলি হল, আইনের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তনে মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের আস্থা সৃষ্টিতে সহায়তাদান। এই সব দেশে

আদালত, বাছাই কমিটি, হিসাব নিরীক্ষক ও ন্যায়পালের পাশাপাশি তথ্য স্বাধীনতা আইন জবাবদিহিতার নিশ্চয়তাবিধানের আরও একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

তথ্য স্বাধীনতা আইনের লক্ষ্যে

আমাদের সংবিধানে তথ্য স্বাধীনতা কিংবা সরকারী দলিলের তথ্যলাভের অধিকার সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদের উদার ব্যাখ্যার প্রয়োজন । এই অনুচ্ছেদ অন্যতম মৌলিক নাগরিক অধিকার হিসেবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাবিধান করেছে। সংবিধানের এই ৩৯ নং ধারার উদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যার উদ্দেশ্য হবে, তথ্য স্বাধীনতা আইনের সাংবিধানিক ও আইনগত কাঠামোকে যৌক্তিকতা প্রদান। তবে, বর্তমান গোপনীয়তা আইনের কার্যকারিতা ও তথ্য স্বাধীনতার ব্যাপক পরিবর্তনের আলোকে "তথ্য স্বাধীনতা বিল, ২০০০" - শিরনামে একটি খসড়া বিল প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

(প্রস্তাবিত খসড়া)

তথ্য স্বাধীনতা বিল, ২০০০

(সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আনীত বিল)

যেহেতু সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধায়ক আইনের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বর্ণিত চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ;

এবং যেহেতু স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সুশাসনের জন্য এই স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় সেহেতু,

এই বিল সংসদ কর্তৃক আইনে পরিণত হোক।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হবে;

(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে;

(৩) সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত তারিখ থেকে এই আইন বলবৎ হবে।

২. সংজ্ঞা

এই আইনে প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষিতের কারণে অন্যবিধ প্রয়োজন না হলে,

(ক) 'দলিল' অর্থ যে কোনো ধরনের দলিল এবং যে কোনো মুদ্রিত বা লিখিত উপকরণ, যে কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও প্রয়োগ কৌশলে ধারণ অথবা রেকর্ডকৃত তথ্য এবং যে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে বা সাহায্য ব্যতিরেকে পুনরুৎপাদন যোগ্য দর্শনযোগ্য প্রতিকৃতি বা ছবি এই দলিলের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) 'তথ্য লাভের স্বাধীনতা' -র অর্থ তথ্য চাওয়া বা জানতে চাওয়ার স্বাধীনতা এবং এর আওতায় অন্তর্ভুক্তঃ পরিদর্শন, নোট নেওয়া ও অংশবিশেষ সংগ্রহ, যে কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের দলিল বা রেকর্ডের প্রত্যয়নকৃত অনুলিপি সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক সরঞ্জামে তথ্য ধারণের ব্যবস্থা থাকলে ঐ তথ্য টার্মিনাল থেকে পাওয়ার অথবা তা মুদ্রিত আকারে পাওয়ার ব্যবস্থা।

(গ) 'তথ্য' অর্থ কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলি, প্রশাসন অথবা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোনো উপকরণ এবং ঐ সরকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলি সম্পর্কিত যে কোনো দলিল অথবা রেকর্ড এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ঘ) 'তথ্য ন্যায়পাল' অর্থ এই আইনের আওতায় নিযুক্ত ন্যায়পাল।

(ঙ) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের আওতায় বিভিন্ন বিধি কর্তৃক নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত কোনো কিছু।

(চ) সরকারী কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১) বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন অথবা বাংলাদেশ সরকারের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা বাংলাদেশ সরকারের যোগান দেয়া তহবিলে পরিচালিত

অন্যান্য সংস্থা এবং সুপ্রিম কোর্ট, নিম্ন আদালতসমূহ ও জাতীয় সংসদের প্রশাসনিক দপ্তরসমূহ।

২) কোন কোম্পানি, কর্পোরেশন, ট্রাস্ট, প্রতিষ্ঠান, সমিতি অথবা কোনো সমবায় সমিতি - এগুলোকে নিবন্ধনের সময় সংশ্লিষ্ট আইনগুলো যে অর্থ নির্ধারণ করেছে এক্ষেত্রেও তারা সেই একই অর্থ বহন করবে।

(ছ) 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ যে ব্যক্তি তথ্য লাভের জন্য অনুরোধ জানান, তিনি ও কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন।

(জ) 'ব্যক্তি' অর্থ বাংলাদেশের একজন নাগরিক অথবা বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাসী কোনো বিদেশী।

(ঝ) 'কর্মকর্তা' অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুরোধ নিয়ে কাজ করার জন্য দায়িত্ব শীল সরকারী কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা।

৩। তথ্য স্বাধীনতা

এই আইনের বিধি বিধান সাপেক্ষে কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য চাওয়ার স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তির থাকবে।

৪। সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের বাধ্য-বাধকতা

১) প্রতিটি সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে তার সকল রেকর্ড পরিচালনগত শর্তানুযায়ী সংরক্ষণ করা, যথানিয়মে ক্যাটালগ ও সূচিভূক্ত করা এবং আট ও নয় নম্বর ধারার বিধান সাপেক্ষে তথ্য লাভের জন্য অনুরোধকারী যে কোনো ব্যক্তিকে ঐ তথ্যের নাগাল লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

২) প্রতিটি সরকারী কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে তথ্য প্রকাশ করবেন এবং ঐ তথ্য হালনাগাদও করবেন। তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের বিবরণ থাকবে ঃ

ক) সংগঠন কার্যাবলী ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদির বিবরণ;

খ) সংগঠনের কার্যপ্রণালীর আলোকে এর সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিবরণ এবং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলীর বিবরণ;

গ) এ সব সংগঠনের প্রক্রিয়াকরণ এবং ভৌত ও আর্থ লক্ষ্যসমূহ ইত্যাদি সমাপ্তির নির্ধারিত মেয়াদসমূহের মত কার্যকলাপ সম্পাদনের নিয়ম-পদ্ধতি এবং উল্লিখিত রীতি-পদ্ধতির আলোকে প্রকৃত অর্জন।

ঘ) বিধিবিধান, প্রবিধান (প্রবিধি), নির্দেশাবলি ও ম্যানুয়াল ইত্যাদির তালিকা যেগুলি এই সংগঠনের কর্মচারীরা তাদের কার্যাবলি পরিচালনায় ব্যবহার করে থাকে সেগুলিসহ এর নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন রেকর্ডের শ্রেণীসমূহ;

ঙ) তথ্য লাভের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা; এবং

চ) তথ্য লাভের অনুরোধ যে কর্মকর্তা বরাবর করা হয় তার নাম, পদবী ও অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য।

৩) কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হবে তাদের সিদ্ধান্তের কারণসমূহ - প্রশাসনিক অথবা বিচার বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানানো এবং কোনো বড় রকমের নীতি বা সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও সম্পর্কিত তথ্য ও বিচার বিশ্লেষণ প্রকাশ করা

৫. তথ্য লাভের জন্য অনুরোধ

এই আইনের আওতায় লিখিতভাবে যথাযথ কর্মকর্তার কাছে অনুরোধ করা যাবে এবং অনুরোধকারীকে যতটা সম্ভব পরিস্কারভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে তিনি যে তথ্য, দলিল বা রেকর্ড পেতে চান, তার বিবরণ দিতে হবে।

৬. অনুরোধের নিষ্পত্তি

১) অনুরোধ জানানোর পর এবং যেখানে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যত দ্রুত সম্ভব ঐ তথ্য অনুরোধকারীকে দিবেন; এক্ষেত্রে ঐ অনুরোধ প্রাপ্তির তিরিশ দিনের মধ্যেই একাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে তা এই শর্তসাপেক্ষ হবে যে, কোনো ক্ষেত্রে ত্রিশ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান সম্ভব না হলে ঐ মেয়াদ সর্বাধিক আরও ১৫ দিন বর্ধিত করা যেতে পারে। তবে তা করা যাবে এই মেয়াদ সম্প্রসারণের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, এবং তা লিখিতভাবে অনুরোধকারীকে জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরও শর্ত থাকবে যে, কোনো অতিরিক্ত ফি প্রদান সাপেক্ষে ঐ তথ্য প্রদানের বিষয় মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে এবং ঐ অতিরিক্ত ফি তথ্য প্রাপ্তির জন্য ব্যয় হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন এবং সেই সঙ্গে তিনি যে ফি নির্ধারণ করবেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ঐ ফি জমা দেবার জন্য তাকে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং উল্লিখিত অবগতিমূলক যোগাযোগ ও ফি পরিশোধের মধ্যবর্তী মেয়াদটি তথ্য প্রদানের বিষয় মঞ্জুরির ক্ষেত্রে যে মেয়াদ নির্ধারিত আছে তা থেকে বাদ পড়বে।

২) কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে ঐ সিদ্ধান্ত অনুরোধ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নিতে হবে এবং প্রত্যাখ্যানের সুনির্দিষ্ট কারণগুলি এই আইনের সম্পর্কিত ও বিধানগুলি (যেগুলির ভিত্তিতে এ ধরণের অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে) তার উল্লেখসহ লিখিতভাবে অনুরোধকারীকে জানাতে হবে ও অনুরোধকারীর জন্য এই অবস্থার প্রতিকারে যে সব উপায় খোলা রয়েছে সেগুলিরও উল্লেখ করতে হবে।

৩) কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের সম্পদ অসমানুপাতিক মাত্রায় ব্যয়িত না হলে কিংবা তা সংশ্লিষ্ট দলিলটির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর নাহলে সাধারণত যে আকারে তথ্য চাওয়া হয় সেই আকারেই তা প্রদান করা হবে।

৭. অনুরোধ প্রত্যাখ্যান হিসেবে যা বিবেচিত হবে

তথ্য লাভের কোনো অনুরোধের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত ১৫ দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে জানানো না হলে ধরে নিতে হবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ও সেক্ষেত্রে ঐ অনুরোধকারীর এই আইনের বিধিবিধানের আওতায় তার আবেদনের পুনর্বিবেচনা লাভের অধিকার থাকবে।

৮. তথ্য প্রকাশ থেকে অব্যাহতি

এই আইনের বিধানের আওতায় নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর তথ্য প্রকাশ করা যাবে না ঃ

১) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার পক্ষে এবং সেই সঙ্গে বিদেশী সরকারসমূহ তাদের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের কাছ থেকে গোপনীয়তা রক্ষিত হবে — এমন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যার প্রকাশ ক্ষতিকর হবে এমন তথ্য;

২) কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের আলোচনা - পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যভিত্তিক ও অভ্যন্তরীন প্রকৃতির ওয়ার্কিং পেপার যেমন আন্তবিভাগীয়/অন্তর্বিভাগীয় নোট, চিঠিপত্র এবং পরামর্শ, অভিমত, সুপারিশ বা কার্যবিবরণী সম্বলিত কাগজপত্রের আকারে তথ্য।

৩) অনুসন্ধান নিবারণ, তদন্ত পরিচালন অথবা অপরাধ দমন কিংবা কোনো আইনের লঙ্ঘনের মতো আইন বলবৎ করার কার্যকলাপের জন্য ক্ষতিকর কোনো তথ্য ফাঁস; অথবা কোনো অপরাধে উস্কানি বা ইন্ধন যোগায় কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারণযোগ্য কোনো গোয়েন্দা সংগঠনের কার্যাভিযান পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর, অথবা জননিরাপত্তার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর অথবা কোনো মুলতবি মামলার

ন্যায়বিচারের জন্য ক্ষতিকর কিংবা কোনো গোপনীয় রেকর্ড বা তথ্যের সূত্রের অস্তিত্ব বা পরিচয় উন্মোচন বা কোনো তথ্যের উৎস উন্মোচক অথবা কোনো আইনের লঙ্ঘন বা পরিপন্থী কোনো তথ্যের ভবিষ্যত যোগানের জন্য ক্ষতিকর, এমন তথ্য।

৪) অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় সরকারের সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের ন্যায্য আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে কিংবা যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য অসঙ্গত লাভ বা লোকসানের কারণ হয় এমন তথ্য।

এই বিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষুণ্ন না করে, এধরনের তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবনার আগাম উন্মোচন ঃ

ক) কর - কাষ্টম ডিউটি ও এক্সাইজসহ;

খ) মূদ্রা, মূদ্রা বিনিময় অথবা সুদের হার;

গ) আর্থ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত প্রস্তাব।

৫) ব্যবসায়-বণিজ্যের গোপন তথ্যের মতো এমন কোনো তথ্য যার বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে যা ঐ তথ্য ফাঁসের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অথবা ফাঁস হলে কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , এমন তথ্য;

তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হবে এই যে, আইন দ্বারা সংরক্ষিত ব্যবসায়-বাণিজ্যিক গোপন তথ্য ছাড়া কোনো তথ্য প্রকাশ করার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে যদি সেক্ষেত্রে ঐ তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির তূলনায় জনস্বার্থ বেশি গুরুত্ব বহন করে;

৬) একজন ব্যক্তির প্রাইভেসির ওপর অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ঘটায় এমন তথ্য;

৭) সংসদীয় সুবিধা অধিকার এবং উপযুক্ত আদালতের আদেশ লঙ্ঘিত হয় এমন তথ্য প্রকাশ।

৯. কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্য না দেওয়ার ভিত্তি

এই আইনে ৮নং ধারা ক্ষুণ্ন না করে একজন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন ঃ

(১) যদি অনুরোধ খুবই অনির্দিষ্ট ও সার্বিক ধরনের হয় কিংবা এমন প্রকৃতির হয় যে, অনুরোধ রাখতে গেলে যে পরিমাণ তথ্য উদ্ধার করার বা প্রক্রিয়া করার প্রয়োজন হবে তাতে একটি সরকারী কর্তৃপক্ষের তূলনামূলকভাবে বিপুল সম্পদ ব্যয় করতে হবে ও তা ঐ কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনায় 'প্রতিকূল প্রভাব' ফেলবে।

তবে শর্ত থাকবে এই যে, অনুরোধ খুবই অনির্দিষ্ট ও সাধারণ ধরনের -ওই কারণ দেখিয়ে অনুরোধ রক্ষায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ঐ কর্মকর্তার কর্তব্য হবে অনুরোধকারীকে যতদুর সম্ভব সহয়তা করা যাতে তিনি এমনভাবে তার চাহিদা তথা অনুরোধকে পুনর্গঠিত আকারে পেশ করেন যা রক্ষা করা সহজতর হয়;

(২) এমন তথ্য চাওয়া হয়েছে যা কেবল আইন বা রীতিপ্রথা অনুযায়ী কোনো এক বিশেষ সময়েই কেবল প্রকাশ করা যায়, তার আগে নয়;

(৩) এমন তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা মুদ্রিত আকারে কিনতে পাওয়া যায়।

১০. অনুরোধ হস্তান্তর

(১) এই আইনের আওতায় কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষ কাউকে তথ্য প্রদানের জন্য তার পক্ষ থেকে অনুরোধ পেলে ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিবেচনায় যদি মনে হয়, ঐ তথ্যের ব্যাপারে আরেকটি সরকারী কর্তপক্ষেরই

এখতিয়ার ও স্বার্থ বেশি তাহলে অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি বিধিতে নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক উল্লিখিত অনুরোধ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ঐ অনুরোধটি শেষোক্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন ও সেক্ষেত্রে অনুরোধপ্রেরক কর্মকর্তা যিনি অনুরোধ করেছিলেন তাকে এ মর্মে অনুরোধ হস্তান্তরের বিষয় নোটিশের আকারে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(২) এই আইনের ৬নং ধারার আওতায় কোনো অনুরোধ একই আইনের (১)'উপ-ধারার আওতায় স্থানান্তর করা হয়ে থাকলে ধরে নেওয়া হবে যে, যে তারিখে ঐ অনুরোধ প্রথম সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে করা হয়েছিল সেই তারিখেই হস্তান্তরিত অনুরোধটি করা হয়েছে।

(৩) আইনের উপ-ধারা (১) আওতায় ধরে নেওয়া হবে কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের বেশি স্বার্থ জড়িত রয়েছে যদি,

ক) ঐ তথ্য মূলত ঐ কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছিল অথবা তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল; অথবা

খ) যদি ঐ তথ্য মূলত ঐ কর্তৃপক্ষই তৈরি না করে থাকে বা তাদের জন্য তৈরি না করা হয়ে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকেই ধরা হবে যে কর্তৃপক্ষ প্রথমে ঐ তথ্য বা তার কোনো অনুলিপি পেয়েছিল।

১১. ফি

তথ্যলাভের জন্য সরকার ফি নির্ধারণ করতে পারেন । এ ফি'-তে আবেদন ফি ও তথ্য প্রদানের জন্য ব্যয় হিসেবে অন্যান্য ফি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

তবে শর্ত এই যে, তথ্যের প্রকাশ বৃহত্তর জনস্বার্থে দরকার বলে বিবেচিত হলে ঐ ফি মওকুফ করা যেতে পারে।

১২. খণ্ডিত তথ্য

তথ্য প্রদানের অনুরোধ যদি এই কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে যে, অনুরোধটি এমন তথ্য সংশ্লিষ্ট যে তথ্য প্রকাশ হওয়া থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিধিবিধান অনুয়ায়ী প্রকাশযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে এই আইনে যা-ই থাকুক না কেন, ঐ দলিল বা তথ্যের ঐ অংশ অনুরোধকারীকে দেওয়া যাবে যাতে এমন কোনো তথ্য নেই যা এই আইনের আওতায় প্রকাশ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং ঐ অংশটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত তথ্য থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলাদা করে নেওয়া যায়।

১৩. তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ

কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষ কোনো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত বা ঐ পক্ষের সরবরাহ করা তথ্য প্রকাশ করতে চাইলে ও ঐ তথ্যকে ঐ তৃতীয় পক্ষ বরাবরই গোপনীয় বিবেচনা করে থাকলে, ঐ তৃতীয় পক্ষকে ঐ তথ্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য জানিয়ে একটি নোটিশ দেওয়া যেতে পারে যার আওতায় ঐ তৃতীয় পক্ষকে ১৪ দিনের মধ্যে ঐ তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে বক্তব্য বা দরখাস্ত দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঐ বক্তব্য বা দরখাস্ত (যদি করা হয়ে থাকে) সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় তা বিবেচনার জন্য গ্রহণ করবেন।

তবে শর্ত থাকবে এই যে, আইন দ্বারা সংরক্ষিত ব্যবসায়-বাণিজ্যিক গোপন বিষয় ছাড়া, ঐ তৃতীয় পক্ষের স্বার্থের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে জনস্বার্থ অধিকতর গুরুত্ববহ হলে আর সকল বিষয় প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

১৪. অভ্যন্তরীন পর্যালোচনা

(১) কোনো কর্মকর্তা কোনো অনুরোধকারীর তথ্য লাভের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে থাকলে অনুরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান বা যে সরকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে অনুরোধটি পাঠানো হয়েছিল তার ওপর এখতিয়ার রয়েছে নির্ধারিত এমন কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারেন।

(২) পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনের নিষ্পত্তি করবেন। তবে তা এই শর্তসাপেক্ষ যে, পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের কারণগুলি আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে ও তাতে আবেদনকারীর জন্য এর কী আপিল প্রতিকার রয়েছে তার তথ্যও জানাতে হবে।

(৩) তৃতীয় পক্ষের তথ্যের ক্ষেত্রে, পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ এই আইনের ১৩ ধারায় প্রদত্ত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করবেন।

(৪) তথ্য লাভের জন্য কর্মকর্তা প্রস্তাবিত যে ফি ধার্য করেন সে বিষয়েও পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

১৫. আপিল

(১) পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্তের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে। এই আপিল আবেদনের নিষ্পত্তি করবেন তথ্য ন্যায়পাল।

১৬. তথ্য ন্যায়পাল

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে সরকার একজন তথ্য ন্যায়পাল নিয়োগ করবেন ও তথ্য ন্যায়পাল অফিসও স্থাপন করবেন।

(২) সরকারী কর্তৃপক্ষগুলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকল আপিলের নিষ্পত্তির এখতিয়ার ন্যায়পালের। তিনি আপিল আবেদন পাওয়ার দিন থেকে ৩০দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) ন্যায়পালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) এই আইনের বিধিবিধানের আওতায় তথ্য ন্যায়পালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ও তাঁর কার্যালয়ের বিষয় নির্ধারিত হবে।

১৭. সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতিপয় বিষয়ের প্রকাশনা

এই আইনে বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনে ৮ ধারা সাপেক্ষে, কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রম শুরু করা প্রস্তাব করছে এমন সকল সরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে যথাশীঘ্র সম্ভব - কিন্তু প্রকল্প বা কার্যক্রম শুরুর আগেই - সাধারণ জনগন ও প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন মানুষজনের সুবিধার্থে এমন সব তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করা, যে তথ্য তাদের গোচরে বা নিয়ন্ত্রনে রয়েছে, এবং তা জনগনকে প্রবাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

১৮. এই আইনের প্রাধান্য

আপাতত চালু অন্য যে কোনো আইনে পরিপন্থী যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি বলবৎ হবে।

১৯. বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা

সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মারফত এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

সরকারী গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩

প্রস্তাবিত তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন বাতিল করা এবং এর জায়গায় একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা উচিত বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারি (আচরণ বিধি), ১৯৭৯

ধারা ১৯ ঃ প্রস্তাবিত সংশোধিত ভাষ্য:

কোনো ব্যক্তি তথ্যের জন্য অনুরোধ জানালে একজন সরকারী কর্মচারি তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০-এর ৮ ধারার অধীনে সংরক্ষিত আওতায় কোনো তথ্য প্রকাশ করবেন না এই শর্ত সাপেক্ষে একই আইন অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে তথ্য প্রদান করবেন।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

(প্রস্তাবিত) তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০-এর আইন প্রণয়ন করার আলোকে ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের নিম্নবর্ণিত ধারাগুলির সংশোধন/ বাতিল প্রয়োজন ঃ

১২৩ ধারা ঃ

তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০-এর ৮ ধারার অধীনে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যে অব্যাহতি রয়েছে সেই অব্যাহতির আওতাধীন কোনো তথ্য সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিকে কোনো সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করা যবে না।

১২৪ ধারা ঃ

[১২৩ ধারার সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে ১২৪ ধারা বাতিল করতে হবে।]

প্রস্তাবিত জাতীয় নিরাপত্তা আইন

প্রস্তাবিত তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০ অনুমোদিত হলে, ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইনের প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি লুপ্ত হবে ও সেই পরিমান অপ্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়বে। অবশ্য, এরকম একটি উপলব্ধিও সক্রিয় যে, রাষ্ট্রের অবশ্যই কিছু নিরাপত্তামূলক বিষয় আছে, যেগুলি আইন দ্বারা রক্ষিত হওয়া উচিত। মনে করা হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্যের প্রবাহ সীমিত করা কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা কিংবা তথ্য লাভ নিষিদ্ধ করা তথ্যের ব্যাপারে ব্যক্তি অধিকারের লঙ্ঘন নয়। এ ছাড়াও, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুসৃত হওয়ায়, এ ধরণের বিধিনিষেধ বা কড়াকড়ি অনেকটা বিশ্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়েছে বলে এসব বিষয়ের তথ্য যেমন নিরাপত্তাজনিত হুমকি নয় তেমনি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তাও নয়। 'সরকারী গোপনীয়তা' -এই বর্ণনার একটা নেতিবাচক তাৎপর্য আছে অথচ 'জাতীয় নিরাপত্তা' -র মধ্যে একটা ইতিবাচক দায়বদ্ধতা ও আবেগ জড়িত রয়েছে। সে কারণে 'জাতীয় নিরাপত্তা' -এই পারিভাষিক বর্ণনাটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এ সব বিষয়ের বিবেচনার পেক্ষাপটে ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইনের পরিবর্তে জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ২০০০ প্রবর্তনের সুপারিশ করা হচ্ছে।

জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ২০০০ সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রত্যক্ষভাবে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষুণ্ন হবে না। সে কারণে এই আইন কমিশনকে অর্পিত কর্মদায়িত্ব ও বিচার্য বিষয়াবলির এখতিয়ারের বাইরে। তবু প্রস্তাবিত আইনটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাজুক প্রকৃতির বিধায় নিম্নবর্ণিত বিধান ও এখতিয়ার অন্যান্য বিষয়সহ অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(১) ১৯২৩ সনের ১৯ নং আইনের ১ নং ধারা বহাল রাখতে হবে, ২(গ) ধারা বাদ দিতে হবে।

(২) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

ক) গুপ্তচরবৃত্তি/গুপ্তচরবৃত্তিকে প্রশ্রয়দান;

খ) বিভিন্ন ধরনের সীমিত/নিষিদ্ধ তথ্যের (আইন নির্ধারিত) পুনরুৎপাদন;

গ) সীমিত/নিষিদ্ধ তথ্যের (তথ্য স্বাধীনতা আইন, ২০০০-এর ৮ নং ধারা) অসঙ্গত আদান প্রদান;

ঘ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর উর্দি/ইউনিফর্মের অননুমোদিত ব্যবহার;

ঙ) শ্রেণীবদ্ধ (ক্লাসিফাইড) তথ্য লাভের অধিকারী এমন কর্মকর্তা সেজে ঐ সব তথ্য হস্তগত করা;

চ) নিষিদ্ধ/সীমিত তথ্যের জালিয়াতি;

ছ) বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড;

জ) বিচার সম্পাদন ফোরাম ও গোপন বিচারানুষ্ঠানের বিধানাবলি।

[তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০০ -এ তথ্যের যে অর্থ দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই হবে]

অধ্যায় ৩

সিভিল সার্ভিস সংস্কার

৩.০১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পূর্বসূরী ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও কার্যকর বিবেচনা করা হত। এসব সার্ভিসকে সীমিত কাজ করতে হত, যার বেশির ভাগই ছিল নিয়ন্ত্রণমূলক। কাজেই দক্ষতার সঙ্গে এসব কাজ সম্পাদন করাও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণের জন্য সিভিল সার্ভিসকে বিশাল ও জটিল উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়। বেশ কিছু কারণের জন্য মনে করা হয় যে, এ সুবিশাল কাজ সম্পাদনে সাধারণভাবে এ সার্ভিসের সদস্যরা অভ্যস্ত নন অথবা সে জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দক্ষতাও তাদের নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা এখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে অদক্ষ ও অকার্যকর হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। সিভিল সার্ভিসের নিম্ন পর্যায়ে সহায়ক স্টাফের মানও নিচু। এ অবনিতর কারণ হয়েছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের অভাব এবং শৃংখলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য। *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস: রিফর্মিং দি পাবলিক সেক্টর* (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৬) সরকারকে *প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, অত্যন্ত পরিব্যাপ্ত, অতিশয় আমলাতান্ত্রিক, শাসনকাজে যথেচ্ছ স্বেচ্ছাধীন, মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত, জবাবদিহিতা বর্জিত ও অপচয়ী বলে চিত্রিত করেছে।*

৩.০২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মদক্ষতার চেয়ে দলীয় স্বার্থের প্রকাশই বেশি। সিভিল সার্ভিসের সমালোচকদের বক্তব্য হয়েছ যে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ সরকারী কর্মকর্তাই জনগণের ব্যাপারে সংবেদনশীল নন। তারা অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক ও নিজেদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিতরে একটি আধুনিক সরকার চালনায় ক্রমেই অসমর্থ হয়ে পড়ছেন। তবুও এ সমালোচকরাই স্বীকার করেন যে, সিভিল সার্ভিসে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কিন্তু চাকরির অসুস্থ পরিবেশ এবং খোদ সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী ভালভাবে কাজ করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, কাজের মান-নির্বিচারে পদোন্নতি এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অসম আচরণ সিভিল সার্ভিসের ক্ষতি করছে। আরো গুরুতর হয়েছ যে, এবেতন পদ্ধতিটি উপরের স্তরে বাজার মূল্যের তুলনায় অবিশ্বাস্যরকম কম ও নিম্নের স্তরে অসঙ্গতভাবে বেশি বেতন দেয়।

নিয়োগ নীতি ঃ কোটা পদ্ধতির ক্রম বিলোপ

৩.০৩ একটি দক্ষ সিভিল সার্ভিসের মূলে নিহিত রয়েছে একটি সুচিন্তিত নিয়োগ নীতি। যদি নিয়োগ নীতি দুর্বল হয়, তবে তার পক্ষে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত প্রথম সারির সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একটি বলিষ্ঠ নিয়োগ নীতি অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে মেধাকেই প্রাধান্য দেয়। *টুওয়ার্ডস বেটার গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (১৯৯৩) এর মতে, *চাকরিতে নির্বাচনের ধরণ ও নিয়ম নীতির কারণে বাংলাদেশে মেধার বিবেচনা গুরুত্ব হারিয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছ।* বাংলাদেশে নিয়োগ নীতির বৈশিষ্টহল কোটা পদ্ধতির প্রাধান্য যা জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর প্রার্থীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়।

৩.০৪ বাংলাদেশ বহুলাংশে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পদ্ধতি (closed entry system) অনুসরণ করে, যেখানে প্রথম শ্রেণীর[১] কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ২৯টি ক্যাডার ও বিভিন্ন সার্ভিসে সরাসরি নিয়োগ করা হয়। অবশ্য সহায়ক স্টাফদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণীর পদে পদোন্নতির কিছুটা সীমিত সুযোগ রয়েছে। ১৯৮১ সনের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী ক্যাডার পদগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ প্রশাসন, কার্যভিত্তিক ও পেশাদারী পদসমূহ। সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত সুযোগের সমতার ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের কাজ পরিচালনা করে। মধ্য ও উচ্চ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে, এবং বিশেষ বিশেষ পদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ পদ বাইরে থেকে পূরণ করা যেতে পারে।

---

[১] প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা মূল সিদ্ধান্ত প্রণেতা। দেশের সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে তারা শতকরা প্রায় ৮ ভাগ (*গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস*, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৩)

৩.০৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে বাংলাদেশ জেলা ও অন্যান্য কোটাপদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।" আবার ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-তে উল্লেখ করা হয়েছে, " নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" উপরের অনুচ্ছেদ গুলো থেকে এটি পরিষ্কার যে নারী ও নাগরিকদের পশ্চাদপদ অংশের অগ্রগতির জন্য প্রণীত বিশেষ ব্যবস্থাদি সংবিধানের বিধানসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩.০৬ কিন্তু জেলা ও জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত অন্যান্য কোটাগুলো সংবিধানের বিধানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা সত্বেও জন্মস্থান ভিত্তিক জেলা কোটার বৈষম্যমূলক নীতি চালু রয়েছে। এ কোটা সরকারী চাকরিতে মেধাবী কর্মকর্তাদের প্রবেশকে ব্যাহত করা ছাড়াও নিয়োগের ব্যাপারটিকে নানাভাবে জটিল করে তুলছে। অন্তর্বর্তীকালীন একটি নিয়োগনীতি হিসেবে প্রচলন শুরু হলেও এ কোটা পদ্ধতি এখনও বলবৎ রয়েছে এবং মেধা কোটা ইতোমধ্যে শতকরা ২০ থেকে শতকরা ৪৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এখন যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তা হল:

কোটার ধরণ	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কমকর্তাদের জন্য (%)	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য (%)
মেধা	৪৫	–
অনাথ ও প্রতিবন্ধী	–	১০
মুক্তিযোদ্ধা	৩০	৩০
মহিলা	১০	১৫
উপজাতীয়	৫	৫
আনসার ও ভিডিপি সদস্য	–	১০
সাধারণ	১০	৩০
মোট	১০০	১০০

৩.০৭ অল্প সংখ্যক পদে লোক নিয়োগ করা হলে, সাধারণত যা ঘটে, ছোট ছোট বিভাগ ও জেলাগুলো পদ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এর কারণ মেধা কোটা পূরণ হবার পর বাকী কোটাগুলো আবারো বিভাগ ও জেলাগুলোর মধ্যে বন্টন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বড় জেলাগুলো বেশির ভাগ পদ পেয়ে যায় এবং ছোট জেলাগুলো কার্যত বঞ্চিত থাকে। অথচ পরিহাসের বিষয় হল, **যদিও সকল জেলা থেকে নিয়োগ সুষম করার লক্ষ্যেই ভৌগলিক কোটার প্রবর্তন করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে ঘটছে তার বিপরীত।** অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং- ২৪)

৩.০৮ দীর্ঘকাল ধরে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থায় জেলা কোটার সুবাদে উৎকৃষ্টদের ডিঙ্গিয়ে নিম্ন মেধার লোকেরা নিয়োগ লাভের সুযোগ পাচ্ছে। কর্মজীবনে মেধা ভিত্তিক উন্নতির জন্য এ সূচনা অশুভ হতে বাধ্য। **সরকারী কর্মকমিশন তাদের বার্ষিক রিপোর্টেগুলোতে মেধা নীতির অনুকূলে কোটা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য বার বার সুপারিশ করেছে।** কিন্তু তাদের সুপারিশের ব্যাপারে এখনো কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

৩.০৯ বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বা কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি)'র অভিমত হয়েছে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর এখন সময় এসেছে। অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক পদে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য মহিলা এবং পশ্চাৎপদ উপজাতীয় শ্রেণীর লোকদের কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে কোটা যাতে পুরোপুরি বিলোপ করা যায়, সেজন্য তাদের অগ্রগতি অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। **সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য সুযোগের সমতা এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে কোটা পদ্ধতি রাখা হবে একটি অত্যন্ত দুর্বল বিকল্প।**

৩.১০ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুতর সমস্যা হল বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, যাদের জন্য সারা দেশে বহু সংখ্যক পরীক্ষা হলের ব্যবস্থা করতে হয়। বিপুল

সংখ্যক কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার কারণে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয় না। অনিয়মিতভাবে পরীক্ষা নেয়ার কারণেও সমস্যা আরো বাড়ে। তাছাড়া, বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য বহু সংখ্যক পরীক্ষকের প্রয়োজন হয়। এ কারণে পরীক্ষকদের মানের বিষয়টি ছাড়াও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বরের অবশ্যম্ভাবী তারতম্য দেখা যায়। তাছাড়া কয়েকটি বোর্ডে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। তাতে পরীক্ষার ফলাফলে পার্থক্য হবার প্রচুর সুযোগ থেকে যায়। মেধার মূল্যায়ন এবং প্রার্থীদের উপযুক্ততা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব নয় বরং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও পরীক্ষা-মানের বিভিন্নতার কারণে বস্তুনিষ্ঠতা ব্যাহত হয়।

৩.১১ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে যে সুদীর্ঘ সময় নেয়া হয় তা নিয়োগ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুতর সমস্যা। নিয়োগদানের বর্তমান পদ্ধতিটি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত থাকে এবং বিভিন্ন চাকরির নিজস্ব চাহিদাগুলোর ব্যাপারে তা সংবেদনশীল হতে পারে না। যেসব নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সেসব নিয়োগের সময় এটা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

৩.১২ সরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে প্রচলিত নিয়োগ নির্দেশিকা অনুসারে তাদের কর্মচারী নিয়োগের স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে। তবে আরো মৌলিক পরিবর্তনের জন্য সরকারী ইউনিটগুলোর কাঠামো কিভাবে পরিবর্তন করা হবে, তার জন্য অপক্ষো করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সরকার যদি ইংল্যাণ্ডের মত *সংস্থা প্রধান উদ্যোগ* (agency head approach) বেছে নেন, তা হলে তাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণকে মধ্য পর্যায়ের কর্মচারী নিয়োগসহ কর্মচারী সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার সুযোগ দিতে হবে। ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুরে সংস্থা প্রধানগণকে ইতোমধ্যেই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেতনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিটি বিবেচনার দাবী রাখে, কারণ এতে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয় এবং নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া যায়। চাকরির জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকে পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত পদোন্নতি প্রথাটি অত্যন্ত অনমনীয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রশিক্ষকদের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় তাদেরকে এসব প্রতিষ্ঠানে যেতে কিভাবে বাধ্য করা হয় এবং সে কাজের জন্য তারা কতটা অনুপযুক্ত। *উন্মুক্ত নিয়োগ এ পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারে।*

৩.১৩ আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল, জটিল ও পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা যেকোনো সরকারের পক্ষে এক গুরুদায়িত্ব। সরকারের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল বিশেষ ব্যবস্থাপনা জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী অপরিহার্য জনবল নিয়োগ করা। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্যাডার ভিত্তিক "নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ" পদ্ধতি প্রয়োজনীয় দক্ষ পেশাজীবীদের প্রাপ্যতাকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করে। বাংলাদেশের দুর্বল আমলাতন্ত্রের প্রতিকারে "পার্শ্বিক প্রবেশ" (lateral entry) পদ্ধতি – অর্থাৎ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ক্যাডারে তার পদের সমান্তরাল যেকোনো পদে নিয়োগ দানের পদ্ধতি – একটি ভাল উপায় হতে পারে।

পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় বস্তুনিষ্ঠতা বাড়ানো

৩.১৪ অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন তার বার্ষিক (১৯৯৮) রিপোর্টে, ১৯৮২ সনের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিতে কতিপয় পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে এবং বিসিএস প্রথম শ্রেণীর পদের পরীক্ষা প্রক্রিয়া সংস্কারের ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছে। মূল সংস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দেয়া, পৃথক মনস্তাত্বিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা আরোপ করে প্রার্থী বাছাই করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার গড় নম্বর পূর্বেকার ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা এবং মোট নম্বরে যোগ করার জন্য ন্যূনতম নম্বর ২৫ এর পরিবর্তে ৩০ করা। বিসিএস পরীক্ষার জন্যে সাধারন এবং বিসিএস কারিগরি/পেশাজীবী ক্যাডারের জন্য মোট ১০০০ নম্বর পুনর্বন্টনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.১৫ কমিশন বর্তমানের একটির স্থলে দুটি সরকারী কর্মকমিশন গঠনের জন্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি)'র সুপারিশ বিবেচনা করেছে। এআরসি কর্তৃক একটি কর্মকমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছিল সাধারণ ক্যাডারের জন্য, অন্যটি কারিগরি ও শিক্ষা ক্যাডারের চাকরির জন্য। কমিশন এ মত পোষণ করছে যে শিক্ষা খাতে ক্যাডারের কলেবর ও এ খাতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের কথা বিবেচনা করে আরেকটি কর্মকমিশন গঠন করতে হবে। সম্ভব হলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন, এমন ব্যক্তিদের প্রস্তাবিত পিএসসিগুলোর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। পুনর্গঠিত তিনটি কমিশনে অল্প কয়েকজন পরীক্ষক দিয়ে গুটিকতক পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং বর্তমানের অনেকগুলো বোর্ডের পরিবর্তে একটি বোর্ড কর্তৃক মৌখিক

পরীক্ষা গৃহীত হতে পারে। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারী নিয়োগের জন্য বর্তমানে কোন নিয়োগকারী সংস্থা নেই, একাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।**

ক্যাডার সমস্যা

৩.১৬ ক্যাডার বৈষম্য বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের একটি অন্তর্নিহিত সমস্যা, যার মূল নিহিত রয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তান আমলে। *এডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি* (এএসআরসি)'র ১৯৭৩ সনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, *সিভিল সার্ভিস অনেকগুলো স্বতন্ত্র সত্তায় বিভক্ত, যেগুলো নিজেদের চারদিকে কৃত্রিম দেয়াল তুলে রেখেছে, যাদের কর্মজীবনের সম্ভাবনায় রয়েছে বিভিন্নতা এবং অত্যধিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা-মুখীতা। এদের মধ্যে রয়েছে, পেশাদারিত্বের অভাব, একটির বিরুদ্ধে আরেকটির বৈরী মনোভাব এবং নিম্নতর পদে কর্মজীবন শুরু করা ব্যক্তিদের জন্য শীর্ষে আরোহণের সীমিত সুযোগ।* বিভিন্ন ক্যাডার/সার্ভিসের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা বিরোধের মূল হল শ্রেষ্ঠতা, অর্থাৎ একটি শ্রেণী (সাধারণ ক্যাডার) কর্তৃক বাদবাকী শ্রেণীগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। এছাড়া এমন অনেক সার্ভিস ক্যাডার ও দপ্তর রয়েছে যেখানে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার/দপ্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করে ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা এনে উচ্চতর পদগুলো পূরণ করা হয়েছে।

৩.১৭ এএসআরসি দীর্ঘদিনের পুরনো এ সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে অভিজাত ক্যাডারগুলো বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে। কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, **কোনো ক্যাডারের জন্য কোনো পদ সংরক্ষিত থাকবে না এবং চাকরির যেকোনো পর্যায় থেকে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের শীর্ষে আরোহণের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে।** কিন্তু এএসআরসি'র সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.১৮ বর্তমান চাকরি কাঠামো হয়েছ ১৯৭৭ সনের বেতন ও চাকরি কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের ফল, যা আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪টি বিসিএস ক্যাডার নিয়ে একটি একীভূত সিভিল সার্ভিস কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ক্যাডারগুলোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯-এ। নতুন চাকরি কাঠামোর লক্ষ্য ছিল কৃত্রিম শ্রেণী-সচেতনতার বিলোপ, যোগ্যতাসম্পন্নদের জন্য পেশাগত সুযোগ সৃষ্টি, সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি সহমর্মিতা ও ঐক্যবোধ গড়ে তোলা, **সমান কাজের জন্য সমান বেতন** নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সবশেষে একটি অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে সুশৃংখল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা। এতে বিভিন্ন ক্যাডারে প্রবেশের একটি একীভূত স্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৩.১৯ এ কমিশনের প্রধান সুপারিশসমূহের একটি ছিল সিনিয়র সার্ভিস পুল (এসএসপি) নামে একটি শীর্ষ ক্যাডার গঠন, যার অধীনস্থ পদগুলোর জন্য সর্বমুখী অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের গুনাবলী থাকতে হবে। এসএসপির পদগুলোর জন্য সিভিল সার্ভিসের সকল শাখা থেকে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে মেধা ও যোগ্যতা যাচাই করে কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল।

৩.২০ ১৯৭৯ সনে এসএসপি'র প্রবর্তন এবং ১৯৮১ সনে বিসিএস ক্যাডার পদ্ধতির প্রচলন এবং উর্ধতন পর্যায়ে একীভূত ক্যাডারে সকল ক্যাডারের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা। এ উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন শাখায় প্রতিভাবানদের আকৃষ্ট করার সুবিধা রয়েছে এবং উচ্চতর বেতনের ব্যবস্থা ও সরকারের ভিতর নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। সর্বোচ্চ নির্বাহী ও নীতি নির্ধারণী পদের জন্য নিয়োগ ভিত্তি প্রসারও ছিল এসএসপির লক্ষ্য।

৩.২১ পদোন্নতির জন্য পিএসসি'র মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কতিপয় সরকারী কর্মকর্তার বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশকৃত একীভূত সিভিল সার্ভিস পদ্ধতি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়। ১৯৮৯ সনে জনাব এম এ মতিনের নেতৃত্বাধীন একটি কেবিনেট কমিটির সুপারিশক্রমে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তে বিসিএস-এর সকল ক্যাডারের জন্য কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়। নীতি নির্ধারণী ও উচ্চতর নির্বাহী পদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোটা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কর্মজীবনে অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসমতা থেকেই যায়। বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে অন্তর্কলহ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে।

৩.২২ ১৯৯৩ সনের পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর ষ্টাডি রিপোর্ট (ইউএনডিপি)-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, **বিদ্যমান ক্যাডার পদ্ধতি আন্তঃ সার্ভিস বৈরিতা, ঈর্ষা ও বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।** ১৯৯৬ সনের *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস* -এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ পর্যায়ে সমতা

থাকলেও কর্মজীবনে অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসমতা রয়েছে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, "অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের শীর্ষ পদগুলোর বেশির ভাগই পাচ্ছেন প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এবং তাদের পরে পাচ্ছেন অন্যান্য 'সাধারণ' শ্রেণীর অফিসারবৃন্দ।" উদাহরণ হিসেবে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দীর্ঘদিন শিক্ষাদানে নিয়োজিত কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে অতি অল্প সংখ্যকই শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চতর পদে যেতে পারেন। এ বিবদমান ক্যাডার পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

- কর্মরত মন্ত্রণালয়গুলোর গুচ্ছ তৈরি করা, এবং
- পেশাভিত্তিক নীতি নির্ধারণী গ্রুপ সৃষ্টি করা।

৩.২৩ প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের জন্য সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর স্তরে পৌছার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ নিজ পছন্দের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার পথ করে দিয়ে সরকারের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। গতানুগতিক ও কঠোর আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পদ পরিবর্তন ও দ্রুত পদোন্নতিতে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এর ফলে তা হ্রাস পাবে।

৩.২৪ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রুপ/গুচ্ছের ধারণাটি সর্বপ্রথম অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী'র নেতৃত্বে গঠিত *এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এন্ড সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি* (এএসআরসি ১৯৭৩)'র প্রতিবেদন থেকে পাওয়া গেছে। পরে অন্যান্য অনেক রিপোর্ট–যেমন, *পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেক্টর ষ্টাডি ইন বাংলাদেশ* (ইউএনডিপি ১৯৯৩) এবং *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস্- রিফর্মিং দি পাবলিক সেক্টর* (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৬) থেকে অনুরূপ সুপারিশ পাওয়া গেছে। এএসআরসি বিভিন্ন কার্যনির্বাহী পদ এবং এরিয়া গ্রুপ চিহ্নিত করে, যেমন, অর্থনৈতিক প্রশাসন, আর্থিক প্রশাসন, শিল্প প্রশাসন, বাণিজ্যিক প্রশাসন, সামাজিক প্রশাসন, শিক্ষা প্রশাসন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন। ইউএনডিপি রিপোর্টে মন্ত্রণালয়গুলোকে গুচ্ছে উপ-বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যেমন, নির্বাহী, নিয়ন্ত্রণমূলক, সেবামুখী/কল্যাণ ধর্মী, প্রবর্ধক (promotional), উন্নয়ন, স্টাফ/উপদেষ্টা কার্যাবলী, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক গ্রুপ/গুচ্ছ। অপরদিকে বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্টে সামষ্টিক অর্থনৈতিক গ্রুপ, সামাজিক খাত গ্রুপ, অবকাঠামো গ্রুপ, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রুপ এবং সাধারণ প্রশাসন গ্রুপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.২৫ বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্ব আনার লক্ষ্যে গ্রুপ/গুচ্ছ পদ্ধতি প্রবর্তন হবে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। অনেক দেশে একজন কর্মকর্তা যে মন্ত্রণালয়/দপ্তরে চাকরি শুরু এবং শেষ করেন, সেখানেই বিশেষ কাজে তার পেশাদারিত্ব অর্জিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সচিবালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের পদ হতে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে মন্ত্রণালয়গুলোকে গুচ্ছভুক্তকরণ এবং ***সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল*** **(এসএমপি)**-গঠন এর প্রস্তাব করা হয়েছ। উপ-সচিব পর্যায়ের পদগুলো পিএসসি কর্তৃক আয়োজনকৃত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দ্বারা পূরণ করা হবে , যাতে তারা স্ব-স্ব গুচ্ছে পেশাদারিত্ব অর্জন করতে পারেন। এর ফলে মেধা, পেশাদারিত্ব ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা গুচ্ছভুক্ত উচ্চতর পদে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবেন এবং উপরে উঠার সুযোগের অভাব নিয়ে তাদের যেসব অভিযোগ রয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৩.২৬ মন্ত্রণালয়ের কর্মনির্ভর গুচ্ছ (functional cluster) সম্পর্কে একটি প্রস্তাব সংযুক্তি ৩.১ -এ দেয়া হয়েছে।

জেন্ডার সমস্যা

৩.২৭ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই সিভিল সার্ভিসে এ দেশের মহিলাদের অংশগ্রহণের নজির রয়েছে। সরকার বিভিন্ন চাকরিতে এবং স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (এসওই)'র শূন্যপদগুলো পূরণে মহিলা কোটা নির্ধারণের মতো কয়েকটি ইতিবাচক ব্যবস্থা নিয়েছেন। সকল ক্যাডারের চাকরি মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত। তবে বাংলাদেশ সরকারের এ যাবৎ গৃহীত প্রচেষ্টা সত্বেও পুরুষ প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। ১৯৯৯ সনের ৫ জানুয়ারীর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারে সচিব পদে মাত্র একজন, অতিরিক্ত সচিব পদে একজন, যুগ্ম সচিব পদে চারজন এবং উপ-সচিব পদে ছ'জন মহিলা কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতার আটাশ বছর পরও মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া এবং সম্প্রতি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একজন মহিলা বিসিএস (বিচার) ক্যাডার থেকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে তাদের অংশীদারিত্ব শতকরা মাত্র ১২ ভাগ।

বক্স ৩.১

নারী-পুরুষের জন্য সুযোগের সমতা এবং লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী খাতে তাদের উপস্থিতি এখন পর্যন্ত অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সরকারী খাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ শ্রীলংকায় সর্বোচ্চ এবং নেপালে সর্বনিম্ন। ১৯৮৯ সনে ভারতের সরকারী খাতে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে মহিলাদের হার ছিল শতকরা ১৩.৬ ভাগ। বাংলাদেশে সরকারী খাতের কর্মসংস্থানে মহিলাদের অবস্থান পাকিস্তান ও নেপালের উপরে। ১৯৮৯ সনে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে মহিলাদের হার ছিল শতকরা মাত্র ৫ ভাগ এবং ১৯৯৩ সনে নেপালের গেজেটেড পদে মহিলার হার ছিল শতকরা ৪.৪ ভাগ। বাংলাদেশে সরকারী খাতের চাকরিতে মহিলাদের হার শতকরা ১২ ভাগ। কিন্তু প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে তাদের অংশ গ্রহণ অতিশয় সীমিত, পুরুষের তুলনায় শতকরা মাত্র ২ ভাগ।

সূত্র ঃ পিএলএজিই, ২০০০, পৃঃ ২২

বক্স ৩.২

সেবাখাতে মহিলা কর্মকর্তারা বেশ ভাল করছেন – কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক বাধাবিপত্তির কারণে প্রযুক্তি খাতে, বিশেষ করে প্রকৌশল কাজে/খাতে, তাদের ভাল করার সুযোগ সামান্যই।

সূত্র ঃ পিএলএজিই, ২০০০, পৃঃ ৭২

৩.২৮ সামগ্রিকভাবে (সংযুক্তি ৩.২-এ দেয়া সারণি ৩.১, ৩.২ ও ৩.৩ দ্রষ্টব্য) সরকারী খাতে মোট কর্মচারীর তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা এখনো অনুল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬ সনে সরকারী খাতে মোট কর্মচারীর মধ্যে মহিলা ছিলেন শতকরা মাত্র ১০ জন। শ্রেণীভিত্তিক হিসেবে মহিলাদের হার হল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণীর পদে শতকরা ১২ ভাগ ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে শতকরা ৬ ভাগ। **সকল শ্রেণীর চাকরিতে মহিলাদের উপস্থিতির হার তাদের জন্য সংরক্ষিত কোটার নীচে।**

৩.২৯ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের চাকরির শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পদে মহিলারা নিয়োজিত আছেন এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের দপ্তরে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ পদে মহিলারা কর্মরত রয়েছেন। মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে মহিলাদের হার শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগ, আর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনে তাদের হার শতকরা মাত্র ৬ ভাগ।

৩.৩০ সরকারের অন্য যেসব সংস্থায় মহিলাদের অপেক্ষাকৃত ভাল প্রতিনিধিত্ব রয়েছে[২] সেগুলো হয়েছ:

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়–জেলা ও দায়রা জজের দপ্তরে শতকরা ৯.১ ভাগ ও সুপ্রীম কোর্টে শতকরা ১০ ভাগ
(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়–মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে শতকরা ৯.৭ ভাগ
(গ) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়–বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ-এ শতকরা ৮.৭ ভাগ
(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে – শতকরা ৮ ভাগ
(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয়ে – শতকরা ৭.৩ ভাগ
(চ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে – শতকরা ৭ ভাগ।

৩.৩১ প্রশাসনের উচ্চতর পদে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। সরকার নির্বাহী পদগুলোতে মহিলাদের পার্শ্বিক প্রবেশের (lateral entry) বিষয় বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির শতকরা ১০ ভাগ কোটায় যুগ্ম-সচিব পদে কিছু মহিলা কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ দিয়েছেন।

---

[২] সূত্র ঃ পিএলএজিই, ২০০০, পৃঃ ৪৪

৩.৩২ একটি সমস্যা হয়েছ যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনসমূহে নিয়োগের বিষয়টি সরকারী কর্মকমিশনের আওতার বাইরে। কোনো সংস্থা এদের কাজের *মনিটরিং* না করায় মহিলাদের নিয়োগের ব্যাপারে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন কম হওয়ায় এসব পদের জন্য মহিলাদের পাওয়া যায়, তবুও মহিলাদের হার এক্ষেত্রে অনেক কম। এ থেকে বোঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারের আদেশ বাস্তবায়নে আরো বেশি *মনিটরিং* -এর প্রয়োজন রয়েছে।

৩.৩৩ মহিলাদের পিছিয়ে থাকার কারণ অনেক – যেমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে দেরিতে প্রবেশ, গোঁড়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি। অবশ্য সম্প্রতি এ প্রবণতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত দশক পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে মহিলারা সাধারণত শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবাকে পছন্দ করতেন। এখন মহিলা প্রার্থীরা বিসিএস (পুলিশ)সহ সকল ক্যাডার বেছে নিচ্ছেন এবং এসব ক্যাডারে পুরুষের সঙ্গে তুলনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পিএলএজিই ২০০০ লক্ষ্য করেছে যে, প্রথম বিসিএস-এ শতকরা ৭ ভাগের তুলনায় ১৮শ বিসিএস-এ মহিলাদের অংশগ্রহণের হার শতকরা ১৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ১৯৮৬ সনে শতকরা ১৪.৫৫ ভাগের তুলনায় ১৮শ বিসিএস-এ প্রথম শ্রেণীর পদে শতকরা ১৭ ভাগ মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন (পিএসসি রিপোর্ট ১৯৯৮)।

৩.৩৪ বাংলাদেশ সরকার সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শতকরা ১০ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শতকরা ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করে যাচেছন। বিশেষ ভাবে মহিলাদের স্বার্থ দেখার জন্য একটি মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফলে এ যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচেছ না। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক পরিবর্তন খুবই জটিল বিষয় এবং এ পরিবর্তনের গতিও হয় মন্থর। প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকার চাইলেই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেন না। কারণ, সরকারে ও বাইরে পর্যাপ্ত শিক্ষিত মহিলার উপস্থিতি খুব কম। এজন্য, প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির একটি আবশ্যিক ভূমিকা হিসেবে তাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন এবং সরকারী চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্য সর্বোতভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩.৩৫ উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের জন্য অধিকতর কোটা সংরক্ষণ এ সমস্যার সমাধান নয়। এতে শুধু প্রশাসনের দক্ষতাই হ্রাস পাবে। চাকরিতে মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য এবং সর্বাধিক সময় কাজ করে যাবার জন্য কাজের পরিবেশের উন্নতি বরং একটি বাস্তব প্রতিকার। কমিশন মনে করে, কোটা সংরক্ষণের পরিবর্তে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে লিঙ্গ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি একটি অধিক ফলপ্রসূ উদ্যোগ হতে পারে। **একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কর্মজীবনে উন্নতির ব্যাপারে মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।**

মহিলাদের জন্য কাজের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি

৩.৩৬ *দি পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেক্টর ষ্টাডি* ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সনের *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস্* -এর প্রতিবেদনসমূহে চাকরিতে মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য কাজের পরিবেশে ব্যাপক উন্নতি সাধনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৩.৩৭ মহিলাদের পরিবার এবং তাদের উর্ধতন কর্মকর্তারা মনে করেন যে, মহিলা কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা বাইরে থাকলে তাদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ সংরক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন ও উচ্চতর পদে ফলপ্রসূভাবে কাজ করার জন্য তাদের বিকাশকে ব্যাহত করে। এ পরিস্থিতি নির্বাহী পদে মহিলাদের ভবিষ্যত পদোন্নতির বিরুদ্ধেও কাজ করে।

৩.৩৮ কমিশন মনে করছে যে, মাঠ পর্যায়ের চাকরিতে মহিলারা যাতে ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারেন, সেজন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি নেয়া প্রয়োজন:

ক) মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত আবাসন, এবং যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে
খ) শিশুদের জন্য দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে
গ) মহিলা কর্মচারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি রাখতে হবে
ঘ) নিরাপদ আবাসনের সুযোগ দিতে হবে
ঙ) মাঠ পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য রেষ্ট হাউজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩.৩৯ সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত দম্পতিদের একই/নিকটবর্তী কর্মস্থল/এলাকায় দায়িত্ব দেয়ার জন্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা উপেক্ষা করা হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো দপ্তর আন্তঃবিভাগ বদলির উপর এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে যা কর্মজীবী দম্পতির জন্য নির্বিঘ্ন পারিবারিক জীবন যাপন অসম্ভব করে তুলেছে। শিশু পরিচর্যা সুবিধা সম্বলিত একই দপ্তরে স্বামী-স্ত্রীকে নিয়োগ করা হলে তা মহিলা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেখাশোনার জন্য সুবিধাজনক হবে এবং যৌন হয়রানির সম্ভাবনাও তাতে কমবে।

৩.৪০ কমিশন কর্মজীবী দম্পতিকে একই কর্মস্থলে রাখার জন্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করে এবং একই সঙ্গে **"স্বামী-স্ত্রীকে একই এলাকায় নিয়োগ দেয়ার" সরকারী নির্দেশটি সরকারী সংস্থাসমূহ ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগ করার সুবিধার্থে বিষয়টি আরো ভালভাবে *মনিটরিং*-এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করে।**

পদোন্নতি ও কার্যসম্পাদন মান

৩.৪১ সরকারী বিধিতে পদোন্নতি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। অধস্তন কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা-এবং-মেধার নীতি অনুযায়ী পদোন্নতি দেয়া হয়। এ বিধি অনুযায়ী, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ করলে এবং উচ্চতর পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়। পদোন্নতির দ্বিতীয় নীতি হল মেধা-এবং-জ্যেষ্ঠতা। এ নীতি অনুযায়ী পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেয়া হয়। দেশের প্রশাসনিক চর্চার ক্ষেত্রে এ ঐতিহ্যটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে এ নীতি চমৎকারভাবে ন্যায়দর্শিতা ও জনস্বার্থের সমন্বয় বিধান করতে পারে। কিন্তু নীতিমালা অনুসরণ না করার ফল হবে অন্যায্য পদোন্নতি।

৩.৪২ ১৯৮১ সনের সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে কর্মকর্তার শ্রেণীভেদ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চারটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যথা: পিএসপি, বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি (ডিপিসি), সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) ও পদোন্নতি বিষয়ক কাউন্সিল কমিটি। তবে ১৯৯১ সনে সরকারের এক সিদ্ধান্তে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, ৫ম ও তদুর্ধ গ্রেডে পদোন্নতির সকল বিষয় সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন এসএসবি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখবে এবং এরপর তা পদোন্নতি বিষয়ক কাউন্সিল কমিটির নিকট প্রেরিত হবে। শুধুমাত্র মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিল কমিটি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিবেচনাকে যথেষ্ট গুরত্ব দিত। কিন্তু এখন কাউন্সিল কমিটি বিলোপ করা হয়েছে। পদোন্নতির সকল বিষয় এখন এসএসবির মাধ্যমে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যায়।

কার্যসম্পাদনের সঙ্গে পদোন্নতিকে সংযুক্ত করা

৩.৪৩ **কর্মচারীদের কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল কাজ পাওয়ার উপায় হল তাদের লক্ষ্যসমূহ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়া এবং এসব লক্ষ্যের নিরিখে তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করা।** বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে এ চর্চাটি হয় না। প্রকৃত পক্ষে কোনো বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন পরিহার করার জন্য বেশিরভাগ কর্মকর্তা সম্পাদিত কাজের একটি অস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। বক্স ৩.৩-এ কয়েকটি দেশে পদোন্নতির পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার সঞ্চার করার প্রচেষ্টা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ধারণা বাংলাদেশে কাজে লাগানো যেতে পারে। বলাবাহুল্য, বস্তুনিষ্ঠ কার্যসম্পাদন মান প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে।

অন্যান্য দেশ কার্যসম্পাদনের সঙ্গে পদোন্নতিকে যে ভাবে সংযুক্ত করে

যুক্তরাজ্য: কয়েক বছর ধরে একটি অপেক্ষাকৃত অংশগ্রহণমূলক লক্ষ্যভিত্তিক পদোন্নতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলো কতিপয় নীতি প্রতিপালন সাপেক্ষে নিজ নিজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের স্বাধীনতা ভোগ করছে, যেমন সকল সরকারী কর্মচারীকে বার্ষিক ভিত্তিতে চাকরিকালীন মূল্যায়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার করা হয়। এ মূল্যায়ন পর্যালোচনাটি বার্ষিক ষ্টাফ রিপোর্টের অংশে পরিণত হয়। সুপারভাইজাররা পূর্বনির্ধারিত কাজের লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং আগামী বছরের নতুন লক্ষ্যসমূহ স্থির করার জন্য কর্মচারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। বার্ষিক কার্যসম্পাদন রিপোর্টের একটি উন্মুক্ত অংশে উভয় পক্ষের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, পদোন্নতির উপযুক্ততা বিবেচনা থেকে আলাদাভাবে বর্তমান চাকরিতে কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন করা হয় এবং পদোন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে প্রার্থীদের প্রাক্তন কর্তাব্যক্তিদের সাক্ষাতকারের পাশাপাশি স্টাফ রিপোর্টের উপর।

সিঙ্গাপুর: কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন ও পদোন্নতির ব্যাপারে সিঙ্গাপুর একটি অত্যন্ত উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পদোন্নতি বহুলাংশে মেধা নির্ভর, সে সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংবিধিবদ্ধ বোর্ডের ভিতর কর্মীদের নিয়োগ বা বদলীর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সবার আগে সরকার গোপনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি বাদ দিয়ে শেল অয়েল কোম্পানী উদ্ভাবিত অংশগ্রহণমূলক কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ মূল্যায়ন দুই ভাগে বিভক্ত। একটিতে কর্মকর্তার অতীতের বিভিন্ন পদে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়, অপরটিতে প্রার্থীর ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দানের গুণাবলী চিহ্নিত করে তার তথাকথিত 'হেলিকপ্টার সামর্থ্য' (helicopter capacity)–নিরূপণ করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ড: নিউজিল্যাণ্ড কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন ও পদোন্নতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংযোগ নির্ধারণ করেছে। বেসরকারী কিছু মডেল ব্যবহার করে নিউজিল্যাণ্ড সরকার পর্যালোচনার শুরুতে স্বীকৃত লক্ষ্য ও মানের নিরিখে কার্যসম্পাদন পরিমাপ করেন। পরিণতি (যেমন অপরাধের হার, সড়ক দুর্ঘটনা) এবং ফলাফলের (যেমন টহল সংখ্যা, সড়ক উন্নয়ন) সঙ্গে কার্যসম্পাদন মান মিলিয়ে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণরের চুক্তিটি মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুদ্রাস্ফীতির হার বার্ষিক শতকরা শূন্য থেকে ২ এর মধ্যে রাখতে পারলে তিনি বোনাস পান; মুদ্রাস্ফীতির হার চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তিনি যে কেবল বোনাসই হারান তা নয়, তাকে তিরস্কার করা হতে পারে এবং তার চুক্তির নবায়ন নাও হতে পারে।

সূত্র ঃ বিশ্ব ব্যাংক, *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস্* ১৯৯৬, পৃঃ ১২৮

চাকরির আবর্তন

৩.৪৪ সরকারী খাতের কর্মচারীদের দুর্বল কার্যসম্পাদনের আরেকটি কারণ হল তাদের চাকরিতে ঘন ঘন আবর্তন। কর্মকর্তাদের যখন তখন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপরিকল্পিত বদলির পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। উচ্চাভিলাষী সরকারী কর্মকর্তারাও আবর্তনকে পদোন্নতির একটা উপায় হিসেবে দেখেন, যার সমাপ্তি হয়তো দাতার অর্থায়নপুষ্ট কোনো চাকরি দিয়ে। একজন আমলা বলেছেন, "সফল কর্মজীবন বলতে এখন যে হাস্যকর ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে, তা হল, ঘুরে ঘুরে যত বেশি সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করা এবং খুব সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা।" এ চিত্রটি দেশের শীর্ষ সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল পর্যায়েই প্রযোজ্য, যেহেতু চাকরি বা পেশাগত উন্নতির বিষয়টি সাধারণত চাকরির আবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

৩.৪৫ দায়িত্বের স্বল্পমেয়াদ অত্যন্ত বিপর্যয়কর হতে পারে। সরকারী কর্মকর্তারা তাদের স্বীকৃত লক্ষ্য পূরণের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য প্রায়ই বদলিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় বহুল ব্যবহৃত এরকম একটি মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়: "আমি মাত্র কয়েক মাস হল এ চাকরিতে এসেছি।" **মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে কোনো না কোনো ছুতোয় এধরণের লক্ষ্যহীন বদলির রীতিও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করে।** এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় হয়েছ – পেশাদার শ্রেণী তৈরি। যদি কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সিভিল সার্ভিস পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন হয় তাহলে একটি গুচ্ছের অধীন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নীতিনির্ধারণী অবস্থানে নিয়ে যাবে। এ ব্যবস্থাটি গুচ্ছের মধ্যে বিশেষজ্ঞ

জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সকল পদ এবং দপ্তর প্রধানের পদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ৩ থেকে ৫ বছর নির্ধারণ করার মাধ্যমে এ পদ্ধতির শক্তিবৃদ্ধি হবে।

প্রশিক্ষণ

৩.৪৬ আগামী বছরগুলোতে সিভিল সার্ভিসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে প্রশিক্ষণ। কিন্তু একটি মৌলিক সমস্যা হল যে, সরকার বাজেট বরাদ্দ, পদোন্নতি ও প্রেরণামূলক ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণকে অত্যন্ত কম অগ্রাধিকার দেন। তাছাড়া বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর প্রায়ই তাদেরকে প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ মুক্তির উপর যেভাবে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বেসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা যেভাবে বাড়ছে এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনসেবার দিকে যেভাবে ঝোঁক বাড়ছে, এর ফলে আগামী বছরগুলোতে সরকারী কর্মকর্তাদের কাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল ও জ্ঞান আয়ত্ত করার কাজে একটা অপরিহার্য প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই সকল পর্যায়ের কর্মচারীকে কিছু সময় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। চাকরিতে প্রবেশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পিএসসি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সরকারী কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হয়। বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলাফল সাধারণত চাকরিতে কর্মজীবনের উন্নতি নিশ্চিত করার কথা।

৩.৪৭ প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন:

ক) কর্মকর্তাগণ চাকরিকালীন প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না, কারণ প্রশিক্ষণ থেকে তারা উপযুক্ত কোন প্রেরণামূলক সুবিধা পান না। তাই কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণকে হাল্কাভাবে নেন।

খ) যারা অন্যদের চেয়ে ভাল ফলাফল করেন তাদের স্বীকৃতি বা পুরস্কার দেয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

গ) কর্মকর্তাদের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ পরিহারের প্রবণতা রয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণকে প্রধানত আর্থিক বিবেচনায় আকর্ষণীয় বিবেচনা করা হয়।

৩.৪৮ প্রশিক্ষণকে পদোন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হলে এ ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। পদোন্নতি মূল্যায়নকালে প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলাফলকে গুরুত্ব দেয়া হলে প্রশিক্ষণার্থীরা ভাল ফল অর্জনের জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রতি বেশি মনোযোগী হবেন। পেশাগত উন্নয়নের প্রেরণামূলক ব্যবস্থা হিসেবে **বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে যোগদানকে বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতির পূর্বশর্ত করা যেতে পারে।**

৩.৪৯ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের উপকরণ/সুবিধা ইত্যাদির নিরিখে বাংলাদেশে সরকারী চাকরিজীবীদের জন্যে বেশ চমৎকার বিস্তৃত একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিভাগীয় সদর ভিত্তিক বিপিএটিসি'র আঞ্চলিক ষ্টাফ ট্রেনিং সেন্টার এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর পরিচালিত অন্য অনেক ধরণের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিপিএটিসিসহ পঁচিশটি প্রতিষ্ঠান বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাসহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ১৯৯৮ সনের জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত রিপোর্টে বিদ্যমান সুবিধাদি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে এক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়।

৩.৫০ রিপোর্টে দেখানো হয় যে:

ক) বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ২৫টি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ কর্মকর্তা তাদের চাকরিকালে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সুযোগ অতি সামান্যই।

খ) প্রাসঙ্গিক নিয়োগ বিধি অনুযায়ী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা মধ্য পর্যায়ের পদোন্নতির পূর্বশর্ত হলেও বিসিএস ক্যাডারের শতকরা ৫০ ভাগ কর্মকর্তা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেননি।

গ) কোনো প্রতিষ্ঠানই নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করে না।

ঘ) কর্মকর্তাদের (প্রকল্প দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে) বর্ণিত চাহিদা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রদত্ত কর্মসূচির তুলনামূলক বিচারের নিরিখে প্রশিক্ষণের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায়।

ঙ) অনেক প্রশিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (কখনো কখনো আস্তাকুঁড় হিসেবে অভিহিত) দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়।

চ) প্রশিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ন্ত্রণ থাকে অতি সামান্যই, এবং যেসব স্টাফ কাজ করেন না তাদেরকে বাদ দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ছ) সকল প্রশিক্ষকের মধ্যে মাত্র অর্ধেক আনুষ্ঠানিকভাবে "প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ" গ্রহণ করেছেন।

জ) মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোথাও প্রশিক্ষণ চাহিদার পদ্ধতিগত কোনো মূল্যায়ন করা হয় না; চাকরির কার্য সম্পাদনের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়নেরও কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঝ) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সবগুলোই তাদের ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগের অনেক নীচে কাজ করছে।

৩.৫১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রহণযোগ্য কর্মকর্তাদের জন্য আস্তাকুঁড় হিসেবে মনে করা ঠিক হবে না। বরং সশস্ত্র বাহিনীতে যেমন দেখা যায়, বাংলাদেশ সামরিক একাডেমী বা সামরিক ষ্টাফ কলেজে অধিনায়ক বা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়াটা সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চতর পর্যায়ে দ্রুত পদোন্নতির একটি পূর্বসূচনা। এ রীতি যোগ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্রে একটা প্রেরণামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সনের জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ সমীক্ষার সুপারিশ যথাযথ বিবেচিত হতে পারে। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এসব ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ স্টাফ নিয়োগ প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। সরকারের ভেতর বা বাইরে থেকে এ কাজের উপযুক্ত যে কেউই চুক্তির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুনির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে সরকার থেকে দক্ষ ও যোগ্য প্রশিক্ষকদেরও সেখানে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান যেতে পারে এবং নিয়োগের দ্বিতীয় একটি ধারা হিসেবে একে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৫২ সরকারকে বিদেশে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত একটি নীতিও গ্রহণ করতে হবে। যারা বিদেশে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, সচরাচর তাদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করা হয় না। পূর্বোল্লিখিত সমীক্ষায় নিরূপিত চাহিদার সঙ্গে বিদেশে প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করার একটি সুস্পষ্ট নীতি সুপারিশ করা হয়েছে। চাকরির উপযুক্ততার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদেশে বর্তমান সাধারণ ধরণের প্রশিক্ষণ বন্ধ করার জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা বিবেচনার যোগ্য।

৩.৫৩ বিশ্বের সংস্কারপন্থী প্রায় সকল সরকার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করেন। এজন্য শীর্ষস্থানীয় দেশগুলো তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে ফেলছে। তারা তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাণিজ্যমুখী করে তুলছে। একই সঙ্গে, সম্মত সম্পদের মধ্যে সম্মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদানে ব্যবস্থাপকদের জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা হয়েছ (বক্স ৩.৪ দ্রষ্টব্য)

বক্স ৩.৪

সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়াস

যুক্তরাজ্য: ইংল্যাণ্ডের সিভিল সার্ভিস কলেজে এখন বড় ধরনের পরিবর্তন চলছে। কলেজটি এখন একটি ব্যবসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কলেজটি ব্যবসায়ী ভাষা ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করেছে, একটি কৌশলগত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছে এবং সাতটি বাজার ব্যবসা গ্রুপে সংগঠিত কোর্স চালাচ্ছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে অত্যন্ত কঠোরভাবে সম্পাদিত কাজের বিচার করা হয়েছ এবং বেতনের মাধ্যমে ভাল কাজকে কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য হয়েছ সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠান বলে কলেজটির যে পরিচিতি ছিল – যেখানে ব্যর্থ সরকারী কর্মকর্তাদের পাঠান হত – সে পরিচিতি থেকে বেরিয়ে আসা। আজকে এর কোর্সে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে মেধাবীরা নাম লেখাচ্ছে, যার জন্য সচরাচর ব্যয় ধরা হয়েছ সপ্তাহে ১,০০০ পাউন্ড। ১৯৯২ সনে কলেজের আয় হয়েছে ১ কোটি ৪৭ লাখ পাউণ্ড।

ভারত: ভারতীয় প্রশাসনিক সার্ভিসেও (আইএএস) ব্যাপক রদবদল চলছে। আইএএস কর্মকর্তাদের নতুন বাজার দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুনর্বিন্যস্ত করা হচ্ছে। চারটি ভারতীয় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (আইআইএম) এর মত শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য নবায়নী কোর্স চালানো হয়েছ। শ্রেণী কক্ষ ছাড়াও কর্মকর্তাদের স্টক এক্সচেইঞ্জ , এবং শিল্প ও বণিক সমিতিতে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উদারনীতিকরণ যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমে এসেছে বলে জানা গেছে। বেশিরভাগ কর্মকর্তা এখন অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিতে আনা পরিবর্তন বুঝতে এবং ভারতের উপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র প্রভাব উপলব্ধির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সম্ভবত এসব পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুফল এসেছে সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে।

সূত্র ঃ বিশ্ব ব্যাংক, *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস্* ১৯৯৬, পৃঃ ১৩২

বেতন ভাতা

৩.৫৪ বাংলাদেশের অকার্যকর আমলাতন্ত্রের অনেক সমস্যাকেই দিনে দিনে কমে আসা এবং সংকুচিত হওয়া বেতনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। বিভিন্ন সরকার চার থেকে আট বছর পর পর জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে বেতনের সমন্বয় করেছেন। ১৯৭২ সন থেকে নিয়ে পাঁচটি বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং সে থেকে বেতনের পাঁচ দফা সংশোধন করা হয়েছে। প্রথম বেতন কমিশনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে ব্যবধান কমানো। পরবর্তী বেতন কমিশনও বেতন সংশোধনে সর্বেচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে ব্যবধান কমানোর সে দর্শন একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩.৫৫ **স্বাধীনতা পূর্বকালের ১ ঃ ৪৬ আনুপাতিক হার ১৯৭২ সনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তিত হয়ে ১ ঃ ১৫ হয় এবং ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ১৯৯৭ সনের শেষ বেতন স্কেলে ১ ঃ ১০ পর্যায়ে পৌঁছে** । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাতকে আক্ষরিক অর্থে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বুঝানোর জন্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ দুটি বেতন সত্যি তুলনীয় নয়। সর্বোচ্চ বেতন হল সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত-প্রণেতা সরকারী কর্মকর্তাদের বেতনের শেষ ধাপ। বেতনের সর্বনিম্ন ধাপ হল সর্বনিম্ন সরকারী কর্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন। বাস্তব তুলনা হওয়া দরকার সর্বনিম্ন (গ্রেড ২০-১৬) প্রবেশ পর্যায়ে সর্বনিম্ন বেতন ও সর্বোচ্চ বেতনধারী গ্রুপের (গ্রেড ৯-১) প্রবেশ পর্যায়ে বেতনের মধ্যে এবং অনুরূপভাবে, সর্বনিম্ন বেতনভোগী গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতন ও সর্বোচ্চ বেতনভাগী গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে। হিসাব করে দেখা গেছে, চাকরি জীবনে প্রবেশ পর্যায়ে দুটি গ্রুপের অনুপাতিক হার ২.৮৭ এবং চাকরির শেষ পর্যায়ে ৪.৫৫। সকল সুযোগ সুবিধা ধরলে এক হিসেবে এ অনুপাত ২-এ নেমে দাঁড়ায়। এ ফল পাওয়ার কারণ হল সর্বনিম্ন কর্মচারীদের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর তুলনায় বিভিন্ন ধরণের প্রচুর সুবিধা দেয়া হয়। বাংলাদেশ এরকম ফ্ল্যাট পে-স্ট্রাকচার (flat pay-structure) এর একটি অভিনব পর্যায়ে অবস্থান করছে।

৩.৫৬ সরকারী চাকরিজীবীদের বেতন ভাতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রকৃত হিসেবে বেতনের বড় ধরণের ক্রমাবনতি যা আবারো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের উপর বড় ধরণের একটি আঘাত। এর ফলে অবশ্য সর্বনিম্ন গ্রুপের হাতে উচ্চতর ক্রয় ক্ষমতা এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৬৯-৭০ ভিত্তি বছরের মজুরীর বিচারে সর্বনিম্ন গ্রেড

২০ প্রকৃত হিসেবে শতকরা ১১ ভাগ লাভ করেছে, অথচ বেতন সংশোধনের ফলে গ্রেড ১-এর কর্মকর্তারা হারিয়েছেন শতকরা ৭৩ ভাগ। সকল উচ্চতর গ্রেডের বেতনে এ ধরণের ক্রমাবনতি দেখা গেছে।

৩.৫৭ বাংলাদেশের বেতন নীতির তৃতীয় আরেকটি অশুভ বৈশিষ্ট হল নন গেজেটেড কর্মচারীদের (গ্রেড ২০-১১) মধ্যে প্রত্যেক কর্মচারীর চাকরির ৮, ১২ ও ১৫ বছর পূর্তির পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে পদোন্নতি। সাধারণভাবে দেখা গেলে, সমতাবাদের একটি ভুল ধারণা থেকে এবং এ শ্রেণীর মোটামুটি সকল কর্মচারীর তীব্র বিক্ষোভের কারণে উচ্চতর বেতন গ্রেডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নীত হবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর একটি পরিণতি হল, কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা ও দক্ষতার শোচনীয় অভাব। আরেকটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার হল একটি নিম্ন পর্যায়ের পদে ঐসব কর্মচারীর পদোন্নতির সুবিধার্থে একাধিক পদের জন্য বহুবিধ বেতন স্কেল সৃষ্টি। অবশ্য সকল ক্যাডার বা সার্ভিসে এ রীতি একইভাবে অনুসৃত হয় না। যারা এ সুবিধা পাচ্ছেন না তাদের জন্য এটি একটি বড় অন্তর্জ্বালা।

বেতন বিন্যাসের ব্যাপকতা

৩.৫৮ বাংলাদেশে একটি একীভূত বেতন স্কেলের প্রথাগত ও অনমনীয় (regid) পদ্ধতি রয়েছে। এ স্কেলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত ধাপ-বিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে। এ পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। এর একটি হল যে, ব্যবস্থাপকরা তাদের কর্মচারীদের ভালভাবে জানলেও বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের তেমন প্রভাব নেই। আরো সাধারণভাবে দেখতে গেলে এতে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগের সুযোগ সংকুচিত হয়। কাজেই বেশিরভাগ সংস্কারপন্থী দেশ প্রথাগত পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো বহাল রাখলেও, পাশাপাশি আরো বেশি নমনীয়তা গড়ে তোলার কাজও তারা শুরু করেছে। কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশে ব্যবহৃত এ ধরনের একটি উদ্যোগ হল *ব্রড ব্যান্ডিং* (broad banding)। এর অর্থ হল, চাকরিতে নবাগতরা একটি সুনির্দিষ্ট অংকের প্রাথমিক বেতনের পরিবর্তে ভিন্নতর বেতনস্তরে প্রবেশ করতে পারেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, পরবর্তী বেতন বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না, এর সাথে কার্য সম্পাদন মান সম্পর্কিত থাকে।

প্রান্তিক সুবিধাদি

৩.৫৯ নিচুস্তরের জীবন ধারণ মজুরী পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি বাড়ানো হয়েছে। এসব সুবিধা নগদ টাকায় ও দ্রব্য আকারে দেয়া হয়। সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে বাসস্থান বা বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্য সার্বক্ষনিক গাড়ি এবং নন-গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য যাতায়ত ও টিফিন ভাতা। এসব ভাতা/সুবিধার জন্য মজুরী ও বেতনের হিসেবে একটা বড় প্রভাব পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি সার্বক্ষণিক গাড়ির পেছনে সরকারের মাসিক আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়, অথচ ব্যক্তি মালিকানাধীন একই রকম গাড়ির জন্য ১০,০০০ টাকার মতো খরচ হয়।

বেতন নীতির মূল্যায়ন

৩.৬০ বেতন সম্পর্কিত সরকারের নীতিকে অসম বেতন ও কার্য সম্পাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা বলা চলে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াসহ এ অঞ্চলের অনেক সরকার উচ্চতর কার্য সম্পাদনের জন্য বেতনে অধিকতর অসমতার নীতিতে তাদের সরকারী চাকুরেদের বেতন সংক্রান্ত নীতি পরিচালনা করেন। বেসরকারী খাতও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে। বস্তুতপক্ষে, সিঙ্গাপুরে সরকারী কর্মচারীদের একটা বাজারমুখী বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন দেয়ার ঘোষিত নীতি রয়েছে। বিশ্বের সকল সরকার –যাদের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা বেশি– বেতন ও কার্যসম্পাদনের মধ্যে হয়ত কিছুটা আপোষ করে চলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মত কোথাও তা এত অযৌক্তিক নয়, বা তার প্রভাবও এতটা প্রতিকূল নয়। এ নীতি মেধাবী ব্যক্তিদের সরকারী চাকরিতে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছ এবং তারা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে ধাবিত হয়েছেন। সরকারের নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি দেয়ায় তা অপ্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের জন্য অশুভ চাপের সৃষ্টি করছে যা সরকারের উপর এক অসহনীয় আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে। **বাজারে বিকৃতি ঘটলে তা দু'দিকেই কাটে – একদিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে মেধাবীরা উপেক্ষিত হন এবং অন্যদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জনবল নিয়ে সরকারের আকার স্ফীত হয়।**

সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে মজুরি ও বেতন

৩.৬১ বাংলাদেশ হয়েছ সে গুটিকয়েক দেশের একটি যেখানে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেতন সরকারের নিয়মিত বেতন থেকে ভিন্ন হয় না। এর ফলে কার্যসম্পাদন, চাকরির মান, সততা ও ব্যবস্থাপকদের মানের উপর এ নীতির একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় ম্যানুফেকচারিং ইউনিটগুলোর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বত্র একইরকম বেতন স্কেল নেই। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মজুরি ও বেতন সচরাচর অনেক বেশি। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের লাভের অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব বেতন কাঠামো প্রয়োগ করতে পারে। পূর্ব এশিয়ার আরো অনেক উন্নয়নশীল দেশ এ রীতি অনুসরণ করছে।

বেতন নীতি

৩.৬২ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর কমিশন এ উপসংহারে পৌঁছেছে যে, করদাতারা ভোগান্তিহীন, সৎ ও সন্তোষজনক জনসেবার জন্য সরকারী কর্মচারীদের উচ্চতর বেতন দেয়ার বাড়তি বোঝা বহন করতে প্রস্তুত। পূর্ব এশীয় দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে ব্যাপকভাবে জনসেবার মান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিসহ বড় ধরনের সংস্কার কাজ গ্রহণ করা সম্ভব। বাংলাদেশেও এরকম প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, দরিদ্ররাও (যেমন, গ্রামীণ ঋণ গ্রহীতাগণ) উন্নত মানের পণ্য ও সেবার জন্য বেশি মূল্য দিতে রাজি। বেতনের সংস্কার জরুরীভাবে প্রয়োজন হলেও সরকারী কর্মচারীদের নিম্নমানের কাজ, জনগণের প্রতি তাদের মনোযোগের অভাব এবং প্রবঞ্চনামূলক আচরণের জন্য নাগরিককরা আজকের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করবেন না। করদাতাদের প্রতি জবাবদিহিতা ও মনোযোগী সেবার একটা সন্তোষজনক পদ্ধতি কার্যকর হলে বেতন নীতিতে একটা বড় ধরণের পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাস্তবায়নের সময় এদুটো বিষয়কেই সম্পর্কিত করতে হবে।

৩.৬৩ কমিশন বিশ্বাস করে যে, একটা নির্দিষ্ট বিরতি শেষে নিয়ম মাফিক বেতন কমিশন গঠনের পর এডহক বেতন সংশোধনের রীতি পরিহার করতে হবে। এর জায়গায় সুশাসনের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি বেতন নীতি চালু করা উচিৎ। এ ধরণের একটি বেতন নীতির উপাদানগুলো হবে নিম্নরূপ:

ক) কর্মচারীদের জন্য সরকারী ব্যয় আরো অর্থবহ করার জন্য অপচয়মূলক সকল প্রান্তিক সুবিধা বেতনের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

খ) সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য যানবাহনের জন্য পর্যাপ্ত অগ্রিম দিতে হবে।

গ) কর্মচারীদের নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করার জন্য সুদের ক্ষেত্রে ভর্তুকী ব্যবস্থাসহ সহজ ও সমান মাসিক কিস্তিতে প্রদেয় একটি গৃহ নির্মাণ তহবিল গঠন করতে হবে।

ঘ) বেতন নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাজারমুখী এবং প্রতিযোগিতামূলক মজুরী ও বেতন দেয়া।

ঙ) সরকারী বেতন কাঠামো থেকে আর্থিক সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাদ দিতে হবে। বেতন দেয়ার সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাদেরকে বেতনসহ নিজস্ব চাকরির শর্তাবলী নিজেদের গ্রহণ করতে হবে।

চ) **মুদ্রাস্ফীতির কারণে যাতে মজুরি ও বেতন সংকুচিত না হয়ে পড়ে, সেজন্য মজুরি ও বেতনের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচককে (সিএলআই) সম্পর্কিত করতে হবে।**

ছ) 'ব্রড-ব্যান্ডেড' বেতন পদ্ধতিটি বিবেচনা করতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন উচ্চতর স্কেল পাওয়ার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে বেতন বৃদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি হতে হবে কার্যসম্পাদন।

বেতন গবেষণা ইউনিট

৩.৬৪ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বেতন গবেষণা ইউনিটটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বেতন পর্যায়ের পদ্ধতিগত ও ব্যাপক পর্যালোচনা করবে এবং সরকারী মজুরী ও বেতনকে বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিকল্প বিশ্লেষণ করবে। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচকের সঙ্গে বেতন

সমন্বয়ের কাজটি এডহক বেতন কমিশনের জন্য ফেলে না রেখে ইউনিটটি নিজেই তা করবে। ইউনিটকে সরকারী খাতের বেতনের বিভিন্ন বিকল্প ও সমন্বয়ের পথ সম্পর্কে সমীক্ষা চালাতে হবে, যে বেতন সরকারের আর্থিক লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং যা যথাশীঘ্র সম্ভব বাজারমুখী বেতন পদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। অবসরজনিত কারণে সাধারণভাবে পদ শূন্য বা বিলুপ্ত হওয়া, সময়ের আগে অবসর গ্রহণ, নিম্ন পর্যায়ে স্বল্পমাত্রার বেতন বৃদ্ধি এবং নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী হ্রাস করে সাশ্রয়কৃত অর্থে উচ্চ পর্যায়ে বড় ধরণের বেতন বৃদ্ধির বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অবসর গ্রহনের বয়সসীমা

৩.৬৫ বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের ৫৭ বছরে চাকরির বয়স উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এ বয়সে বেশির ভাগ সরকারী কর্মচারী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই কর্মক্ষম থাকেন এবং দেশের উন্নয়ন প্রয়াসে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেন। বাংলাদেশে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালও অবসর গ্রহণের বর্তমান বয়সকে ছাড়িয়ে গেছে। বেশিরভাগ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর বা তদুর্ধ। ভারত ও পাকিস্তানের মত প্রতিবেশী দেশগুলোতেও তাই। প্রবেশ পর্যায়ে সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৩০ বছর নির্ধারিত থাকায় সরকারী কর্মচারীদের অনেকে ২৭ বছর চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ করেন। অথচ আগে গড়ে একজন সরকারী কর্মচারী ৩২ বছরের বেশি চাকরি করতেন। এসব কারণে সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বর্তমান বয়স বৃদ্ধি করার স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারের কোনো কোনো পদে ইতোমধ্যেই ৬০ বছর বা তার বেশিতে চাকরির বয়স উত্তীর্ণ হয়। উদাহরণ হিসেবে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, পিএসসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সিএণ্ডএজি'র অবসর গ্রহণের বয়স যথাক্রমে ৬৫, ৬২ ও ৬০ বছর। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ হওয়ায় সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য লোকদের *ডিউটি পোস্ট*-এ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করতে হয়, যা সিভিল সার্ভিসে বিতর্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে। কাজেই ***ডিউটি পোস্ট*-এ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও অবসর গ্রহণের বর্তমান বয়স** পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল

৩.৬৬ বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতি, বেতন, নিয়োগের মতো চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টির বিধান রয়েছে। সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে শুরু করা মামলা নিস্পত্তির তিনটি ধাপ রয়েছে ঃ

ক) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা রুজুকরণ;

খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের; এবং সব শেষে

গ) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের।

৩.৬৭ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়াটি এত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘসূত্রী যে অনেক সরকারী কর্মচারী তাদের চাকরিকালে অভিযোগের কোনো প্রতিকার পাননা, ফলে তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। এ অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে, বিশেষ করে ঢাকায়, একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে।

সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫

৩.৬৮ সকল ক্ষেত্রেই বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়া যেতে পারে এবং সকল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তদন্ত রিপোর্টের কপি প্রদানের বিধান রাখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেসব মামলার রায় সরকারের পক্ষে যায়, সেসব ক্ষেত্রে আপীল আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করেই সে রায়ের উপর কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর যেসব মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যায়, সেসব ক্ষেত্রে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এধরনের দ্বিমুখী নীতি পরিহার করতে হবে এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও বিচারের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে একই ধরনের নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ ট্রাইব্যুনালের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল আদেশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, অথবা আপীল আদালতের রায় না পাওয়া পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশের ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৩.৬৯ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে:

ক. অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১) **কর্মচারীদের শ্রেণী ভিত্তিক পরিচিতির পরিবর্তে গ্রেড ভিত্তিক পরিচিতি ঃ** সুপারিশে কর্মচারীদের পরিচিতি গ্রেড ভিত্তিতে গেজেটেড ও নন-গেজেটেড করার প্রস্তাব করা হয়। এতদসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান এজন্য সংশোধন করতে হবে (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ১৯)।

২) **সরকারী চাকরিতে মেধা কোটা বৃদ্ধিঃ** ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে **মেধা কোটা ১০% বাড়িয়ে শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ করার সুপারিশ করা হয়** (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ২৪)।

খ. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১) **জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে নিয়োগ, পদায়ন (posting) ও পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা।**

২) **জনপ্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে শৃংখলা বলবৎ করতে হবে।**

৩) **সচিবালয়ের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদ সমন্বয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের তিনটি গুচ্ছ গঠন করতে হবে** (সংযুক্তি ৩.১)। এ তিনটি হয়েছ, সাধারণ, অর্থনৈতিক, এবং ভৌত-সামাজিক অবকাঠামো গুচ্ছ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসকল গুচ্ছ এর বাইরে থাকতে পারে।

৪) সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের সমন্বয়ে সচিবালয়-এ *সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (এসএমপি)* গঠন করতে হবে। **উপ-সচিব পদে নিযুক্তি হবে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে** । মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের গুচ্ছের উপ-সচিব পদের জন্য সকল ক্যাডারের সিনিয়র স্কেলভুক্ত এবং ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য হবেন। **এর ফলে সচিবালয়ে সকল ক্যাডারের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নিশ্চিত হবে এবং প্রতিভাবান কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হবে।**

৫) বর্তমানে বিভিন্ন গ্রেডে সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের পদে বহাল থাকবেন। তবে জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণ গুচ্ছে যোগদানের জন্য তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারবেন। কোন গুচ্ছের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কার্যসম্পাদন বিবেচনা করে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের তিনটি গুচ্ছের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে এসএসবি একটি পর্যালোচনা চালাবে। তবে এসএমপি-তে অন্তর্ভূক্তির জন্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের পূর্বে সকল ক্যাডার কর্মকর্তা তাদের গুচ্ছে যোগদানের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে *অপশন* (option) প্রদান করবেন। এ ধরনের *অপশন* একবার প্রদান করা হলে তা প্রত্যাহার করা যাবে না এবং এসএমপি-তে অন্তর্ভূক্তির জন্য কোন কমকর্তা যোগ্য বিবেচিত হলে তিনি স্ব ক্যাডার পদের *লিয়েন* হারাবেন। **জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা এবং সকল সহায়ক কর্মচারী গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আবর্তিত হবেন।** গুচ্ছভুক্ত কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের মোট পদের ১০% বিশেষ প্রয়োজনে অন্য গুচ্ছভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বদলীর মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

৬) **সরকার, সচিব পর্যায়ের পদে ১৫% এবং উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদসমূহে ১০% হারে পার্শ্বিক প্রবেশের (lateral entry) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।** উল্লেখিত পদসহ, সকল কর্পোরেশন প্রধানের পদ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, ইত্যাদির প্রধানের পদসমূহ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূরণ করা যাবে। এসকল পদ লাভের জন্য পূরণযোগ্য পদের দু'ধাপ নীচের স্কেল পর্যন্ত কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী খাতের নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যোগ্য হবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব; পিএসসি'র চেয়ারম্যান; সিএণ্ডএজি; সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; এবং বেসরকারী খাত হতে মনোনীত একজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি এসব পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করবে। কমিটিতে কারিগরি বা পেশাভিত্তিক পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য বিশেষজ্ঞ সদস্য *কো-অপ্ট* করা যেতে পারে।

৭) বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে কর্মজীবনে উন্নতি নিয়ে পার্থক্য ও বিরোধ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সকল ক্যাডার সার্ভিসের জন্য পদোন্নতির সুষম সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। উপযুক্ত পদাধিকারীদের জন্য শূন্য পদ পাওয়া না গেলে এসএমপি'র মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮) কোন পদে নিয়োগের মেয়াদ স্বাভাবিক অবস্থায় ৩ থেকে ৫ বছর হতে পারে।

৯) কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দানের ক্ষেত্রে প্রধান দিকনির্দেশক নীতি হবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ভিত্তিতে মূল্যায়নকৃত মেধা, দক্ষতা, চারিত্রিক সততা, প্রশিক্ষণ ও চাকরির রেকর্ড। এলক্ষ্যে প্রচলিত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ফর্ম সংশোধন করা যেতে পারে।

১০) মহিলাদের কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত আবাসন, পরিবহন, দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র ও পৃথক প্রক্ষালনকক্ষসহ কর্মজীবী মহিলাদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১১) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা যেতে পারে এবং সরকারের *ডিউটি পোষ্ট*-এ কোনো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যাবে না।

১২) পরীক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) গঠন করা যেতে পারে – একটি সাধারণ সার্ভিসের জন্য, অপরটি কারিগরি সার্ভিসের জন্য এবং তৃতীয়টি শিক্ষা সার্ভিসের জন্য (সংযুক্তি–৩.৩)। সম্ভব হলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পিএসসিগুলোর চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারন ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় পিএসসি রিপোর্ট ১৯৯৮ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় মতামতসহ সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করতে পারে।

১৩) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সনের জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ সমীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে।

১৪) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ও প্রধানগণকে কাজের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট পদের কাজের বিবরণের ভিত্তিতে সরকারের ভেতর বা বাইরে থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৫) প্রশাসনের পরিবর্তনশীল নানা কৌশল ও প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ চাকরির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। সহায়ক কর্মচারীদের পরিবর্তিত প্রযুক্তির আলোকে *কম্পিউটার লিটারেসী* ও দক্ষতায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এধরনের প্রশিক্ষণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও বিশেষভাবে প্রণীত হতে হবে।

১৬) দ্রুত বিভাগীয় মামলার নিস্পত্তির মাধ্যমে সরকারী চাকরিজীবীদের প্রতিকার প্রদানের লক্ষ্যে, বিশেষ করে ঢাকায় একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে।

১৭) সময়ে সময়ে এডহক ভিত্তিতে বেতন সংশোধন করার পরিবর্তে ৩.৬৩ অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী **সরকারকে একটি প্রাগ্রসর ইতিবাচক বেতন নীতি** (forward-looking positive pay policy) গ্রহণ করতে হবে। **মুদ্রাস্ফীতির কারণে যাতে মজুরি ও বেতন সংকুচিত না হয়ে পড়ে, সেজন্য মজুরি ও বেতনের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচককে** (সিএলআই) **সম্পর্কিত করতে হবে**। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচকের সঙ্গে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি বেতন গবেষনা/সমন্বয় সেল গঠন করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১) পশ্চাৎপদ এলাকা ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সকল **নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে কোটা পদ্ধতি বিলুপ্ত করতে হবে।**

২) চাকরির প্রারম্ভিক বেতনে ভিন্নতা প্রদান এবং বেতন বৃদ্ধিকে কার্যসম্পাদনের মানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার লক্ষ্যে *পাইলট ভিত্তিতে ব্রড ব্যান্ড বেতন* (broad band salary) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রস্তাবিত গুচ্ছ

১. **সাধারণ গুচ্ছ:** রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; সংসদ সচিবালয়; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; তথ্য মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২. **অর্থনৈতিক গুচ্ছ:** অর্থ বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; পরিকল্পনা বিভাগ; পরিসংখ্যান বিভাগ; বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; পাট মন্ত্রণালয়; এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয়।

৩. **ভৌত-সামাজিক অধিকাঠামো গুচ্ছ:** গৃহায়ণ ও পূর্ত মন্ত্রণালয়; যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়; সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপরোক্ত গুচ্ছগুলোর বাইরে থাকতে পারে।

সারণি ৩.১

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণীওয়ারি সংখ্যা।

শ্রেণী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ		অধিদপ্তর/পরিদপ্তর		স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশন		মোট	
	১৯৯৬	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯১
প্রথম শ্রেণী	২২৭	১৬৪	৩৯৬৮	২৯২৫	২৫২৩	১৯৭৭	৬৭১৮	৫০৬৬
দ্বিতীয় শ্রেণী	১২	৬	১১০০	১০৭২	১৯৩৫	১৪০৮	৩০৪৭	২৪৮৬
তৃতীয় শ্রেণী	৪২৫	৩৪৫	৬৬১১৩	৫০৬০৫	৬১৮৭	৭১১০	৭২৭২৫	৫৮০৬০
চতুর্থ শ্রেণী	২২৮	১৯৯	১১০২৩	৮৭৪৬	২৭৭৮	৩৪৮০	১৪০২৯	১২৪২৫
মোট	৮৯২	৭১৪	৮২২০৪	৬৩৩৪৮	১৩৪২৩	১৩৯৭৫	৯৬৫১৯	১৮৪৮২

সূত্র: পরিসংখ্যান ও গবেষণা সেল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ১৯৯৬।

সারণি ৩.২

১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তুলনায় মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারীদের শ্রেণীওয়ারি সংখ্যা ও শতকরা হার।

সংস্থা	কর্মচারীর সংখ্যা														
	মো	ম	%	প্রথম শ্রেণী			দ্বিতীয় শ্রেণী			তৃতীয় শ্রেণী			চতুর্থ শ্রেণী		
				মো	ম	%	মো	ম	%	মো	ম	%	মো	ম	%
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	৮৬৯৩	৮৯২	১০	২০৭০	২২৭	১১	৬৮	১২	১৯	৪০৯৯	৪২৫	১০	২৪৫৬	২২৮	৯
অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর	৬৪৯৫৯৬	৮০৭৫১	১২	৩৭৭৯২	৩৮৫২	১০	১৪৩৭০	১১০০	৮	৪৭৬০৭০	৬৫৫১৪	১৪	১২১৩৬৪	১০২৮৫	৮
স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা	২৭১৯০৪	১৩৪২৩	৫	৪৩৫০৪	২৫২৩	৬	২৩৬১১	১৯৩৫	৮	১১৬৬০১	৬১৮৭	৫	৮৮১৮৮	২৭৭৮	৩
মো.	৯৩০১৯৩	৯৫০৬৬	১০	৮৩৩৬৬	৬৬০২	৮	৩৮০৪৯	৩১০৩	৮	৫৯৬৭৭০	৭২১২৬	১২	২১২০০৮	১৩২৯১	৬
বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসকের দপ্তর	৩৫০৮৮	১৪৫৩	৪	২০৫৭	১১৬	৬	৮৬	০	০	১৪৮০৬	৫৯৯	৪	১৮১৩৯	৭৩৮	৪

সূত্র: পরিসংখ্যান ও গবেষণা সেল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ১৯৯৬।

মো = মোট, ম = মহিলা

সারণি ৩.৩

১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, সমাজ সেবা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ব্যতীত অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তুলনায় মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণীওয়ারি সংখ্যা ও শতকরা হার।

সংস্থা	কর্মচারীর সংখ্যা														
	মোট	মহিলা	%	১ম শ্রেণী			২য় শ্রেণী			৩য় শ্রেণী			৪র্থ শ্রেণী		
				মোট	মহিলা	%	মোট	মহিলা	%	মোট	মহিলা	%	মোট	মহিলা	%
ক. বিভাগ পরিদপ্তর	৬৪৯৫৯৬	৮০৭৫১	১২	৩৭৭৯২	৩৮৫২	১০	১৪৩৭০	১১০০	৮	৪৭৬০৭০	৬৫৫১৪	১৪	১২১৩৬৪	১০২৮৫	৮
ক. উপ মোট	৬৪৯৫৯৬	৮০৭৫১	১২	৩৭৭৯২	৩৮৫২	১০	১৪৩৭০	১১০০	৮	৪৭৬০৭০	৬৫৫১৪	১৪	১২১৩৬৪	১০২৮৫	৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিদপ্তর/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর সংখ্যার বিপরীতে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা															
স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ	৮২৪২৭	১৮৫৯০	২৩	৯৫৭৭	১৬৪৪		৯৯৮	৪১৫		৪৭৬১৭	১০৪২৯		২৪২৩৫	৬১০২	
প্রাথমিক শিক্ষা	১৬৪৭২২	৪৩৩২২	২৬	৫২৬	৪৪		১৬০৫	৯৬		১৬১৩২৪	৪৩০২৮		১২৬৭	১৫৪	
খ উপ মোট	২৪৭১৪৯	৬১৯১২		১০১০৩	১৬৮৮		২৬০৩	৫১১		২০৮৯৪১	৫৩৪৫৭		২৫৫০২	৬২৫৬	
ক - খ	৪০২৪৪৭	১৮৮৩৯	৫	২৭৬৮৯	২১৬৪	৮	১১৭৬৭	৫৮৯	৫	২৬৭১২৯	১২০৫৭	৫	৯৫৮৬০	৪০২৯	৪
শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক পরিদপ্তর/ অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর বিপরীতে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা															
শিক্ষা	৩০৭১২	৬১৮১													
সঃ সেবা	৬৪৭৬	১৮৯০													
মহিলা/শিশু	৯২৮	৪৭৩													
গ উপ মোট	৩৮১১৬	৮৫৪৪													
(খ + গ)	২৮৫২৬৫	৭০৪৬৬													
ক- (খ + গ)	৩৬৪৩৩১	১০২৯৫	২.৮												

সূত্র ঃ পরিসংখ্যান ও গবেষণা সেল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারের সিভিল কর্মকর্তা ও রুর্মচারীর পরিসংখ্যান, ১৯৯৬

তিনটি আলাদা সরকারী কর্মকমিশনের কার্যাবলি ও এখতিয়ার নিম্নরূপ হতে পারে

১. বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (সাধারণ)

প্রশাসন, আনসার, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, সমবায়, কাষ্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, নির্বাচন, অর্থনৈতিক, নির্বাচন, খাদ্য, বীজ ও সার, পররাষ্ট্র, বন, সরকারী ক্রয়, ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল ফাইনান্স, তথ্য (সাধারণ), বীমা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও *মনিটরিং*, আমদানি ও রপ্তানি, পাট, বিচার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, অধিগ্রহণ ও ভূমি রাজস্ব, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, সংসদ বিষয়ক, পরিকল্পনা, পুলিশ, ডাক, প্রেস ও প্রকাশনা, রেলওয়ে (বাণিজ্যিক), ধর্ম, সমাজ কল্যাণ, পরিসংখ্যান, কর ও বাণিজ্য, বস্ত্র, পরিবহণ, মহিলা ও শিশু, এবং যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল গ্রেড ১১ (দ্বিতীয় শ্রেণী ও তদুর্ধ) ও তদুর্ধ পর্যায়ের পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ। গ্রেড ১১ ও তদুর্ধ পর্যায়ের অন্য কোনো বিভাগের সাধারণ প্রকৃতির পদ (যা উপরে উল্লেখিত হয়নি) এ কমিশনের এখতিয়ারে পড়বে।

২. বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (কারিগরি)

কৃষি, স্থাপত্য, ক্যামেরা ও ফিল্ম, কম্পিউটার শিক্ষা/বিজ্ঞান, ড্রয়িং, ড্রাফ্‌টিং ও ম্যাপিং, পরিবেশ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, সেচ, গবেষণাগার, কারিগরি শিক্ষা, মৎস্য ও পশু সম্পদ, সাধারণ ও নিরাপত্তামূলক মুদ্রণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, আবহাওয়াগত/ভূতত্ত্ব কাজ, মাইক্রোওয়েভ ও টেলিযোগাযোগ, খনিজ ও খনন, গণযোগাযোগ, গণস্বাস্থ্য প্রকৌশল. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল, গণপূর্ত, রেডিও, রেলওয়ে প্রকৌশল ও পরিবহন, গবেষণা, সড়ক ও জনপথ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নৌ-পরিবহণ, জরিপ ও সেটেলমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকের পদ, টেলিভিশন, বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সকল গ্রেড ১১ (দ্বিতীয় শ্রেণী ও তদুর্ধ) ও তদুর্ধ পর্যায়ের কারিগরি পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ। গ্রেড ১১ ও তদুর্ধ পর্যায়ের অন্য কোনো বিভাগের কারিগরি পদ (যা উপরে উল্লেখিত হয়নি) এ কমিশনের এখতিয়ারে পড়বে।

৩. বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (শিক্ষা)

সাধারণ শিক্ষা, সরকারী কলেজ/স্কুল, গণগ্রন্থাগার, প্রাথমিক/মাধ্যমিক/গণশিক্ষা, এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (অ-কারিগরি)-এর গ্রেড ১১ (দ্বিতীয় শ্রেণী ও তদুর্ধ) এবং তদুর্ধে পর্যায়ের সকল শিক্ষকের পদগুলোতে নিয়োগ। গ্রেড ১১ ও তদুর্ধ পর্যায়ের অন্য কোনো বিভাগের শিক্ষক পদ (যা উপরে উল্লেখিত হয়নি) এ কমিশনের এখতিয়ারে পড়বে।

কাঠামো

প্রতিটি কমিশনে একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন সদস্য ও একজন সচিব থাকবেন।

অন্যান্য কাজ

প্রতিটি কমিশন তার এখতিয়ারের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) আইনে বর্ণিত অন্যসব দায়িত্ব পালন করবে।

অধ্যায় ৪

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ

৪.০১ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জনপ্রশাসনে নীতির ক্ষেত্রে "নিয়ামক কার্যকলাপ" (regulatory activities) থেকে "উন্নয়ন কার্যক্রম" মুখী উত্তরণ ঘটেছে। এ কারণে জনপ্রশাসন ক্রমশ প্রতিষ্ঠান ও জনবলের দিক দিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এ সম্প্রসারণ যথাযথভাবে পরিকল্পিত বা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রশাসন এখন অতিকায় আকার নিয়েছে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থা/দপ্তর এর অনেকগুলোতেই কাজের পুনরাবৃত্তি এবং এক কাজের ভিতর অন্য কাজের বিস্তৃতি ঘটার মত পরিচালন সমস্যার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে। অন্যদিকে, দক্ষতার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বেশ লক্ষ্যণীয় ব্যবধানও রয়েছে। এর ফলে অদক্ষতা, নিম্নমানের কাজ ও দুর্বল সেবা প্রদানের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

৪.০২ বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৬টি মন্ত্রণালয় ও ১৭টি বিভাগ[১], ২৫৪টি অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর, এবং ১৭৩টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন রয়েছে (বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ওএন্ডএম উইং, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭)। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো সমষ্টিগতভাবে সচিবালয় নামে পরিচিত। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই; যেটুকু আছে তা হল, মন্ত্রণালয় এক বা একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত হতে পারে যার প্রধান হলেন একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী। কাঠামোগতভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য অধিদপ্তর, বিভিন্ন উপ-বিভাগ (wing), ব্রাঞ্চ (branch) ও শাখা (section) -এ বিভক্ত। অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলো মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন, কারিগরি তথ্য সংরক্ষণ, এবং কারিগরি বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করে। পরিদপ্তরের তুলনায় অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত একটি বড় ইউনিট। অধিদপ্তরের প্রধান একজন মহাপরিচালক এবং পরিদপ্তরের প্রধান পরিচালক। অধস্তন কোনো দপ্তর/অফিস হচ্ছে কোনো অধিদপ্তরের একটি আঞ্চলিক ইউনিট এবং তা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। সরকারী কর্পোরেশন/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলো বিশেষ কোন সরকারী কাজ কিংবা সুনির্দিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আইনের দ্বারা গঠিত।

৪.০৩ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এখনও চারটি শ্রেণীভুক্ত (অর্থাৎ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ)। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজ করেন এবং এদের মধ্যে ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত -- উভয় ধরণের কর্মকর্তা রয়েছেন। ক্যাডার কর্মকর্তাদেরকে ২৯টি ক্যাডারে সংগঠিত করা হয়েছে।

৪.০৪ সরকারী সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস দু'টি ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির (এআরসি) রিপোর্ট। উল্লিখিত দু'টি সূত্রের কোনটিতেই সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সংযুক্তি ৪.১-এ মোট মঞ্জুরিকৃত পদ সম্পর্কে এ দুটি উৎসের মধ্যে তারতম্য দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, (*ওএন্ডএম উইং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬*) -এর উল্লেখ করে খান, (১৯৯৯)[২] দেখিয়েছেন যে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে সকল বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (১ম-৪র্থ শ্রেণী) মঞ্জুরিকৃত পদসমূহের মোট সংখ্যা ৭৩০১১৭। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি) ২৩১টি সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা দেখিয়েছে ৫৯৯৬৫৭। এরূপ দু'টি উৎসে সংগৃহীত তথ্যের পার্থক্য ১৩০৪৬০। দু'টি কারণে এটি হতে পারে: (ক) এআরসি ১২টি সংস্থা থেকে তথ্য না পাওয়ায় তার প্রতিবেদনেদেখাতে পারেনি, ও (খ) পুলিশ বিভাগ (পুলিশের অনুমিত সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ) তার জনবলের মোট সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য কমিটিকে জানায়নি (চৌধুরী ১৯৯৯)। অবশ্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি) তার পর্যালোচনা ও সুপারিশে এআরসির প্রতিবেদনের ৪২ খন্ডে প্রদত্ত সংখ্যা ব্যবহার করেছে। পিএআরসি উল্লিখিত ২৩১টি সংস্থার জনবল সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করে এবং

---

[১] সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পত্র নং মপবি-১৯/৪/৯৮-বিধি/১৯, তারিখ ১২ই মার্চ ২০০০।

[২] সূত্র : মার্চ, ১৯৯৯-এ পিএআরসি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে এম এম খান কর্তৃক উপস্থাপিত "*Reorganisation of Government Offices and Autonomous Bodies for Decentralisation in Bangladesh*" বিষয়ক প্রবন্ধ।

৬৬টি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক প্রোফাইল হালনাগাদ করেছে। (তৃতীয় খণ্ডে পরিশিষ্ট ৬ -এ আলাদা করে দেখানো হয়েছে)।

৪.০৫ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের মধ্যে এআরসি যে ৫৯৯৬৫৭ জনবল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ৩৩৬৯৯ জন প্রথম শ্রেণী, ১৫৩২৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ৪৩৫২৯১ জন ৩য় শ্রেণী (বিভিন্ন সহায়ক শ্রেণীর কর্মচারী) এবং ১১৫৩৪৪ জন চতুর্থ শ্রেণীতে কর্মরত (এআরসি ১৯৯৬)।

প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল সম্পর্কিত সমস্যা

৪.০৬ পাকিস্তান আমলের সরকারী ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে দু'টি পৃথক প্রশাসনিক বিন্যাস ছিল - একটি কেন্দ্রের ও অন্যটি প্রদেশগুলোর জন্য। স্বাধীনতার পর ফেডারেল ব্যবস্থার অধীন দু'টি স্বতন্ত্র সিভিল সার্ভিস কাঠামোকে ইউনিটারি সরকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুনর্গঠিত করতে হয়। প্রশাসন পুনর্গঠনের এ প্রক্রিয়ায় সতর্ক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার অভাব ছিল। তড়িগড়ি করে দু'টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের কাঠামোকে এক করে ফেলা হয়। কাজেই কোনো পদ্ধতিসম্মত পুনর্গঠন না হওয়ার কারণে কাজের পুনরাবৃত্তি এবং এক কাজের ভিতর অন্য কাজের বিস্তৃতি ঘটেছে।

৪.০৭ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে দেশ এক মজার *পেন্ডুলাম খেলা* (penduiam-swing)দেখেছে। কখনও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, কখনও কমেছে। সারণি ৪.১ -এ দেখা যাবে, ১৯৭২ থেকে ২০০০ সময়কালে মন্ত্রণালয়সমূহের সংখ্যা বদলেছে দশবার। রাজনৈতিক মিত্রদের মধ্যে দপ্তর বিলির জন্য মাঝে মাঝে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, আবার কখনও কখনও রাজনৈতিক কৌশলের কারণে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমেছে। সতর্ক পরীক্ষায় দেখা যায়, মন্ত্রণালয়সমুহের পুনর্গঠনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে (যেমন, যে সব মন্ত্রণালয় পরস্পরের সম্পূরক হতে পারে, তেমন মন্ত্রণালয়গুলো একীভূত করা)।

সারণি ৪.১

মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা (১৯৭২-২০০০)

বছর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	মন্তব্য
১৯৭২	২১	
১৯৭৫	২৬	
১৯৭৫	১৩	৪র্থ সংশোধনীর পর
১৯৭৭	৩৩	
১৯৭৮	২৪	
১৯৮০	৩০	
১৯৮২	১৯	সামরিক আইন জারীর পর
১৯৯১	৩৩	গণতান্ত্রিক শাসন ও সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের পর
১৯৯৫	৩৫	
২০০০	৩৬	

সূত্র: *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস - রিফর্মিং দি পাবলিক সেক্টর*, বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং মপবি-১৯/৪/৯৮/বিধি/১৯, তারিখ ১২ মার্চ ২০০০।

৪.০৮ অন্যান্য সরকারী সংস্থার মধ্যে বিশেষ করে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অফিসের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এ রকম বহু সংস্থাকে প্রকল্প (উন্নয়ন খাতে) থেকে রূপান্তরিত করে স্থায়ী কাঠামোর আকারে (রাজস্ব খাতে) গড়ে তোলা হয়। এ ধরণের রূপান্তর ও রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের আগে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

জনবল

৪.০৯ অন্য প্রায় সকল প্রশাসনিক সমস্যাবলীর মতো জনবল নিয়ে যে সঙ্কট চলছে, তাও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া। ঔপনিবেশিক সরকারের বৈশিষ্ট ছিল, বহুসংখ্যক কেরাণী এবং তকমা আঁটা উর্দিগায়ে আর্দালি ও পিওন নিয়োগ দান করা, যাদের কাজ ছিল মনিবের পদবির তকমা বুকে চওড়া রঙিন ফিতায় ও

টুপিতে লাগিয়ে রাখা। এর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল নথিপত্র ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণের পুরোটা বা প্রায় সকল কাজ কেরানীদের দিয়ে করিয়ে নেয়া। তাতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত বা মতামত লিখে দিলেই চলত। আর আর্দালিরা ছিল সুবিধাজনক নির্দেশক, ব্যাখ্যাকারী এবং কর্তৃত্বের প্রতীক। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তবুও ব্রিটিশ রাজ তাদের কর্মচারী বিন্যাসের যে ধাঁচটি তৈরি করে যায় তা আজও কোনো না কোনোভাবে বহাল রয়েছে। কর্মকর্তা অনুপাতে কর্মচারীর সংখ্যা বাস্তবিকপক্ষে খুবই বেশি। *৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার অনুপাত ১:১৬ (এআরসি)*।

৪.১০ ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বড়ো ও মাঝারি ধরণের বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলোকে রাষ্ট্র অনুসৃত সমাজতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী জাতীয়করণ করা হয়। ফলে, নতুন নতুন সংস্থার সৃষ্টি হয় (যেমন, বিভিন্ন কর্পোরেশন ও অধিদপ্তর) এবং জাতীয়করণকৃত সংস্থা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী জনবল নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছেন, কেননা সরকার মুক্তবাজার নীতির অনুসরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করছেন।

৪.১১ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণেও জনবল বৃদ্ধি ঘটেছে। কেননা, এর ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এমন সব বিষয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে যেগুলোর নিষ্পত্তি নিম্নতর স্তরেই বরং ভালোভাবে হতে পারতো। আসলে এ অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দায়ী মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বশীলতা-নীতির ভ্রান্ত প্রয়োগ। জানা যায়, একজন মন্ত্রী সবচেয়ে নিচু স্তরের কর্মচারীদের বদলির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ধরণের বদলি মাঠ পর্যায়ে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের বদলীর আদেশ পাওয়ার জন্য মন্ত্রীর অফিসে পৌছাতে বহু পথ ও অফিস ঘুরতে হয়েছে। এ ধরণের সামান্য কাজ সারতে অনেক জরুরী কাজ ফেলে রাখতে হয়। ক্ষমতার এ ধরণের বিকৃত প্রয়োগ একটি সরকারী সংস্থার জন্য অতীব দুর্ভাগ্যজনক। এরকম কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি লোক লেগে যায় (চৌধুরী, ১৯৯৯)[৩]।

সংস্কার প্রয়াস

৪.১২ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ও কাঠামোতে সংস্কার সাধনের জন্য অতীতে কয়েক দফা প্রয়াস গৃহীত হলেও একটি সাধারণ ত্রুটি, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর (১৯৪৭ থেকে এযাবৎ) গৃহীত সংস্কারের সকল প্রচেষ্টাতেই লক্ষ্য করা যায়। এ ত্রুটিটি হল, জনপ্রশাসনকে একটা খণ্ডিত ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করা এবং মূল প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত বিষয়গুলো বিবেচনা না করা (খান ১৯৯৮)[৪]। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭ - ১৯৭১) গৃহীত সংস্কার উদ্যোগগুলো জনকেন্দ্রীক (people-centered) উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল ও জনমুখী (people-oriented) সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে না পারায় ইতিবাচক ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বিভিন্ন সরকার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কাঠামো ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের বিভিন্ন পদক্ষেপ সুপারিশ করার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। **পরপর বিভিন্ন সরকার এ ধরণের মোট ১৬ টি কমিটি ও কমিশন গঠন করেন**। তবে এসব কমিটি ও কমিশনের প্রায় সবগুলোই সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি ও বিভিন্ন সার্ভিসের বিন্যাস ও কাঠামো নিয়েই কাজ করেছে (খান ১৯৯৮)।

৪.১৩ কিছুদিন আগ পর্যন্তও সরকারের আকারকে সুশাসন ও কার্যকর সরকারী ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বড় বাধা হিসেবে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। ১৯৮২ সনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি সামরিক আইন কমিটি গঠিত হয়। কমিটি প্রধান ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানের নামানুসারে এ কমিটি 'এনাম কমিটি' নামে পরিচিতি লাভ করে, এবং কমিটি ১৯৮৩ তে তার প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে। পরবর্তীকালে, ১৯৯৩ সনে এম নুরু-উন নবী চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি) প্রতিষ্ঠান ও জনবল কাঠামোর ব্যাপক পর্যালোচনা করে। এ কমিটি সাড়ে তিন বছরেরও বেশি (১৯৯৩-৯৬) সময়ে প্রতিবেদন তৈরি করে এবং সরকারী কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশাসনিক সংস্কারের প্রথম পদ্ধতিসম্মত অনুশীলন করে। বিশ্বব্যাংক, *গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস* শিরোনামে ১৯৯৬-তে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। উক্ত রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক নিম্নমানের কার্যসম্পাদনকারী বেশ কয়েকটি সংস্থার উপর সমীক্ষা চালায় এবং বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় বড় আকারের প্রশাসনের কুফল সম্পর্কে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করে (বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬)।

---

[৩] সূত্র : মার্চ, ১৯৯৯-এ পিএআরসি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে এম এন চৌধুরী কর্তৃক উপস্থাপিত *"Public Administration in Bangladesh: Institutional Reorganisation and Manpower Rationalisation"* বিষয়ক প্রবন্ধ।

[৪] সূত্র : এম এম খান, *Administrative Reforms in Bangladesh*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৮।

৪.১৪ বাংলাদেশ সরকারের জনবলের আয়তনকে যুক্তিসম্মত করার জন্য এ তিনটি কার্যকর প্রতিবেদনে সরকারের বর্তমান কাঠামো ও আকার সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রচুর তথ্য ও মন্তব্য রয়েছে। এআরসি প্রতিবেদনে ২৩১টি সংস্থার জনবলের আকার সম্পর্কে সন্নিবেশিত তথ্য কমিশনের পর্যালোচনা কাজে সহায়ক হয়েছে।

৪.১৫ এআরসি তার কার্যপরিধির আলোকে সকল সরকারী অফিসের ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনাধীন প্রতিটি সংস্থা থেকে একটি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে প্রয়োজন পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ চালানো হয়। প্রতিটি সংস্থার জন্য খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, যাতে সংস্থার কর্তৃত্ব নির্দেশ (lines of authority), সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নির্দেশ শৃঙ্খল (optimal chain of command) ও সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের কার্যাবলীসহ একটি সাংগঠনিক ছক সংযুক্ত করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনগুলো নিয়ে বহুক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয় ও অনুমোদনের জন্য শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটির কাছে পেশ করা হয়। এ প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল, একটি পুনঃসংজ্ঞায়িত, যৌক্তিকীকৃত, আধুনিক, দক্ষ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী সরকার নিশ্চিত করা (এআরসি ১৯৯৬)।

বর্তমান সংস্কারের প্রেক্ষাপট এবং পিএআরসি'র উদ্যোগ

৪.১৬ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কুশলতা এবং জনসেবা দানে দক্ষতা বৃদ্ধিই সংস্কার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহের ভিত্তি। সংস্কারের মূল এলাকা হ'ল সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি) সরকারের এ সংস্কার উদ্যোগে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কমিশনের কাজ শুরুহয় ১৯৯৭ সনে।

৪.১৭ পিএআরসি'র নয়টি প্রদত্ত দায়িত্বের অন্যতম হল, সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর-পরিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোর জনবলের যৌক্তিকীকরণ। সময়ের অভাবে স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর বিষয় প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। কমিশন আরও মনে করে যে, সরকারের বেসরকারীকরণ নীতি বিভিন্ন সরকারী কর্পোরেশন/সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর জনবল যৌক্তিকীকরণের বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে। সরকার যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলো বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিচ্ছেন, সেহেতু এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর জনবল নির্ধারণ বাস্তবসম্মত হবে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার ধীরগতি এবং পিএআরসি'র মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে ২১টি কর্পোরেশনের জনবল সুষমকরণের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশিষ্ট ১৫২টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জনবল সুষমকরণের বিষয়টি সরকার চাইলে পরবর্তীতে হাতে নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারের জনবল পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে সুবিধা হতে পারে।

৪.১৮ কমিশন শুরুতে জনপ্রশাসন সংস্কারের উপর ইতিপূর্বে পরিচালিত বিভিন্ন সমীক্ষাসমূহ যেমন, *পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফিসিয়েন্সী স্টাডি* ১৯৮৯, *পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর স্টাডি* ১৯৯৩, *টুওয়ার্ডস বেটার গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ* ১৯৯৩, *গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস* ১৯৯৬ এবং প্রশাসনিক পুনর্বিণ্যাস কমিটি প্রতিবেদন ১৯৯৬ – যাচাই-বাছাই করে সেগুলো থেকে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো শনাক্ত করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের জনবল কাঠামোতে বাস্তবায়নযোগ্য পরিবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য উল্লিখিত প্রতিবেদনগুলো পরীক্ষা ও সমীক্ষা করা। পিএআরসি আরও উপলব্ধি করে যে, এর দুই বছরের মেয়াদকালে পর্যালোচনা ও সুপারিশের জন্য কেবল এআরসি'র ৪২ খণ্ডের প্রতিবেদনেরই কার্যকর ব্যবহার সম্ভব।

৪.১৯ পিএআরসি ২২৪টি সরকারী সংস্থার পুনর্গঠন ও সেগুলোর জনবল কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে এআরসি'র বিভিন্ন সুপারিশের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে। দেখা গেছে, এআরসি সুনির্দিষ্টভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের দু'টি বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করে : (ক) সংস্থাসমূহের পুনর্গঠন (যেমন, একীভূতকরণ, বিলুপ্তি), ও (খ) জনবল যৌক্তিকীকরণ (অর্থাৎ, সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ)।

৪.২০ এ সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে এআরসি দু'টি নির্ণায়ক অবলম্বন করে:

(ক) একীভূতকরণ, বিলুপ্তি কিংবা নতুন সংস্থা/ইউনিট গঠনের সম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্য এআরসি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো যে প্রেক্ষাপটে কাজ করছে, তা মূল্যায়ন করে।

(খ) কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেট ও কর্মসম্পাদন সাফল্যের মধ্যকার ব্যবধানটিও নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে এর সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করার প্রয়াস নেয়। লক্ষ্য ও সম্পাদিত কাজের মধ্যকার ব্যবধান যেখানে খুব বেশি বলে মনে হয়েছে, সেখানে এআরসি অপ্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত জনবল কমিয়ে ফেলার সুপারিশ করেছে।

৪.২১ পিএআরসি সরকারী ব্যবস্থাপনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার আলোকে এআরসি'র সুপারিশগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। পরামর্শ ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রতিবেদন প্রণয়নে এআরসির অবদান স্বীকার করে স্থানীয় ও বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ও সরকারী সংস্থাগুলোকে একুশ শতকের যে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার আলোকে কমিশন এআরসি'র সুপারিশগুলোর পরীক্ষা করেছে।

৪.২২ এআরসি অনুসৃত মূল্যায়নের দু'টি পদ্ধতি ছাড়াও, পিএআরসি এ সম্পূরক কাজটি সম্পাদনে আরও দু'টি নির্ণায়ক প্রয়োগ করেছে :

(ক) পিএআরসি সংস্থার লক্ষ্য ও মানব দক্ষতার মধ্যকার ব্যবধানটি শনাক্ত করেছে। কোনো কোনো সংস্থা অন্য কিছু সংস্থার তুলনায় কেন ভালো কাজ করছে তা বিশ্লেষণ করতে সহায়তার জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পিএআরসি মনে করে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নতুন মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে এ ব্যবধান বিশ্লেষণ পিএআরসিকে সহায়তা করেছে; এবং

(খ) পিএআরসি আরও লক্ষ্য করেছে যে, কোনো কোনো সংস্থার সম্পাদিত যা কিছু কাজ সাধারণত অপচয়মূলক, সেগুলো চুক্তিভিত্তিতে সংস্থার বাইরে করানো সম্ভব। কোনো কোনো সংস্থার জন্য এ চুক্তিভিত্তিক কাজ দেয়ার ব্যবস্থাটি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ কয়েকটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্থার ভিতরে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন

৪.২৩ এআরসি ১৯৯৬ -এর জুনে প্রেরণপত্রসহ (letter of transmittal) ৪২ খণ্ডের প্রতিবেদন দাখিল করে। এতে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৫ থেকে কমিয়ে ২২ করার সুপারিশ করা হয়। কমিটি ২৬৭টি সরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে, যার মধ্যে ২৫৭টি সংস্থা প্রেরিত প্রশ্নমালার জবাব পাঠায়। এসব জবাব পরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর কমিটি ৭টি সংস্থা বিলোপের সুপারিশ করে। কমিটি একাধিক সংস্থার একীভূত ও পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশও করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে সংস্থার সংখ্যা আরো ৪৩টি কমে যাবে। পরিশেষে কমিটি ১৭টি নতুন সংস্থা সৃষ্টিরও প্রস্তাব করে। এআরসির সুপারিশকৃত সংস্থার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৪ (২৫৭-৭-৪৩+১৭) এ।

৪.২৪ মন্ত্রণালয়গুলোর পুনর্গঠন/পুনর্বিন্যাসের কাজটি ব্যাপক, নিবিড় ও সময়সাপেক্ষ – এ কথা স্বীকার করে পিএআরসি মনে করে যে, কতিপয় বিভাগ একীভূতকরণ ও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৬ থেকে কমিয়ে ২৫ -এ নির্ধারন করার অবকাশ রয়েছে (সংযুক্তি ৪.২)। কারণ, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হ্রাসকরণ এখন একটি বিশ্বজোড়া রীতি। ২০০১-২০০৩ সনের মধ্যে জাপান মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ২৩ থেকে ১৩-তে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ) হ্রাস করবে। উগাণ্ডার মতো একটি উন্নয়নশীল দেশও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমানোর একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে (মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৮ থেকে ১৭-তে কমিয়ে আনা হবে)। কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, সরকার মন্ত্রণালয়ের আয়তন কমানোর জন্য চারটি বিষয় বিবেচনা করতে পারেন ঃ (ক) ব্যয় হ্রাস; (খ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে কাজের পুনরাবৃত্তি পরিহার; (গ) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলোকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান; এবং (ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া।

৪.২৫ পিএআরসি এর অভিমত হচ্ছে ছয়টি সংস্থা যথা ঃ (১) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (বেনবেইস); (২) সরবরাহ ও পরিদর্শন পরিদপ্তর; (৩) বস্ত্র পরিদপ্তর; (৪) ঢাকা মশক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; (৫) কৃষি বিপণন ও শ্রেণী নির্ধারণ পরিদপ্তর ও (৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন অভিযোগ পরিদপ্তর বিলুপ্ত করতে হবে। পিএআরসি আরও মনে করে যে, ২টি নতুন সংস্থা যথা ঃ (১)সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়; এবং (২) ন্যায়পালের দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা: একটি মৌলিক পরিবর্তন

৪.২৬ পিএআরসি পরিকল্পনা কমিশন (পিসি) পুনর্গঠন সংক্রান্ত এআরসি'র প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় দেখেছে যে, সংস্থাটি তিনটি প্রধান কাজ করে থাকে। প্রথমত, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রণয়নের জন্য প্রত্যেক বছর যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয় তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ের লক্ষ্যে সরকারের মূল দলিল হিসাবে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন। পিসি'র দ্বিতীয় প্রধান কাজ এডিপি প্রস্তুত করা এবং অন্য একটি প্রধান কাজ হয়েছে, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনইসি)'র অনুমোদনের জন্য প্রকল্পসমূহের প্রক্রিয়াকরণ। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজের পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ পিসি'র মাধ্যমে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। তবে, বর্তমান সময়ের উন্নয়ন প্রয়াস ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠন করা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা সেলগুলোকে যথাযথ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

জনবল যৌক্তিকীকরণ

৪.২৭ জনবলের প্রশ্নে পিএআরসি পর্যালোচনাধীন ২৩১টি সরকারী সংস্থার মধ্যে ১৮১টির ক্ষেত্রে এআরসির সুপারিশের সঙ্গে একমত। তবে কমিশন অবশিষ্ট ৫০টি সংস্থার প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করেছে। প্রায় সকল সংস্থার বেলায় মঞ্জুরিকৃত ও বিদ্যমান পদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় ব্যবধান রয়েছে। ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি অধিকাংশ সংস্থায় মঞ্জুরিকৃত পদসমূহের প্রস্তাব করে। কাজেই সংস্থাসমূহের কার্যসম্পাদন ও মানব দক্ষতার চলমান পরিস্থিতির নিরিখে বর্তমান জনবল অধিকতর অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি সংস্থার আকার যথাযথ করার ক্ষেত্রে মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যার ভিত্তিতে বিবেচনায় উদ্বৃত্ত জনবল কী হবে তা ঘোষণা করতে হবে।

বিদ্যমান ও সুপারিশকৃত জনবলের পার্থক্য

৪.২৮ বিদ্যমান কর্মরত জনবলের ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায় যে, এআরসি'র সুপারিশকৃত উদ্বৃত্ত জনবল ১৯৮৫৩। এআরসি ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে যথাক্রমে ৩৫৮৬ ও ২৫৭৪টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেছে। পক্ষান্তরে, উক্ত কমিটি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট জনবল থেকে যথাক্রমে ১০৭৩৬ ও ১৫২৭৭টি পদ কমানোর সুপারিশ করায় এ ক্ষেত্রে নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৯৮৫৩। পিএআরসি'র পর্যালোচনায় উদ্বৃত্ত আরও কিছু বেড়ে হয় ২৫৯০৬। তবে পিএআরসি ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে যথাক্রমে ১৭৫৯ ও ২৩০৯ টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করছে। এআরসি'র মতো পিএআরসিও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে যথাক্রমে ১৩১৭৬ ও ১৬৭৯৮ উদ্বৃত্ত জনবল হিসাব করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পদে এআরসি ও পিএআরসি'র সুপারিশের তুলনামূলক অবস্থা সারণি ৪.২ ও ৪.৩ -এ দেখা যেতে পারে।

সারণি- ৪.২

জনবলের উপর এআরসি'র সুপারিশ

সংস্থার শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১৮১টি সংস্থার বিষয়ে পিএআরসি ও এআরসি একমত পোষন করে	+২২৮৮	+১০৫১	-৩৭২২	-১৪৬২০	-১৫০০৩
৫০টি সংস্থার বিষয়ে পিএআরসি এআরসি'র সঙ্গে দ্বিমত পোষন করে	+১২৯৮	+১৫২৩	-৭০১৪	-৬৫৭	-৪৮৫০
মোট (২৩১টি সংস্থা)	+৩৫৮৬	+২৫৭৪	-১০৭৩৬	-১৫২৭৭	-১৯৮৫৩

সারণি- ৪.৩

জনবলের উপর পিএআরসি'র সুপারিশ

সংস্থার শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১৮১টি সংস্থার বিষয়ে পিএআরসি ও এআরসি একমত পোষন করে	+২২৮৮	+১০৫১	-৩৭২২	-১৪৬২০	-১৫০০৩
৫০টি সংস্থার বিষয়ে পিএআরসি এআরসি'র সঙ্গে দ্বিমত পোষন করে	-৫২৯	+১২৫৮	-৯৪৫৪	-২১৭৮	-১০৯০৩
মোট (২৩১টি সংস্থা)	+১৭৫৯	+২৩০৯	-১৩১৭৬	১৬৭৯৮	-২৫৯০৬

মঞ্জুরিকৃত ও সুপারিশকৃত জনবলের পার্থক্য

৪.২৯ সারণি ৪.৪-এ দেখা যায় যে, এআরসি মঞ্জুরিকৃত জনবলের মধ্যে মোট ১১৬১৭০টি পদ (১৭.১৬%) উদ্বৃত্ত করার সুপারিশ করেছে। কিন্তু পিএআরসি'র সুপারিশে আরও ৬০৫৩টি অতিরিক্ত পদ উদ্বৃত্ত হিসাবে যোগ হয়েছে (মোট উদ্বৃত্ত ১২২২২৩, যা মঞ্জুরিকৃত জনবলের ১৮.০৫%)।

সারণি- ৪.৪

মঞ্জুরিকৃত, বর্তমান ও সুপারিশকৃত জনবলের সারসংক্ষেপ

সংস্কার কমিটি/কমিশন	মঞ্জুরিকৃত পদ**	বর্তমান পদ	সুপারিশকৃত পদ	মঞ্জুরির বিপরীতে উদ্বৃত্ত	বর্তমান পদের বিপরীতে উদ্বৃত্ত পদ
এআরসি	৬৭৬৯৯৯	৫৮০৬৮২	৫৬০৮২৯	১১৬১৭০ (১৭.১৬%)	১৯৮৫৩ (৩.৪২%)
পিএআরসি	৬৭৬,৯৯৯	৫৮০৬৮২	৫৫৪৭৭৬	১২২২২৩ (১৮.০৫%)	২৫৯০৬ (৪.৪৬%)

**মোট মঞ্জুরিকৃত পদ এআরসি'র ৪২ খন্ডে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে গননাকৃত।

৪.৩০ ২৩১টি সংস্থার প্রতিটির ক্ষেত্রে এআরসি ও পিএআরসি'র সুপারিশের প্রভাব সম্বলিত প্রস্তাবিত জনবলের একটি সারসংক্ষেপ সংযুক্তি ৪.৩ক ও ৪.৩খ-এ দেয়া হয়েছে। এ দুটো সংক্ষিপ্ত সারণিতে ১৮১টি ও ৫০টি সংস্থার বর্তমান জনবল থেকে পরিবর্তনগুলো আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত ২৩১টি সংস্থার প্রতিটির ক্ষেত্রে এআরসি ও পিএআরসি'র সুপারিশের প্রভাব দেখিয়ে একটি মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সারসংক্ষেপ তৃতীয় খন্ডে পরিশিষ্ট -৭এ রক্ষিত আছে। প্রস্তাবিত কয়েকটি বিভাগের একীভূতকরণ ও মন্ত্রণালয়সমূহের সংখ্যা ৩৬ থেকে ২৫এ হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনায় পিএআরসি কয়েকটি বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের নতুন নামকরণ প্রস্তাব করেছে।

বেসরকারী খাতে চুক্তিভিত্তিক কাজ দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প

৪.৩১ উদ্বৃত্ত জনবলের ক্ষেত্রে এআরসি ও পিএআরসি-র পার্থক্য প্রধানত এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, **বর্তমান কমিশন দক্ষতা, ব্যয় সাশ্রয়, জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবাদানের স্বার্থে বেশ কিছু সংখ্যক পদ ও কাজ চুক্তির ভিত্তিতে সম্পাদনের সুপারিশ করেছে**। বিভিন্ন সংস্থার বর্তমান জনবল কয়েকটি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদনে সক্ষম নয়, এসব কাজের জন্য বেসরকারী খাত থেকে দক্ষ জনবল ভাড়া করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ এরকম চুক্তিতে ছেড়ে দেয়া যায়, সে সব প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে সংযুক্তি ৪.৪-এ দেয়া হয়েছে।

জনবল যৌক্তিকীকরণের ফলে আর্থিক সংশ্লেষ

৪.৩২ সুপারিশকৃত জনবল সুষমকরণের ফলে বার্ষিক মোট ৭৫,৩০,৭৯,২০০/- টাকা সাশ্রয় হতে পারে (সারণি-৪.৪)। ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে বাড়তি জনবলের জন্য বেতন ও ভাতা খাতে অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হলেও উদ্বৃত্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী খাতে অনুমিত সাশ্রয়ের আলোকে নিট ৭৫ কোটি টাকা বাঁচবে।

সারণি-৪.৫

প্রাক্কলিত আর্থিক সাশ্রয় (টাকায়)

শ্রেণী	পদের সংখ্যা	পদ প্রতি গড় মাসিক বেতন ও ভাতা	সকল পদের গড় মাসিক বেতন ও ভাতা	সকল পদের বেতন-ভাতা থেকে বার্ষিক সাশ্রয়
১ম	+১৭৫৯	১০,৬০০	+১,৮৬,৪৫,৪০০	+২২,৩৭,৪৪,৮০০
২য়	+২৩০৯	৬,৮০০	+১,৫৭,০১,২০০	+১৮,৮৪,১৪,৪০০
৩য়	-১৩১৭৬	৩,৮০০	-৫,০০,৬৮,৮০০	-৬০,০৮,২৫,৬০০
৪র্থ	-১৬৭৯৮	২,৮০০	-৪,৭০,৩৪,৪০০	-৫৬,৪৪,১২,৮০০
মোট	-২৫৯০৬	২৪,০০০	-৬,২৭,৫৬,৬০০	-৭৫,৩০,৭৯,২০০

নোটঃ ১৯৯৭ সনের বেতন স্কেলের ভিত্তিতে প্রতিটি শ্রেণীর গড় বেতন ধরা হয়েছে।

৪.৩৩ কমিশন সরকারী সংস্থাগুলোর পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে এবং নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে:

ক. অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১) কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ৩ – 'প্রেরণামূলক সুবিধাদিসহ আগাম অবসরগ্রহণ' -এর আওতায় সরকারী কর্মচারীদের ২৫ বছরের পরিবর্তে ২০ বছরের চাকরি পূর্ণ করার পর পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য চাকরির মেয়াদ ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুযোগ রাখা যায়; সে ক্ষেত্রে তারা তাদের অবসরভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধার ৬৪% পাবেন।

২) *রাজস্ব বাজেটে বর্তমান জনবলের বৃদ্ধি রোধঃ* এবিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, কমিশনের মেয়াদকালে কিছু অত্যাবশ্যক ও কারিগরি পদ ব্যতিরেকে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কোনো শুন্য পদ পূরণ কিংবা কোনো নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে না। আর কোনো পদ এক বছর বা বেশি সময় শুন্য থাকলে সেই পদ বিলুপ্ত করা উচিৎ (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং- ৬)।

৩) কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ ১৭ -তে কোনো কোনো অধিদপ্তর/দপ্তর বিলুপ্ত ও একীভূত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যা এআরসি'র মতো পূর্ববর্তী কমিশন/কমিটিগুলোও দিয়েছে। এ কমিশন বিভিন্ন অধিদপ্তর বিলুপ্ত ও একীভূত করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করেছে এবং নিম্নবর্ণিত ৪ টি অধিদপ্তর/পরিদপ্তর বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে, যেহেতু এদের কাজ অন্যান্য অধিদপ্তরে স্থানান্তরিত হয়েছেঃ (ক) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (বেনবেইস); (খ) সরবরাহ ও পরিদর্শন পরিদপ্তর; (গ) বস্ত্র পরিদপ্তর ও (ঘ) ঢাকা মশক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সুপারিশে আটটি অধিদপ্তর/পরিদপ্তরকে একীভূত করে ৪টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ (ক) প্যাটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ককে, কপিরাইট অধিদপ্তর-এর সঙ্গে; (খ) জ্বালানী পরিবীক্ষণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রকে, বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক অধিদপ্তর-এর সঙ্গে; (গ) কর কমিশনার, কর (গোয়েন্দা ও তদন্ত) অধিদপ্তরকে, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর-এর সঙ্গে; এবং (ঘ) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র আর্কাইভস্‌কে, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা পরিদপ্তর-এর সঙ্গে।

খ. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১) চারটি বিভাগ একীভূতকরে মন্ত্রণালয়গুলোর সংখ্যা ২৫ এ নির্ধারণ করা যেতে পারে (সংযুক্তি ৪.২)।

২) অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ১৭ এ উল্লেখিত চারটির অতিরিক্ত আরও দুইটি সংস্থা যথাঃ (১) কৃষি বিপণন ও শ্রেণী নির্ধারণ পরিদপ্তর; ও (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন অভিযোগ পরিদপ্তর বিলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

৩) ২টি নতুন অফিস স্থাপন করা যেতে পারে। সেগুলো হল ঃ (১) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়; এবং (২) ন্যায়পালের দপ্তর।

৪) ২৩১টি সরকারী অফিসের মধ্যে ১৮১টির বিষয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি যে সুপারিশ করেছে তার কোন পরিবর্তন হবে না (সংযুক্তি ৪.৩ক)। অবশিষ্ট ৫০টি অফিসের জনবল সুষমকরণের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে (সংযুক্তি ৪.৩খ)। সরকার ২৩১টি সরকারী অফিসের জনবল যৌক্তিকীকরণের ভিত্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক প্রোফাইলগুলো (খন্ড-৩, পরিশিষ্ট-৬) কাজে লাগাতে পারেন।

৫) বর্তমান পরিকল্পনা কমিশনকে পুনর্গঠিত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর পরিকল্পনা সেলগুলোকে যথাযথ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

৬) কমিশন ৪০৬৮ (+১৭৫৯ এবং +২৩০৯ যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণী)টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির এবং ২৯৯৭৪ (-১৩১৭৬ এবং -১৬৭৯৮ যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) জনবল হ্রাসের মাধ্যমে বিদ্যমান জনবলের ২৫৯০৬টি পদ (৪.৪৬%) উদ্বৃত্ত করার সুপারিশ করছে। এর ফলে বৎসরে ৭৫ কোটি টাকারও বেশী সাশ্রয় হবে। তবে মঞ্জুরিকৃত জনবলের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত হিসাব করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১২২২২৩ (১৮.০৫%)। কমিশন কোন কর্মরত কর্মচারীর ছাটাই সুপারিশ করে না। সরকারের উচিত হবে শূণ্যপদগুলো উদ্বৃত্ত জনবল দিয়ে পূরণ করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় রি-ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত সংস্থায় নিয়োগ দেয়া।

৭) কমিশন ২৮টি সংস্থার কোন কোন চিহ্নিত কার্যকলাপ চুক্তিভিত্তিতে ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করছে (সংযুক্তি ৪.৪ দ্রষ্টব্য)। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, মন্ত্রণালয় ও সরকারী সংস্থাসমূহকে কয়েক ধরণের কাজ যেমন, টাইপিং, বার্তা বহন, চা তৈরি, অফিসঘর ঝাড়ু দেয়া ও টয়লেট পরিষ্কার, ইত্যাদির মতো কাজগুলিকে চুক্তির আওতায় ছেড়ে দেয়ার সম্ভাব্যতা চিহ্নিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

সিভিল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণীভিত্তিক জনবল
(দুই উৎসের মধ্যে তুলনা)

শ্রেণী	সূত্র ঃ খান (১৯৯৯)বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মচারীদের পরিসংখ্যান (ওএন্ডএম উইং, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬)									সূত্র : এআরসি (১৯৯৬)	দুই উৎসের মধ্যে ব্যবধান (মঞ্জুরিকৃত পদে)
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ			অধিদপ্তর/পরিদপ্তর			মোট			মঞ্জুরিকৃত*	
	মঞ্জুরিকৃত	বর্তমান	পার্থক্য	মঞ্জুরিকৃত	বর্তমান	পার্থক্য	মঞ্জুরিকৃত	বর্তমান	পার্থক্য		
১.	২৫৩৩	২০৭০	-২৬৩	৪৫৬২৭	৩৭৭৯২	৭৮৩৫	৪৭৯৬০	৩৯৮৬২	-৮০৯৮	৩৩৬৯৯	-১৪২৬১
২.	১০৮	৬১	-৪০	১৭৮৫২	১৪৩৭০	৩৪৮২	১৭৯৬০	১৪৪৩৮	-৩৫২২	১৫৩২৩	-২৬৩৭
৩.	৪৭৬৭	৪০৯৯	-৬৬৮	৫১৬৮০৯	৪৭৬০৭০	৪০৭৩৯	৫২১৫৭৬	৪৮০১৬৯	-৪১৪০২	৪৩৫২৯১	-৮৬২৮৫
৪.	২৮১৯	২৪৫৬	-৩৬৩	১৩৯৮০২	১২১৩৬৪	১৮৪৩৮	১৪২৬২১	১২৩৮২০	-৫৬০৬৮	১১৫৩৪৪	-২৭২৭৭
মোট	১০০২৭	৮৬৯৩	-১৩৩৪	৭২০০৯০	৬৪৯৫৯৬	৭০৪৯৪	৭৩০১১৭	৬৫৮২৮৯	-৭১৮২৮	৫৯৯৬৫৭	-১৩০৪৬০

• ২৩০টি সংস্থার মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর সরকারী অফিস/সংস্থা অন্তর্ভুক্ত

মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হ্রাস বিষয়ক পিএআরসি'র প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পিএআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ (একত্রীকরণের পর)
	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় • জন বিভাগ • আপন বিভাগ	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় • জন বিভাগ • আপন বিভাগ
	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় • সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১)	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
২)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একীভূত হবে)
৩)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫)	অর্থ মন্ত্রণালয় ৫.১ অর্থ বিভাগ ৫.২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৫.৩ অভ্যন্তরিন সম্পদ বিভাগ	৫) অর্থ মন্ত্রণালয় ৫.১ অর্থ বিভাগ ৫.২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৫.৩ অভ্যন্তরিন সম্পদ বিভাগ
৬)	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৬.১ পরিকল্পনা কমিশন ৬.২ পরিকল্পনা বিভাগ ৬.৩ পরিসংখ্যান বিভাগ ৬.৪ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৬) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৬.১ পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান বিভাগ ৬.২ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান বিভাগ একীভূত হবে)
৭)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭) আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮)	কৃষি মন্ত্রণালয়	৮) কৃষি ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮.১ কৃষি বিভাগ ৮.২ পশুসম্পদ বিভাগ
৯)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৯) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ৯.১ খাদ্য বিভাগ ৯.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
১০)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	
১১)	ভূমি মন্ত্রণালয়	১০) ভূমি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ১০.১ ভূমি বিভাগ ১০.২ পরিবেশ ও বন বিভাগ
১২)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	
১৩)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১) মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪)	মৎস্য এবং পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	
১৫)	শিল্প মন্ত্রণালয়	১২) শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১২.১ শিল্প, পাট ও বস্ত্র বিভাগ ১২.২ বানিজ্য বিভাগ
১৬)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	
১৭)	পাট মন্ত্রণালয়	
১৮)	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	
১৯)	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পিএআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ (একত্রীকরণের পর)
২০)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪) মহিলা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৪.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ ১৪.২ সমাজ কল্যাণ বিভাগ
২১)	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
২২)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫.১ শিক্ষা বিভাগ ১৫.২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ১৫.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
২৩)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২৪)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৬) যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৫)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২৬)	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২৬.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৬.২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৭) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৭.১ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ একীভূত হতে পারে)
২৭)	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২৭.১ সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ২৭.২ যমুনা সেতু বিভাগ	১৮) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ১৮.১ সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (যমুনা সেতু বিভাগ, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ এর সঙ্গে একীভূত হবে) ১৮.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৮)	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৯) নৌ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৯.১ নৌ-পরিবহন বিভাগ ১৯.২বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিভাগ
২৯)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিভাগ	
৩০)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
৩১)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩২)	তথ্য মন্ত্রণালয়	২১) তথ্য মন্ত্রণালয়
৩৩)	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩৩.১ বিদ্যুৎ বিভাগ ৩৩.২ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২২) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২২.১ বিদ্যুৎ বিভাগ ২২.২ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩৪)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৩) গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৩৫)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৪) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৬)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৩১টি প্রতিষ্ঠানের জনবল যৌক্তিকীকরণ

সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ

[পিএআরসি নিম্নবর্ণিত ১৮১ টি প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশ্নে এআরসি'র সুপারিশের সঙ্গে একমত]

ক্রমিক নং	সংস্থা	মঞ্জুরিকৃত পদ	বর্তমান পদ	এআরসি'র সুপারিশ			পিএআরসি'র সুপারিশ		
				বৃদ্ধি	হ্রাস	বিদ্যমান পদের নীট পরিবর্তন (+)(-)	বৃদ্ধি	হ্রাস	বিদ্যমান পদের নীট পরিবর্তন (+)(-)
১.	সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	৪১৬	৩২৭	০	৩২২	-৩২২	০	৩২২	-৩২২
২.	কৃষিবিপণন ও গ্রেডিং অধিদপ্তর	৫৪	৫৩	০	১৩	-১৩	০	১৩	-১৩
৩.	কয়লা পরিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০
৪.	যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্ম নিবন্ধক	৩৯	৩৭	১৮	০	১৮	১৮	০	১৮
৫.	বীমা অধিদপ্তর	২৩	৩৩	২৭	০	২৭	২৭	০	২৭
৬.	১) প্যাটেন্ট, ডিজাইন, পণ্যপ্রতীক অধিদপ্তর ২) কপিরাইট দপ্তর	৯৭	৯১	০	৩৬	-৩৬	০	৩৬	-৩৬
৭.	ক্রীড়া পরিদপ্তর	২৩৩	২৯৬	১২	০	১২	১২	০	১২
৮.	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর	৮	৮	১৮	০	১৮	১৮	০	১৮
৯.	হজ্জ দপ্তর	১৮	১৭	০	১	-১	০	১	-১
১০.	বিস্ফোরক অধিদপ্তর	৫১	৫০	২০	০	২০	২০	০	২০
১১.	শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত	৯২	১০৫	৮	২৪	-১৬	৮	২৪	-১৬
১২.	পাট অধিদপ্তর	৭৭১	৬৬৫	২৩	২৬৬	-২৪৩	২৩	২৬৬	-২৪৩
১৩.	নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর	৪৬	৩৩	১৫	০	১৫	১৫	০	১৫
১৪.	নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৩	২৩	১	০	১	১	০	১
১৫.	নাবিক ও বহির্গমন কল্যাণ পরিদপ্তর	৪২	৪১	০	১৯	-১৯	০	১৯	-১৯
১৬.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	৩২	৩১	২	১৪	-১২	২	১৪	-১২
১৭.	বাংলাদেশ দূর শিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৬০	৬০	০	১০	-১০	০	১০	-১০
১৮.	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী	১১৯	১১৯	৩৫	০	৩৫	৩৫	০	৩৫
১৯.	হজ্জ উপশাখা, জেদ্দা, সৌদি আরব	৯	৯	০	০	০	০	০	০
২০.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	১৮৬	১৫৯	২৭	৫	২২	২৭	৫	২২
২১.	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস পরিদপ্তর	১২১	১২১	১	৮	-৭	১	৮	-৭
২২.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	২২	২১	৭	০	৭	৭	০	৭
২৩.	দুর্নীতিদমন ব্যুরো	১২৩১	১২৩১	০	০	০	০	০	০
২৪.	অগ্নিনির্বাপন ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর	৩৯২৮	৩৭৪০	৮৯	৪২৪	-৩৩৫	৮৯	৪২৪	-৩৩৫
২৫.	সমবায় অধিদপ্তর	৫৩০৭	৪৪০৮	৫৬২	১০৪৮	-৪৮৬	৫৬২	১০৪৮	-৪৮৬

২৬.	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	৮৯৩	৭২৩	১১৬	০	১১৬	১১৬	০	১১৬
২৭.	ঢাকা মশক নিয়ন্ত্রন সংস্থা	৩৯৬	৩৫৫	০	০	০	০	০	০
২৮.	গৃহপত্তন কমিশনারের কার্যালয়	২২৩	২২৩	০	০	০	০	০	০
২৯.	জাতীয় গণযোগাযোগ ইন্সটিটিউট	১০৭	৭২	০	১৮	-১৮	০	১৮	-১৮
৩০.	বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)	১৪৫৪৬	১৬৮৪০	৩৭৫	২৬৬৯	-২২৯৪	৩৭৫	২৬৬৯	-২২৯৪
৩১.	জাতীয় চক্ষুরোগবিদ্যা ও চিকিৎসা ইন্সটিটিউট	১৬৮	১৬৬	০	৬৫	-৬৫	০	৬৫	-৬৫
৩২.	বহিঃশুল্ক মূল্য বির্ধারণ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর,চট্টগ্রাম	৬৬	৫৮	১৪	৩	১১	১৪	৩	১১
৩৩.	কর অব্যাহতি ও রেয়াত পরিদপ্তর	৪৫	৩৩	২১	০	২১	২১	০	২১
৩৪.	কর কমিশনার(আপিল), কর আপিল অঞ্চল, ঢাকা-১	৭২	৫৬	২	৭	-৫	২	৭	-৫
৩৫.	কর কমিশনার(আপিল), কর আপিল অঞ্চল, ঢাকা-২	৭২	৫০	৭	৬	১	৭	৬	১
৩৬.	কর কমিশনার(আপিল), কর আপিল অঞ্চল, ঢাকা-৩	৭২	৫৯	৩	১১	-৮	৩	১১	-৮
৩৭.	কর কমিশনার(আপিল), কর আপিল অঞ্চল,খুলনা	৭২	৪২	১১	২	৯	১১	২	৯
৩৮.	কর কমিশনার(আপিল), কর আপিল অঞ্চল,চট্টগ্রাম	৭২	৬২	৩	১৪	-১১	৩	১৪	-১১
৩৯.	বেসামরিক হিসাব নিরীক্ষণ অধিদপ্তর	৩১৪	২৫৬	৭৮	০	৭৮	৭৮	০	৭৮
৪০.	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর	৬১৫	৫১২	৩৪	৮০	-৪৬	৩৪	৮০	-৪৬
৪১.	মহা হিসাব রক্ষকের দপ্তর (পূর্ত)	৩৬১	৩২৮	৮	৭৭	-৬৯	৮	৭৭	-৬৯
৪২.	হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর, প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস	১৯০	১৭০	৩০	২	২৮	৩০	২	২৮
৪৩.	বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষণ পরিচালকের কার্যালয়	১০৪৯	৯৮৪	০	৫৩১	-৫৩১	০	৫৩১	-৫৩১
৪৪.	রেলওয়ে হিসাব নিরীক্ষণ পরিচালকের কার্যালয়	২০৯	১৯৩	৪০	০	৪০	৪০	০	৪০
৪৫.	জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ও গবেষণা হাসপাতাল	১৯৪	১৭৫	১৯	০	১৯	১৯	০	১৯
৪৬.	সামরিক কম্যান্ড ও স্টাফ কলেজ	৪৮০	৪৬০	২০	০	২০	২০	০	২০
৪৭.	প্রতিরক্ষা সংগ্রহ মহাপরিলকের দপ্তর	১৪০	১৪০	০	০	০	০	০	০
৪৮.	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়	৬২	০	১	৭	-৬	১	৭	-৬
৪৯.	কর কমিশনার (জরিপ) কার্যালয়	২১৬	১৭১	৭২	১০	৬২	৭২	১০	৬২

৫০.	কর কমিশনার (কর অঞ্চল-খুলনা) কার্যালয়	৩৬৭	৩১৬	৩৭	৬	৩১	৩৭	৬	৩১
৫১.	বহিঃশুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর	২৩৯	২৩৩	১৭	৮	৯	১৭	৮	৯
৫২.	বহিঃশুল্ক কালেক্টর, (কাস্টম হাউস), ঢাকা	৬৩৫	৫৩০	৩৫	৩৬	-১	৩৫	৩৬	-১
৫৩.	বহিঃশুল্ক কালেক্টর, আবগারীও মূসক, যশোর	৬৪০	৫৫১	৯৯	০	৯৯	৯৯	০	৯৯
৫৪.	বহিঃশুল্ক কালেক্টর, আবগারীও মূসক, ঢাকা (উত্তর)	১০১১	৬৫২	৯২	৪	৮৮	৯২	৪	৮৮
৫৫.	বহিঃশুল্ক কালেক্টর, আবগারীও মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ)	১০৭০	৬৫০	৫৩	০	৫৩	৫৩	০	৫৩
৫৬.	কাস্টম পরিদপ্তর	৬৭৩২	৬৭১৩	৩৮২	০	৩৮২	৩৮২	০	৩৮২
৫৭.	কর কমিশনারের কার্যালয় (কর অঞ্চল - ১, চট্টগ্রাম)	৩৬১	৩৩১	১৪	৫৬	-৪২	১৪	৫৬	-৪২
৫৮.	কর কমিশনারের কার্যালয় (কর অঞ্চল - ২, চট্টগ্রাম)	৩৪৫	৩৩৫	৯	২৬	-১৭	৯	২৬	-১৭
৫৯.	কর কমিশনারের কার্যালয় (কর অঞ্চল - ৩, চট্টগ্রাম)	৩৪৬	৩০৩	২৩	৩৩	-১০	২৩	৩৩	-১০
৬০.	বহিঃশুল্ক,আবগারীও মূসক কালেক্টরেট,চট্টগ্রাম	১৩২০	১১৬৯	৩৭	১১০	-৭৩	৩৭	১১০	-৭৩
৬১.	বহিঃশুল্ক,আবগারীও মূসক কালেক্টরেট,খুলনা	৭৯৩	৬৫৩	৭৬	১২	৬৪	৭৬	১২	৬৪
৬২.	বহিঃশুল্ক,আবগারীও মূসক কালেক্টরেট,বগুড়া	৯০৯	৬৪৯	২০৯	১৬	১৯৩	২০৯	১৬	১৯৩
৬৩.	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (নিপোর্ট)	১০১৫	১০১১	৪	০	৪	৪	০	৪
৬৪.	কার্যসম্পাদন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর	২৭২	২৭২	০	০	০	০	০	০
৬৫.	বহিঃশুল্ক কালেক্টরেট (বহিঃশুল্ক ভবন), চট্টগ্রাম	১০২৪	৯৪৪	১০০	২৩	৭৭	১০০	২৩	৭৭
৬৬.	কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল, রাজশাহী	৩৬১	৩৩৭	১৪	৫৯	-৪৫	১৪	৫৯	-৪৫
৬৭.	কর আপিল ট্রাইব্যুনাল	১১১	৬৮	৩৩	০	৩৩	৩৩	০	৩৩
৬৮.	মুখ্য মহানগর হাকিমের কার্যালয়, ঢাকা	৮৫	৬০	২৯	০	২৯	২৯	০	২৯
৬৯.	মুখ্য মহানগর হাকিমের কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৪	৩৪	৫	০	৫	৫	০	৫
৭০.	মুখ্য মহানগর হাকিমের কার্যালয়, খুলনা	২৪	২৪	৬	০	৬	৬	০	৬
৭১.	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	১৬৪	১১৯	১৪	১৪	০	১৪	১৪	০
৭২.	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১৯৭	১৮২	৪১	১৬	২৫	৪১	১৬	২৫

৭৩.	১. কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -১, ঢাকা	৩৫১	৩১৯	৭৯	০	৭৯	৭৯	০	৭৯
	২.কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -২, ঢাকা	৩৫১	৩২৬	৬৯	০	৬৯	৬৯	০	৬৯
	৩.কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -৩, ঢাকা	৩৫১	৩১২	১১৮	০	১১৮	১১৮	০	১১৮
	৪.কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -৪, ঢাকা	৩৫০	৩১৬	৮১	০	৮১	৮১	০	৮১
	৫.কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -৫, ঢাকা	৩৪৬	৩১৩	৭৯	০	৭৯	৭৯	০	৭৯
	৬.কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -৬, ঢাকা	৩৪৬	৩১২	৬৭	০	৬৭	৬৭	০	৬৭
৭৪.	অভিযোগ পরিদপ্তর (তদন্ত)	৩৮	৩৮	০	০	০	০	০	০
৭৫.	জাতীয় রোগ প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা ইন্সটিটিউট (নিপসম)	১৪৯	১৪৪	৪৯	০	৪৯	৪৯	০	৪৯
৭৬.	ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর	২১৪	২১৩	৭৪	০	৭৪	৭৪	০	৭৪
৭৭.	প্রতিরক্ষা অর্থ অধিদপ্তর	১৮৮৬	১৭৭০	২৫২	০	২৫২	২৫২	০	২৫২
৭৮.	কর গোয়েন্দা ও অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিরীক্ষা পরিদপ্তর	১৮৭	১৫৪	০	৮৮	-৮৮	০	৮৮	-৮৮
৭৯.	জাতীয় উৎপাদনশীলতা প্রতিষ্ঠান	৭১	৬১	৮	০	৮	৮	০	৮
৮০.	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	৯৮	৮৫	০	৩	-৩	০	৩	-৩
৮১.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৭৯৩	৬৬২	২৯	৮৮	-৫৯	২৯	৮৮	-৫৯
৮২.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট	৪৬৭	৪৩৭	৮	৪	৪	৮	৪	৪
৮৩.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪৭৩৩	৪৭০৮	১৩২	৭২১	-৫৮৯	১৩২	৭২১	-৫৮৯
৮৪.	নার্সিং সার্ভিসেস পরিদপ্তর	৮১৩	৮১৩	০	০	০	০	০	০
৮৫.	ক. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (কেন্দ্রীয় অফিস)	১৫৮	১৫০	০	২০	-২০	০	২০	-২০
	খ.নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (মাঠ পর্যায়ের অফিস)	৫৪৭	৫১৪	৬৮	০	৬৮	৬৮	০	৬৮
৮৬.	দূতাবাস হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস	৪০	২৬	৫	২	৩	৫	২	৩
৮৭.	ডাক, তার ও টেলিফোন হিসাব মহাপরিচালকের অফিস	২৯৭	২৮৪	৪৯	১৭	৩২	৪৯	১৭	৩২
৮৮.	টার্নওভার কর কমিশন	অপ্রদর্শিত	০	৪৬	০	৪৬	৪৬	০	৪৬
৮৯.	কর মিমাংসা কমিশন	অপ্রদর্শিত	০	৪৩	০	৪৩	৪৩	০	৪৩
৯০.	জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর	৪০৭	৩৬৫	০	৯৩	-৯৩	০	৯৩	-৯৩
৯১.	রাজস্ব ব্যবস্থাপনা একাডেমি,চট্টগ্রাম	১৩৩	৯৮	১৮	২	১৬	১৮	২	১৬

৯২.	গণ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৩৭৬	৩৩৮	৬২	১	৬১	৬২	১	৬১
৯৩.	আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৮৫	৮৫	০	০	০	০	০	০
৯৪.	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৮	২৮	২৪	০	২৪	২৪	০	২৪
৯৫.	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৩৬	৩৫	২৮	০	২৮	২৮	০	২৮
৯৬.	বহিঃশুল্ক, আবগারী ও মূসক আপিল ট্রাইব্যুনাল	অপ্রদর্শিত	০	৩২	০	৩২	৩২	০	৩২
৯৭.	হিসাব নিয়ন্ত্রক (ভূমি) অফিস	২৫৫	২৩৩	১	৩০	-২৯	১	৩০	-২৯
৯৮.	সরকারী আবাসন পরিদপ্তর	৪৬৩	৪০৩	১৮	১৯১	-১৭৩	১৮	১৯১	-১৭৩
৯৯.	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৩৮১	৩২৯	৩	৬১	-৫৮	৩	৬১	-৫৮
১০০.	বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	৩২৪	৩২৪	১০৭	০	১০৭	১০৭	০	১০৭
১০১.	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	১০৫৯	৮৫৭	১৬৯	১	১৬৮	১৬৯	১	১৬৮
১০২.	ভূমি প্রশাসন বোর্ড	১৩৩	১৩০	০	২৫	-২৫	০	২৫	-২৫
১০৩.	বস্ত্র অধিদপ্তর	৪৩৮	৪৩৮	০	০	০	০	০	০
১০৪.	জেলা গেজেটিয়ার অফিস	৩১	৩০	১০	০	১০	১০	০	১০
১০৫.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৭২৪৫৯	১৬১৬৯৭	৩৩৯১৯	০	৩৩৯১৯	৩৩৯১৯	০	৩৩৯১৯
১০৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	৫০	৫০	৩	৪	-১	৩	৪	-১
১০৭.	অভ্যন্তরিণ হিসার নিরীক্ষা পরিদপ্তর	৬০	৬০	০	০	০	০	০	০
১০৮.	বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	৪০৬	৩৫০	১২০	০	১২০	১২০	০	১২০
১০৯.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	২০৪	১৯৫	৬	০	৬	৬	০	৬
১১০.	মহাপরিচালক, সামরিক স্বাস্থ্য সার্ভিস	৫৯৪	৫৯৪	০	০	০	০	০	০
১১১.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট	৮৪১	৬৮১	০	৪০৩	-৪০৩	০	৪০৩	-৪০৩
১১২.	সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	১৫৯	১৪৭	৩	০	৩	৩	০	৩
১১৩.	কৃষি বিপণন পরিদপ্তর	৪৭৮	৪৩৭	০	৭৪	-৭৪	০	৭৪	-৭৪
১১৪.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর	৫৯৪৯	৪৫৩৪	২৬৭০	৭	২৬৬৩	২৬৭০	৭	২৬৬৩
১১৫.	এটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ-এর অফিস	১০৬	৯৯	২২	০	২২	২২	০	২২
১১৬.	নিবন্ধন পরিদপ্তর	২৮২৯	২৬৪৭	৬০৫	০	৬০৫	৬০৫	০	৬০৫
১১৭.	কোষ্ট গার্ড অধিদপ্তর	৫৮	৫৮	০	০	০	০	০	০
১১৮.	সরকারী রেল পরিদর্শকের অফিস	৯	৯	২	০	২	২	০	২
১১৯.	হোটেল নিবন্ধন পরিদপ্তর	৬	৬	১১	০	১১	১১	০	১১
১২০.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৫৮	১৫২	৫	১	৪	৫	১	৪
১২১.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৪১	১৪১	০	৮	-৮	০	৮	-৮
১২২.	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৩	৭৩	০	২	-২	০	২	-২
১২৩.	মৎস্য ও পশুসম্পদ মনত্রণালয়	১০১	১০১	০	৬	-৬	০	৬	-৬
১২৪.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৬৩	৬৩	২১	০	২১	২১	০	২১
১২৫.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২৭৪	২৭৪	০	১৩৩	-১৩৩	০	১৩৩	-১৩৩

১২৬.	ক. ডাক অধিদপ্তর	১৬৯১৩	১৬৬০৬	১৮৫	২০০	-১৫	১৮৫	২০০	-১৫
	খ. ডাক জীবন বীমা, ডাক একাডেমী ও ডাক ছাপাখানা মহাপচিালকের অফিস	১১৬০	৯৮০	৪৯	০	৪৯	৪৯	০	৪৯
	গ.ডাক মহাপরিচালকের অফিস, ঢাকা	৫১৪০	৫০৭২	২৬	২৭৫	-২৪৯	২৬	২৭৫	-২৪৯
	ঘ.ডাক মহাপরিচালকের অফিস, চট্টগ্রাম	৪২৩৮	৪৩১৯	২৮	২৬৩	-২৩৫	২৮	২৬৩	-২৩৫
	ঙ.ডাক মহাপরিচালকের অফিস, রাজশাহী	২৫৩১	২৬১০	১০১	২৯	৭২	১০১	২৯	৭২
	চ.ডাক মহাপরিচালকের অফিস, খুলনা	৩৮৪৪	৩৬২৩	৩৫০	০	৩৫০	৩৫০	০	৩৫০
১২৭.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	১২২	১০৭	০	৬১	-৬১	০	৬১	-৬১
১২৮.	নৌ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৫১	২৫১	০	১০৬	-১০৬	০	১০৬	-১০৬
১২৯.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০৫	অপ্রদর্শিত	০	১৫৪	-১৫৪	০	১৫৪	-১৫৪
১৩০.	অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ)	৫৬০	অপ্রদর্শিত	০	২৫১	-২৫১	০	২৫১	-২৫১
১৩১.	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৬৪	১৬২	০	২৩	-২৩	০	২৩	-২৩
১৩২.	সরকারী পরিবহন পরিদপ্তর	১৭৭৮	১৬৪৯	০	১০১০	-১০১০	০	১০১০	-১০১০
১৩৩.	পাট ও বস্ত্র বিভাগ	১৭৩	১৭৩	০	৭০	-৭০	০	৭০	-৭০
১৩৪.	জাতীয় হৃদ রোগ ও বক্ষ ব্যাধি ইন্সটিটিউট	৪৩৩	৩৯৬	২২	২৫	-৩	২২	২৫	-৩
১৩৫.	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মনত্রণালয়	১৩৯	১০২	১৭	১৯	-২	১৭	১৯	-২
১৩৬.	অভ্যন্তরিণ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৮	৩৬	০	১	-১	০	১	-১
১৩৭.	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৪১৬	৪১৪	৩	৪৮	-৪৫	৩	৪৮	-৪৫
১৩৮.	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেল	১৫৩	১৪০	৪৮	৭	৪১	৪৮	৭	৪১
১৩৯.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৪৯০৪২	৪৯০৪২	০	১৯৫১৮	-১৯৫১৮	০	১৯৫১৮	-১৯৫১৮
১৪০.	পঙ্গু হাসপাতাল	৪৮৯	৪৬৪	৬৯	৩৪	৩৫	৬৯	৩৪	৩৫
১৪১.	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	২৬১৩	২৩৪৮	৫১২	১৯৩	৩১৯	৫১২	১৯৩	৩১৯
	* সমন্বিত আনসার	২৪৬৫৬	২৪৬৫৬	০	৫২৮৮	-৫২৮৮	০	৫২৮৮	-৫২৮৮
১৪২.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	২০৪	১৯২	৮৪	৪১	৪৩	৮৪	৪১	৪৩
১৪৩.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৪৩৫	৪৩৫	১	১১৪	-১১৩	১	১১৪	-১১৩
১৪৪.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৪১৫	৩৬৭	২৫	৪৬	-২১	২৫	৪৬	-২১
১৪৫.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৬৩	২৬৩	০	৯২	-৯২	০	৯২	-৯২
১৪৬.	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় (বিপিএসসি)	২৯৪	২৯০	৬৮	০	৬৮	৬৮	০	৬৮
১৪৭.	বাংলাদেশ বেতার	২৬২৫	২২১৬	২৫	৬৩১	-৬০৬	২৫	৬৩১	-৬০৬
১৪৮.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৪৯৯৪	৫১১১৩	৫৩৭	১৪৪১৮	-১৩৮৮১	৫৩৭	১৪৪১৮	-১৩৮৮১
১৪৯.	জন ও আপন বিভাগ	২৮৬	অপ্রদর্শিত	০	৩১	-৩১	০	৩১	-৩১

১৫০.	শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়	২৯৮	২৯৮	০	৭৮	-৭৮	০	৭৮	-৭৮
১৫১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫৪	২৫২	০	২৯	-২৯	০	২৯	-২৯
১৫২.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	১৩১	১৩১	৬	১৮	-১২	৬	১৮	-১২
১৫৩.	গণপূর্ত মনত্রণালয়	১১১	১০৬	১	১২	-১১	১	১২	-১১
১৫৪.	সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়	০	০	৩৭	০	৩৭	৩৭	০	৩৭
১৫৫.	প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল	৯	১৬	১	০	১	১	০	১
১৫৬.	মুদ্রণ, লেখসামগ্রী ও ফরম অধিদপ্তর	২৩৪৫	১৯৭৮	৬	২৭৯	-২৭৩	৬	২৭৯	-২৭৩
১৫৭.	ক. মেডিক্যাল শিক্ষা অধিদপ্তর	০	০	১১৬	০	১১৬	১১৬	০	১১৬
	খ.ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ	অপ্রদর্শিত	৩৪৮	৭৫	৪	৭১	৭৫	৪	৭১
	গ.ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	অপ্রদর্শিত	১৫৩৮	৩০	৫২৫	-৪৯৫	৩০	৫২৫	-৪৯৫
	ঘ.সাতটি মেডিক্যাল কলেজ (সলিমুল্লাহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল)	অপ্রদর্শিত	১৭৬৮	৩০৬	০	৩০৬	৩০৬	০	৩০৬
	ঙ.সাতটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (সলিমুল্লাহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল)	অপ্রদর্শিত	৫৬১৬	৪৪৬	০	৪৪৬	৪৪৬	০	৪৪৬
১৫৮.	নিবন্ধকের দপ্তর	১১৭২	১০০১	১৬৯	১	১৬৮	১৬৯	১	১৬৮
১৫৯.	জজশীপ	৬৭৮২	৬৬৩০	০	২৪৪৭	-২৪৪৭	০	২৪৪৭	-২৪৪৭
১৬০.	বন্যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৩৯৫	৩৩৯	০	৮৩	-৮৩	০	৮৩	-৮৩
১৬১.	মহিলা, পরিবার ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৯৭	অপ্রদর্শিত	২	৬০	-৫৮	২	৬০	-৫৮
১৬২.	রেল বিভাগ	৪৫০০০	০	০	০	০	০	০	০
১৬৩.	জাতীয় শিক্ষা বোর্ড	১২০৩	১২০৩	০	৪৭২	-৪৭২	০	৪৭২	-৪৭২
১৬৪.	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৪২	৪২	০	৪২	-৪২	০	৪২	-৪২
১৬৫.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	৩৭৮৩	৩৫৬৪	১৪৭	১৩৫	১২	১৪৭	১৩৫	১২
১৬৬.	ক.সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয় স্থাপনা)	৬১২	৬১২	০	২৭৬	-২৭৬	০	২৭৬	-২৭৬
	খ.সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর (মাঠ পর্যায়ের অফিস)	৪৮৮৩	৪৮৮৩	০	৬৫৬	-৬৫৬	০	৬৫৬	-৬৫৬
১৬৭.	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	৪৯৮০	৪৯৮০	০	৫৩৬	-৫৩৬	০	৫৩৬	-৫৩৬
১৬৮.	বাংলাদেশ রাইফেলস	৩০১৭৯	৩০১৭৯	০	১৬৯৭	-১৬৯৭	০	১৬৯৭	-১৬৯৭
১৬৯.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫০	১৪৬	০	২১	-২১	০	২১	-২১
১৭০.	বাংলাদেশ টেলিভিশন	১৫২০	১২৬৩	৮৬	৩২৫	-২৩৯	৮৬	৩২৫	-২৩৯
১৭১.	ন্যায়পালের অফিস	০	০	১৬৯	০	১৬৯	১৬৯	০	১৬৯
১৭২.	সংস্থাপন মনত্রণালয়	৪৪৮	৪০৮	০	১১৬	-১১৬	০	১১৬	-১১৬

১৭৩.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	৫১০	৫১০	১৬	১৩৪	-১১৮	১৬	১৩৪	-১১৮
১৭৪.	ক. ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় (৭ বিশেষ জেলা)	১৯১১	অপ্রদর্শিত	০	২৪৫	-২৪৫	০	২৪৫	-২৪৫
	খ.ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় (১৫ জেলা)	৪০৯৫	অপ্রদর্শিত	০	৬৪৫	-৬৪৫	০	৬৪৫	-৬৪৫
	গ.ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় (৭ ২৮ জেলা)	৪৮১৬	অপ্রদর্শিত	০	৪৭৬	-৪৭৬	০	৪৭৬	-৪৭৬
	ঘ. ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় (১৪ বিশেষ জেলা)	১৬৮০	অপ্রদর্শিত	০	৫৬	-৫৬	০	৫৬	-৫৬
১৭৫.	জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা	৬৪৭	৫৯০	০	২৪১	-২৪১	০	২৪১	-২৪১
১৭৬.	ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৭৭	২৬৫	৫	২৮	-২৩	৫	২৮	-২৩
১৭৭.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯৫৪৮	৯৫৪৮	১০৪৩	১৯৪১	-৮৯৮	১০৪৩	১৯৪১	-৮৯৮
১৭৮.	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	৪৪৩	৪৪৩	০	২৩৬	-২৩৬	০	২৩৬	-২৩৬
১৭৯.	আইন মন্ত্রণালয়	২৪৯	২১৬	০	৮৭	-৮৭	০	৮৭	-৮৭
১৮০.	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	১৮৮৫	১৬২২	১৫৭	১১	১৪৬	১৫৭	১১	১৪৬
১৮১.	ক) প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস	৪১১	৪০০	১২	১৪৪	-১৩২	১২	১৪৪	-১৩২
	খ) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ১৪টি আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ অফিস	০	০	১৪০০	০	১৪০০	১৪০০	০	১৪০০
	গ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পিএসসি)	৮৩	৭৮	৩	০	৩	৩	০	৩
	ঘ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)	১০৪	১০১	৫	০	৫	৫	০	৫
	ঙ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়)	১১৯	১১২	০	৫২	-৫২	০	৫২	-৫২
	চ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	১১৪	১১০	৪	২	২	৪	২	২
	ছ) উপ-প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়)	৯০	৮৩	২	৯	-৭	২	৯	-৭
	জ) অতিরিক্ত প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	৮৪৬	৭১২	১	৩৬৯	-৩৬৮	১	৩৬৯	-৩৬৮
	ঝ) উপ-প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়)	৮৪	৭৫	১	৮	-৭	১	৮	-৭
	ঞ) উপ-প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (তথ্য মন্ত্রণালয়)	৭৭	৭২	১	১০	-৯	১	১০	-৯

	ট) উপ-প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়)	৬৬	৬৩	১	১২	-১১	১	১২	-১১
	ঠ) উপ-প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)	৬২	৬২	১	৫	-৪	১	৫	-৪
	ড) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	১৩৫	৯৫	০	১৭	-১৭	০	১৭	-১৭
	ঢ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (শিক্ষা ও বিজ্ঞান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়)	১০৫	১০০	৪	০	৪	৪	০	৪
	ণ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১০৫	৯৫	০	৩৩	-৩৩	০	৩৩	-৩৩
	ত) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (পূর্ত মন্ত্রণালয়)	১৩৫	১২৩	০	৩৪	-৩৪	০	৩৪	-৩৪
	থ) উপ প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (আইন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়)	০	০	৪৯	০	৪৯	৪৯	০	৪৯
	দ) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)	৬১	৫৭	২	১	১	২	১	১
	ধ) উপ প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (শ্রম ও জনশক্তি এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়)	৮৪	৭৮	১	২০	-১৯	১	২০	-১৯
	ন) যুগ্ম প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (মহিলা, পরিবার ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)	০	০	৫১	০	৫১	৫১	০	৫১
	মোট ১৮১টি সংস্থা	৫৭১২৮০	৪৮৮৯০১	৪৮৬৬৯	৬৩৬৭২	-১৫০০৩	৪৮৬৬৯	৬৩৬৭২	-১৫০০৩

[পিএআরসি নিম্নবর্ণিত ৫০টি প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশ্নে এআরসি'র সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষন করে]

ক্রমিক নং	সংস্থা	মঞ্জুরিকৃত পদ	বর্তমান পদ	এআরসি'র সুপারিশ			পিএআরসি'র সুপারিশ		
				বৃদ্ধি	হ্রাস	বিদ্যমান পদের নীট পরিবর্তন (+)(-)	বৃদ্ধি	হ্রাস	বিদ্যমান পদের নীট পরিবর্তন (+)(-)
১৮২.	মুখ্য আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক	২৮৭	৩১৯	০	২৮৮	-২৮৮	০	২৯৪	-২৯৪
১৮৩.	নিম্নতম মজুরি বোর্ড	১৩	১৩	০	১	-১	০	১	-১
১৮৪.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৬৬	৬১	২	৩	-১	২	৪	-২
১৮৫.	বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি	১০৭	১০৭	৫	০	৫	৫	৩	২
১৮৬.	মেরিন একাডেমি	১৯০	১৮৭	৪	৩৬	-৩২	৭	৩৬	-২৯
১৮৭.	বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস	৭৫	৭০	৮০	০	৮০	৭৮	০	৭৮
১৮৮.	বিনিয়োগ বোর্ড	৪০১	৪০১	৩৫	১২৮	-৯৩	৩৫	১৩৬	-১০১
১৮৯.	গুপ্তসঙ্কেত পরিদপ্তর	৩৯	৩৮	৪	০	৪	৪	২	২
১৯০.	চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	২৮	৩৪	০	০	০	০	১৩	-১৩
১৯১.	সরকারী রিসিভার ও সরকারী অছি অফিস	২১	২১	৫	০	৫	৫	১	৪
১৯২.	ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	৬৪৪	৫০৭	২৬	১৩	১৩	২৬	১৭	৯
১৯৩.	স্থাপত্য অধিদপ্তর	২৭৭	২০৩	৫৪	০	৫৪	৫৪	৩০	২৪
১৯৪.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর	১৭৪৯	১৭০৭	০	১৪৯	-১৪৯	০	১১৯৯	-১১৯৯
১৯৫.	মুখ্য বয়লার পরিদর্শকের দপ্তর	১৬	১৮	৯	০	৯	১৬	০	১৬
১৯৬.	বহিঃশুল্ক, আবগারীও ভ্যাট (আপিল) কালেক্টরেট, চট্টগ্রাম	৬৯	৫০	৬	০	৬	৫	৫	০
১৯৭.	নিরীক্ষা পরিদপ্তর, (বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প)	২৯৬	২৫৪	১৯	৩০	-১১	১৯	৩৩	-১৪
১৯৮.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১০১৬	৯৭২	৪৬	১৮	২৮	৮২৬	১৫৪	৬৭২
১৯৯.	পরিদর্শন হিসাব নিরীক্ষা	৩৮	৩২	৪২	০	৪২		৩	৩৯
২০০.	পরিবেশ অধিদপ্তর	১৭৩	৭৯	১৭১	০	১৭১	১৭১	৯	১৬২
২০১.	মৎস্য,পশুসম্পদ তথ্যদপ্তর	১১০	৭২	৪১	০	৪১	৪১	১৪	২৭
২০২.	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর	২১৬	১৩৬	৪৩	০	৪৩	৪৩	৫	৩৮
২০৩.	কৃষিতথ্য সার্ভিস	২০৪	১৮০	১	৬৩	-৬২	১	৬৯	-৬৮

২০৪.	তথ্য ও গণসংযোগ অধিদপ্তর	১৩৯৫	১১২৩	৪০	৪১৪	-৩৭৪	৪০	৪৩০	-৩৯০
২০৫.	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা পরিদপ্তর	১৩০	৯৩	৮	০	৮	৮	৪	৪
২০৬.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	২৯১	২৬১	১৫৭	০	১৫৭	১৫৭	২	১৫৫
২০৭.	জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট	৪৮৮	৪৩৩	৮১	০	৮১	৮১	১২	৬৯
২০৮.	জনস্বাস্থ্যপুষ্টি, পথ্য ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট	১৪৬	৯৩	৫৬	০	৫৬	৫৬	২	৫৪
২০৯.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪১৮	২৮৭	৯৯	০	৯৯	৯৯	১	৯৮
২১০.	মৎস্য অধিদপ্তর	৩৯৪৯	৩৮০৭	৫৯৬	২৫৭	৩৩৯	৫৯৬	২৬৯	৩২৭
২১১.	পশুপালন অধিদপ্তর	৮২৮৯	৭৯৮০	৬১২	১	৬১১	৬১২	৩	৬০৯
২১২.	গণপূর্ত অধিদপ্তর	৫৭৪০	৫৬৯৭	১০০৯	৯১৫	৯৪	১০০৯	৯১৭	৯২
২১৩.	ফ্যাসিলিটিজ অধিদপ্তর	৫৭০	৫৪৭	১৯	০	১৯	১৯	২	১৭
২১৪.	মাদকনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১২৭৪	৮৩২	২৮০	১৯২	৮৮	২৮০	১৯৩	৮৭
২১৫.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৪০৪৭	২২০৭৫	০	৯৩৪৬	-৯৩৪৬	০	৯৪১২	-৯৪১২
২১৬.	খাদ্য অধিদপ্তর	১৩৬০৯	৮৭৫৪	৯২৭	২০৩	৭২৪	৯২৭	২০৮	৭১৯
২১৭.	কৃষি অধিদপ্তর	২৩২	২১০	১০	২৯	-১৯	১০	৩০	-২০
২১৮.	শ্রম অধিদপ্তর	৬৫৫	অপ্রদর্শিত	০	৬৫	-৬৫	০	৭০	-৭০
২১৯.	আইপিজিএম এন্ড আর/বিএসএমএমইউ	১৩৭৩	অপ্রদর্শিত	৩৭	২৩৭	-২০০	০	১৩৭৩	-১৩৭৩
২২০.	ঢাকা দন্তচিকিৎসাবিজ্ঞান কলেজ ও হাসপাতাল	২৫২	অপ্রদর্শিত	১৪	২০	-৬	১৪	২৩	-৯
২২১.	বন অধিদপ্তর	৭৩৮২	৭৩৮২	০	০	০	০	৮	-৮
২২২.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৯২৩৮	৮৩০০	৮১০	০	৮১০	৮১০	৯	৮০১
২২৩.	সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন	৬৬	৫২	৪০	০	৪০	০	০	০
২২৪.	ক. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪৯৮	অপ্রদর্শিত	০	১৭৮	-১৭৮	০	১৮০	-১৮০
	খ.বিদেশে কূটনৈতিক মিশন	১০৭৯	অপ্রদর্শিত	৪৬	২৬০	-২১৪	৪৬	২৬০	-২১৪
২২৫.	বাংলাদেশ ডাক ও তার বোর্ড	১৮৪৮৭	১৭৫২১	৫৯৫	১১১	৪৮৪	৫৯৫	১১২	৪৮৩
২২৬.	আইন অনুবাদ পরিদপ্তর	অপ্রদর্শিত	০	১৬	০	১৬	০	১৬	-১৬
২২৭.	ফৌজদারি ও দেওয়ানি অভিযুক্ত করণ পরিদপ্তর	অপ্রদর্শিত	০	৬২৪	০	৬২৪	০	৬২৪	-৬২৪
২২৮.	অভ্যন্তরিণ নৌ পরিবহন পরিদপ্তর	৭৬	৪৮	৬	৮	-২	০	১৪	-১৪
২২৯.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর	০	১৯৩	১৯৩	০	১৯৩	০	১৯৩	-১৯৩
২৩০.	মাদ্রাসা শিক্ষা পরিদপ্তর	০	৬৩২	৬৩২	০	৬৩২	০	৬৩২	-৬৩২
২৩১.	মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর	০	০	৬১৫	০	৬১৫	০	৬১৫	-৬১৫
	উপমোট ঃ ৫০টি সংস্থা	১০৫৭১৯	৯১৭৮১	৮১১৫	১২৯৬৫	-৪৮৫০	৬৭৩৯	১৭৬৪২	-১০৯০৩
	উপমোট ঃ ১৮১টি সংস্থা	৫৭১২৮০	৪৮৮৯০১	৪৮৬৬৯	৬৩৬৭২	-১৫০০৩	৪৮৬৬৯	৬৩৬৭২	-১৫০০৩
	মোট ২৩১টি সংস্থা	৬৭৬৯৯৯	৫৮০৬৮২	৫৬৭৮৪	৭৬৬৩৭	-১৯৮৫৩	৫৫৪০৮	৮১৩১৪	-২৫৯০৬

চুক্তিভিত্তিক বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া যায় এমন সম্ভাব্য পদ/কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	সংস্থা	মন্ত্রণালয়	পদ/কাজ
১.	বিনিয়োগ বোর্ড	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	বিশেষজ্ঞ, পরামর্শদাতা, বিশ্লেষক, তথ্য বিশেষজ্ঞ
২.	বীমা অধিদপ্তর	বাণিজ্য	অ্যাকচুয়ারি
৩.	বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও মুখ্য বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	বিদ্যুৎ উপদেষ্টা
৪.	বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও মুখ্য বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	অর্থনীতিবিদ, বিদ্যুৎ পরিদর্শক
৫.	ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	ড্রিলিং প্রকৌশলী,ফটোগ্র্যামেট্রিস্ট, মানচিত্রকার, কার্টোগ্রাফার
৬.	গনপূর্ত অধিদপ্তর	গৃহায়ন ও গনপূর্ত	আইন উপদেস্টা
৭.	স্থাপত্য অধিদপ্তর	গৃহায়ন ও গনপূর্ত	অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, উপদেষ্টা হিসাবে হলে
৮.	জাতীয় গণযোগাযোগ ইন্সটিটিউট	তথ্য	আলোকচিত্রগ্রাহক
৯.	বহিঃশুল্কগোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর	অর্থ	গুপ্তসঙ্কেত ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ/প্রযুক্তি
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তর	পরিবেশ ও বন	আন্তর্জাতিক পরিবেশ কনভেনশন (চুক্তি) বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিষয়ক আইন বিশেষজ্ঞ
১১.	বন অধিদপ্তর	পরিবেশ ও বন	সার্ভেয়ার, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রিশিয়ান (৩য় শ্রেণী)
১২.	মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	মৎস্য ও পশু সম্পদ	অর্থনৈতিক তদন্ত বিশেষজ্ঞ, সিনেমাটোগ্রাফার (২য় শ্রেণী), অডিওভিজুয়াল মেকানিক, শিল্পী, অডিওভিজুয়াল ইউনিট অপারেটর (৩য় শ্রেণী)
১৩.	পশু পালন অধিদপ্তর	মৎস্য ও পশু সম্পদ	ডেয়ারি অর্থনীতিবিদ
১৪.	মৎস্য অধিদপ্তর	মৎস্য ও পশু সম্পদ	বায়োমেট্রিসিয়ান, মৎস্যসম্পদ টেকনিসিয়ান, মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
১৫.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	কৃষি	অডিওভিজুয়াল আর্টিষ্ট, সিল্ক স্ক্রিন শিল্পী (১ম শ্রেণী), সিনিয়র অফসেট ক্যামেরাম্যান, স্লাইড ফটোগ্রাফার, প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ) (৩য় শ্রেণী)
১৬.	কৃষি বিভাগ	কৃষি	বীজ উপদেষ্টা
১৭.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	কৃষি	কৃষিঅর্থনীতিবিদ, উৎপাদন অর্থনীতিবিদ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, জুনিয়র প্রকৌশলী (১ম শ্রেণী), ভিডিও চিত্রগ্রাহক, শিল্পী
১৮.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	যোগাযোগ	অর্থনীতিবিদ, গবেষণা সহকারী
১৯.	জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	ব্যাকটেরিওলজিস্ট, ফার্মাকোলজিস্ট
২০.	জনস্বাস্থ্য, পুষ্টিতথ্য ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ, খাদ্য রসায়নবিদ
২১.	সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকসমুহ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	ক্লিনার/সুইপার/বাবুর্চি/ক্যাটারার (৪র্থ শ্রেণী)
২২.	দন্ত রোগবিদ্যা কলেজ ও চিকিৎসা হাসপাতাল	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	আলোকচিত্রগাহক, ইলেকট্রিসিয়ান (৩য় শ্রেণী)
২৩.	ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ	শিক্ষা	সহকারী স্থপতি
২৪.	মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	স্বরাষ্ট্র	মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
২৫.	খাদ্য অধিদপ্তর	খাদ্য	চিকিৎসক
২৬.	শ্রম অধিদপ্তর	শ্রম ও জনশক্তি	অডিও-ভিজুয়াল কর্মকর্তা, অডিও-ভিজুয়াল শিল্পী
২৭.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র	আইন উপদেষ্টা, উপ আইন উপদেস্টা
২৮.	বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড	ডাক ও টেলি যোগাযোগ	অর্থনীতিবিদ

অধ্যায় ৫

মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ

৫.০১ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জনগণের অনুপ্রেরণার একটা উৎস ছিল স্ব-শাসন, গণতান্ত্রিক সুশাসন ও কার্যকর জনপ্রশাসনের প্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকগণ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে সরকারের যথার্থ লক্ষ্য, ভূমিকা, এখতিয়ার ও সংশ্লিষ্ট কাঠামো সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধিতে পৌঁছাতে দৃশ্যতঃ ব্যর্থ হয়েছেন। এই সময়কালে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে (ও প্রায় সকল শিল্পোন্নত অঞ্চলে) যখন স্থানীয় সরকার ও বেসরকারী খাতকে প্রশাসনিক সংস্কারের কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে, বাংলাদেশে তখনও সেকেলে একটি কাঠামো বিরাজ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বিকেন্দ্রীকরণ ও নিম্নতর স্তরে কর্তৃত্বাধিকার অর্পণের প্রয়াস খুব কমই হাতে নেয়া হয়েছে। এই সনাতনী মানসিকতার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের নানা ধরণ সম্পর্কে ধারণার অভাব। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের নামে নেয়া উদ্যোগ শুধু মুখের কথায় পর্যবসিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ

৫.০২ বিকেন্দ্রায়ন সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার কারণে জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দেশের সংবিধান মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করেনি। সংবিধানের ৫৯ (১) নং অনুচ্ছেদে অঙ্গীকার করা হয়েছে, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে"। এখানে বিকেন্দ্রীকরণের দু'টি রূপ: ক্ষমতার 'বিক্ষেপণ' (deconcentration) ও ক্ষমতার 'নিম্নমুখী বিবর্তন' (devolution)। আর 'বিকেন্দ্রীকরণ' বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরেই একটি ব্ল্যাঙ্কেট টার্ম (blanket term) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৫.০৩ কমিশন অবশ্য বিভিন্ন ধরণের বিকেন্দ্রীকরণের নিম্নোক্ত কার্যকর সংজ্ঞা অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছে। ক্ষমতার নিম্নমুখী বিবর্তন (devolution) হ'ল আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য অথবা কোনো কার্যক্রমের অবশিষ্ট পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতা তুলে দেয়া। নিম্নতর পর্যায়ে ক্ষমতা অর্পণ (delegation) বলতে বোঝায় অধস্তন সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের কাছে ক্ষমতা বা কর্মদায়িত্ব হস্তান্তর। আর বেসরকারীকরণ হচ্ছে একটি ব্যবস্থা যার আওতায় বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সেই সব কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে দেয়া যেগুলো এর আগে সরকার সম্পাদন করতো। বিনিয়ন্ত্রণ (deregulation) হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারের কিছু দায়িত্ব বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা। ক্ষমতার বিক্ষেপণ (deconcentration) বলতে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ভিতরে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের পুনর্বণ্টন (যেমন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যকার সম্পর্ক) নির্দেশ করে। কমিশন স্বীকার করে যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সবচেয়ে কাঙ্খিত রূপটি হচ্ছে এর নিম্নমুখী বিবর্তন, তবে বেসরকারীকরণ ও নিম্নতর পর্যায়ে ক্ষমতা অর্পণ যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হলে তা কার্যকর সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে।

বর্তমান দৃশ্যপট

৫.০৪ অতীতের প্রায় সকল প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়াসে যে জিনিসটির অভাব ছিল, সেটি হচ্ছে সরকারের প্রকৃতি ও আকার এবং বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন অনুভব করার মতো প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট। অন্যভাবে বলা যায়, জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংস্কারের দু'টি বিষয়কে সম্পর্কিত করে দেখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যায়।

৫.০৫ প্রথমত, বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামোটি (চার স্তর বিশিষ্ট) সাংবিধানিক বিধানের আংশিক পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫১ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে"। বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে অবশ্য শীর্ষস্তরের প্রশাসনিক ইউনিটে (যেমন, বিভাগগুলোতে) কোনো স্থানীয় সরকার বিন্যাস নেই, আবার সর্বনিম্নস্তরের স্থানীয় সরকারের ইউনিটেও (অর্থাৎ গ্রাম পরিষদেও) কোনো প্রশাসনিক বিন্যাস নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ৬০নং অনুচ্ছেদে যদিও এই বলে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতাবান করার অঙ্গীকার রয়েছে যে, "এই সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে .....ক্ষমতা প্রদান করিবেন", বাস্তবে তা ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকারকে সীমিত ক্ষমতা ও সম্পদ দেয়া হয়েছে; অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার মাঠ পর্যায়ের সংস্থাগুলো স্থানীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা (dominant role) পালন করে চলেছে। প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝেই স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকারটি ক্ষুণ্ন করেছেন।

৫.০৬ নিচে অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হ'ল:

(ক) মাঠপর্যায়ের সংস্থাসমূহের সঙ্গে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর পরিপূরক সম্পর্কটি লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারে সাধারণত ক্ষমতার বিক্ষেপন, আংশিকভাবে ক্ষমতার নিম্নমুখী বিবর্তন ও নিম্নতর পর্যায়ে ক্ষমতার্পনের একটা মিশ্রন ঘটেছে।

(খ) মাঠভিত্তিক বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে অর্পিত কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অভাব এবং এসব সংস্থার আর্থিক ও প্রশাসনিক স্ব-শাসনে হস্তক্ষেপের কারণে প্রান্তিক স্তরের প্রশাসনের মান নিম্নপর্যায়ের হয়ে থাকে। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে অধস্তন সংস্থাগুলোর দুর্বল অসামর্থ্যতাও অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের জন্য দায়ী।

(গ) বিভিন্ন ধরণের বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার উভয় খাতে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব মাঠভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কাজে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

(ঘ) স্থানীয় সরকার সংস্থা ও সরকারী অধিদপ্তরগুলোর মধ্যে কাজের পুনরাবৃত্তি হয়েছে আরেক সমস্যা। বর্তমান ব্যবস্থায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা, যেমন সমাজসেবা পরিদপ্তর, যুব পরিদপ্তর, মহিলাবিষয়ক পরিদপ্তর, আনসার-ভিডিপি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ও সমবায় পরিদপ্তর প্রায় একই ধরণের কাজ করে থাকে।

(ঙ) নিম্নমানের সমন্বয় ও কাজের পুনরাবৃত্তি কোনো কোনো এলাকায় সম্পদের অতিরিক্ত সমাবেশ ঘটায় এবং এ কারণে কেন্দ্র-প্রান্তের ব্যবধান বাড়ে। এতে শ্রেণীবৈষম্য ও দারিদ্র্যও বেড়ে যায়।

(চ) অসমন্বিত কার্যক্রম পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রশাসনও নিম্নস্তরের সেবা সরবরাহ, অদক্ষতা ও জবাবদিহিতার অভাব ঘটায়।

৫.০৭ এসব কারণে বর্তমান স্থানীয় সরকার সংস্কারের আলোকে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এজন্য স্থানীয় সরকার ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের মাধ্যমে বর্তমান সেবা সরবরাহ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাঠভিত্তিক সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

অংশীদারীত্বমুলক শাসনের লক্ষ্যে সংস্কারের বর্তমান সুযোগ

৫.০৮ বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের নীতিকে একটি ভাল সংস্কার উদ্যোগ হিসাবে দেখা হয়। ১৯৯৬-র সেপ্টেম্বরে স্থানীয় সরকার কমিশন (এলজিসি) গঠিত হয়। এই কমিশন ক্ষমতার নিম্নাভিমুখী বিবর্তনের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুপারিশের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। কমিশন তার প্রতিবেদনে প্রকৃত এখতিয়ারসম্পন্ন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতাসহ চার-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর পক্ষে সুপারিশ করে (অর্থাৎ, গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ)। এই আইনভিত্তিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া ১৯৯৭-এর অক্টোবর থেকে শুরু হয়, ঐ সময়ে জাতীয় সংসদে গ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর পরিবর্তন আনার জন্য দু'টি বিল (গ্রাম পরিষদ বিল ১৯৯৭ ও স্থানীয় সরকার [ইউনিয়ন পরিষদ] অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (সংশোধনী) বিল ১৯৯৭) পাশ হয়। ফলে স্থানীয় সরকার (গ্রাম) পরিষদ আইন ১৯৯৭ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (২য় সংশোধনী) আইন ১৯৯৭ পাশ হয়। ১৯৯৮-এর নভেম্বরে জাতীয় সংসদ উপজেলা পরিষদ বিল ১৯৯৮ পাশ করে। সম্প্রতি মন্ত্রিসভা খসড়া জেলা পরিষদ বিল অনুমোদন করেছে। বিলটি আইন হিসাবে পাশের জন্য সংসদে পেশ করা হয়েছে।

৫.০৯ সংস্কার পরিকল্পনার আওতায় চার স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামো ক্রমান্বয়ে স্থাপিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়ে আদালতে একটি মামলা চলতে থাকায় গ্রাম পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। **১২ সদস্যের ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তিন মহিলা সদস্যের প্রতিনিধিত্বশীলতার মধ্য দিয়ে কিছুটা নারী-পুরুষ ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারে এক লক্ষ্যণীয় সাফল্য।** ইউপি নির্বাচনে প্রায় ১৩,০০০ মহিলা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনও ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। যদিও স্থাপিত এবং প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন, সকল প্রশাসনিক ইউনিটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সাংবিধানিক বিধানের সঙ্গে অসঙ্গতি (যা আগে আলোচিত হয়েছে) থাকলেও এর লক্ষ্য হয়েছে দেশে এমন একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো তৈরি যাতে ক্ষমতার নিম্নমুখী বিবর্তন রয়েছে অনেক বেশি। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে পুনর্বিন্যস্ত এবং যৌক্তিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এতে সেবা সরবরাহ উন্নত করা এবং দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও স্থানীয় পর্যায়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক ও সম্পূরক সম্পর্ক সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.১০ স্থানীয় সরকার খাতে চলতি সংস্কার কার্যক্রমটি সংস্কারবিদ ও নীতি-পরিকল্পনা প্রণেতাদের একটা সম্পূরক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগ দেবে, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের জনবলকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগাবার বিকল্প উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। এতে যা প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে সমন্বয় ও সংহতি বিধানের একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে সরকারের "বিক্ষেপিত" (deconcentrated) অংশটি (অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত সংস্থাগুলো) তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সরকারের "বিবর্তিত" অংশের (অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের) সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে। এ জন্য বিভিন্ন ধরণের বিকেন্দ্রীকৃত কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য একটা কর্মকৌশল এখনই প্রণয়ন করা দরকার যাতে কাজের পুনরাবৃত্তি পরিহার করা যায়, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো যায় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ও বিভিন্ন স্কিমের পরিকল্পনা, কর্মী নিয়োগ ও অর্থায়ন স্থানীয় ভাবে করা যায়।

৫.১১ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বর্তমান সংস্কার কার্যক্রম থেকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন একটি পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে যা শাসনকে এক নতুন রূপ দেয়ার জন্য কিছু বিষয়ের অবতারণা, আলোচনা এবং সেগুলো নিয়ে সলাপরামর্শের একটা বিকল্প উপায়ের সন্ধান দেবে। এরকম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ঃ

ক) স্থানীয় সরকারের বর্তমান ও প্রস্তাবিত কাঠামোর ভিতরে সরকারী কার্যকলাপের পুনর্বিন্যাস।

খ) সরকারের মাঠ পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে কর্তৃত্ব অর্পণ।

১ম ভাগ

নতুন স্থানীয় সরকার কাঠামো

গ্রাম পরিষদ

৫.১২ এই আইনের বিধানের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড মেম্বারদের পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান করে গ্রাম পরিষদসমূহ গঠিত হবে[১]। এর সদস্য থাকবেন ১২জন: ৯ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা যারা 'নির্দেশক কর্তৃপক্ষের' তত্ত্বাবধানে গ্রামবাসীদের (অর্থাৎ রেজিষ্টার্ড ভোটারদের) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। গ্রাম পরিষদ ওয়ার্ড স্তরে গঠিত হবে, গ্রাম স্তরে নয়। তবে এখনো এই পরিষদকে কোনো আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা দেয়া হয়নি। গ্রাম পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম সহায়ক ইউনিট হিসাবে কাজ করবে। এই পরিষদকে বেশ কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে[২]।

---

[১] ১৯৯৭ সালের গ্রাম পরিষদ আইনে 'নির্দেশক কর্তৃপক্ষ' বলতে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

[২] যেমন, জন্ম-মৃত্যু, বিয়ে ও তালাকের রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সেগুলো ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ; প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মক্তবে শিক্ষামূলক কার্যকলাপ পরিদর্শন এবং এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রতিবেদন পাঠানো; অভিভাবকরা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা; পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা দেয়া ও এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রতিবেদন পাঠানো; ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অনিয়ম ইত্যাদি প্রতিরোধ করা; আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান এবং চুরি, সিঁদকাটা, নারী নির্যাতন ও নারীর ওপর সহিংসতা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত রাখা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও এনজিও কর্মীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পাঠানো।

ইউনিয়ন পরিষদ

৫.১৩ ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোতে একটি মাত্র পরিবর্তন এনেছে। এই আইনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি সংস্থার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে থাকবে একজন চেয়ারম্যান, নয় জন সদস্য (নয়টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি) ও তিনজন মহিলা সদস্য (নয়টি ওয়ার্ডের তিনটি বৃহত্তর এলাকার প্রতিনিধি)। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৭-সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৩৮টি নাগরিক কর্মদায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। এসব আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ অনেকগুলো কাজ[৩] সম্পাদন করবে। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সীমিত। ইউনিয়ন পরিষদ শুধু হোল্ডিং কর আদায় করে এবং হাট-বাজার ও জলমহালের ইজারা দেয়। পল্লী উন্নয়নের নামে ইউনিয়ন পরিষদ শুধু কিছু ছোটখাটো কাজ যেমন, কালভার্ট নির্মাণ এবং পল্লী সড়ক পুনঃ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি করে।

৫.১৪ বর্তমানে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের কাজ হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের যুগপৎ দু'টি কর্মভূমিকা পালন করতে হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)-এর দু'টি ভূমিকা – উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউডিসিসি)[৪] সদস্য-সচিব এবং ইউনিয়ন পরিষদদের কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক/মনিটর – পল্লী উন্নয়ন প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সেবা সরবরাহ পদ্ধতিতে উপজেলার অবস্থানটি গুরুত্ববহ। উপজেলা থেকেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, গবাদি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, সামাজিক বনায়ন ও সমবায় সম্পর্কিত সকল সরকারী সেবা গ্রামবাসীদের দেয়া হয়ে থাকে। ইউনিয়নগুলো এখনও সেবা সরবরাহের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি যদিও ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোতে উপজেলা কর্মকর্তাগণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা তাদের সেবা প্রদান করে থাকেন।

উপজেলা পরিষদ

৫.১৫ উপজেলা পরিষদ আইনে দেশের ৪৬৩টি উপজেলায় পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাঠামোগত এবং উভয় দিক থেকেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি আগেকার উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার অনুরূপ। নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপজেলার আওতায় সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার (ছোট ছোট শহরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাগুলোর মোট মহিলা সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন। সংসদ সদস্যরা পরিষদের উপদেষ্টা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে কাজ করবেন। উপজেলা পরিষদের কাজ হবে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, পরিষদের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারী অফিস/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা ইত্যাদি।

জেলা পরিষদ

৫.১৬ স্থানীয় সরকার কমিশন জেলা পরিষদ পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কমিশন জেলা পরিষদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়রাম্যান (উপমন্ত্রীর মর্যাদাসহ) এবং প্রত্যেক উপজেলা থেকে ২জন করে নির্বাচিত সদস্যের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী, জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা, যারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। উপজেলা ও পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন এবং একজন এনজিও প্রতিনিধি মনোনীত/নিযুক্ত হবেন। জেলা স্তরে নিযুক্ত সকল সরকারী কর্মকর্তা হবেন জেলা পরিষদের ভোটাধিকারবিহীন সদস্য। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য-সচিব হবেন এবং জেলার সংসদ সদস্যরা পরিষদের উপদেষ্টা হবেন।

---

[৩] কাজগুলো হলো: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহায়তা করা; বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান নিবারণে ব্যবস্থাদি গ্রহণ; কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; পরিবার পরিকল্পনার প্রসার; অর্পিত যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার; সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ ইত্যাদির মতো সরকারী সম্পত্তির সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ; ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার গৃহীত উন্নয়ন কার্যাবলি পর্যালোচনা; স্যানিটারি পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্মত করা; জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং সকল প্রকার শুমারির বাস্তবায়ন।

[৪] ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা পর্যায়ক্রমে ইউডিসিসি'র চেয়ারম্যান হন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই কমিটির সদস্য-সচিব। ইউডিসিসি-র মাধ্যমেই কেন্দ্রের সমস্ত সম্পদ (অর্থাৎ ব্লক মঞ্জুরি এবং খাদ্য সাহায্যসহ অন্যান্য অর্থ/উপকরণ সহায়তা) দেয়া হয় ও সাধারণত সমান অনুপাতে ইউনিয়নগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৫.১৭ জেলা পরিষদের বর্তমান কাজ অব্যাহত থাকবে। পরিষদের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে থাকবে – জেলার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৫.১৮ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও কর্মদায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মূল আইনে কিংবা ঐ আইনের আওতায় প্রণীত বিধিসমূহে সংজ্ঞায়িত রয়েছে। সরকার জাতীয় নীতিমালা ও মূলনীতিসমূহের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং এগুলো মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তাও নিশ্চিত করেন। স্থানীয় সংস্থাগুলোকে তাদের সভার কার্যবিবরণী ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অনুলিপি মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠাতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্তৃত্বাধীনে ঐ কার্যবিবরণী বাতিলের আদেশ দিতে পারেন, সরকারী আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে কোনো গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত অথবা নিষিদ্ধ করতে পারেন। সরকার তার কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ান্তর অথবা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সংস্থাসমূহের কাগজপত্র, রেকর্ড ও সম্পত্তির পরিদর্শনের মাধ্যমে ঐ সব সংস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

৫.১৯ যে সব আইন, বিধি ও প্রবিধানের আওতায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাজ করে থাকে সেগুলো অনেক সময়ই সুস্পষ্ট অথবা সুনির্দিষ্ট নয়। অনেক বিধি ও প্রবিধানও রয়েছে যেগুলো স্ববিরোধী। কোনো কোনো বিধি স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। আবার অন্য অনেক বিধি এর বিপরীতে অবস্থান নেয়। ফলে, এই প্রক্রিয়া আইন, বিধি ও প্রবিধানগুলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী করে তুলে।

৫.২০ ইউনিয়ন পরিষদ ও কয়েকটি পৌরসভা ব্যতীত স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে দুই ধরণের কর্মকর্তা কাজ করেন: সংস্থাগুলো কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং প্রেষণে নিযুক্ত সরকারের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত একই স্তরের কর্মকর্তা যাদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এদের ওপর কেবল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে যার প্রকৃতি ও পরিসর নির্ধারিত হয় সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি ও প্রবিধান এবং বিভিন্ন সময়ে জারি করা নির্বাহী আদেশ দ্বারা। প্রেষণে প্রেরিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে স্থানীয় সংস্থার তহবিল থেকেই বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সরাসরি নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে: ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে সরকারের (ডেপুটি কমিশনারের) অনুমোদন নিতে হয়। স্থানীয় সংস্থাগুলো কতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত তা নির্ধারণ করে দেয়; তাছাড়া নতুন পদের মঞ্জুরি ও কিভাবে সেগুলো পূরণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও চাকরির শর্তও কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট করে দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলোর কাজের এখতিয়ার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। একটি স্থানীয় সংস্থাকে যে কাজ করতে হবে ও যে ক্ষমতা এ সংস্থার থাকবে, তা স্থানীয় সংস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন অধ্যাদেশ ও আইনে বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার কোনো স্থানীয় সংস্থাকে উপযুক্ত মনে করলে অন্য যে কোনো কাজের দায়িত্ব দিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাছে যে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম হস্তান্তর করতে পারেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বহু ধরণের সরকারী নির্দেশ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৫.২১ কাগজে কলমে স্থানীয় সংস্থাগুলোর করণীয় কাজের তালিকাটি রীতিমত চমকপ্রদ। **কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এর বেশির ভাগ কাজই বিভিন্ন সরকারী সংস্থা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে** এবং এসব সম্পাদনের জন্য তাদের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করেছে। সরকারের এই সংস্থাগুলোই সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও বিলিবণ্টন করে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে স্থানীয় সরকারগুলোর হাতে (সীমিত জনবল ও অর্থ সম্পদসহ) শেষ পর্যন্ত যে সব কাজ থাকে তার প্রভাব ও সুফল হয় সীমিত।

৫.২২ **স্থানীয় সরকারের সম্পদের ভিত্তিটি খুবই দুর্বল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরির উপর এদের অনেকখানিই নির্ভর করতে হয়।** করভিত্তিও সীমিত বলে স্থানীয় সংস্থাগুলো পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান করতে পারে না। এলাকায় কিছু নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য সরকারী মঞ্জুরি দেয়া হয়। **কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য স্থানীয় সরকারগুলোর সঙ্গে রাজস্ব ভাগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা।**

৫.২৩ গ্রামের *এলিট শ্রেণী* এখনও বহুলাংশে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজেই সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষন ও অনুচর তোষণের রীতিটি এখনও একটা বড় ভূমিকা পালন করে। তবে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে স্থানীয় পরিষদগুলোর নেতৃত্বের পরিস্থিতি এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের উদীয়মান নেতৃত্বের ব্যাপারে সংগঠিত ও অসংগঠিত গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা নিয়ে কোন সমীক্ষা এখনো হয়নি। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি সচেতন এ ধরণের বহু গোষ্ঠী নেতা/সদস্য ১৯৯৭-এর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন।

৫.২৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও আদান-প্রদান মোটেও সন্তোষজনক নয়। নিম্নপর্যায়ের ইউনিটের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের এবং সমস্তরের ইউনিটগুলোর ভিতর পারস্পরিক উপকারী সম্পর্কটিও অনুপস্থিত। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল উপজেলা ও জেলা পরিষদ মুলতবি করে দেয়া। বর্তমানে নির্বাচিত সংস্থা হিসেবে উপজেলা পরিষদ বা জেলা পরিষদ কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। ইউডিসিসি-র সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে। ইউডিসিসি হল উপজেলা পর্যায়ে একটি অ্যাড-হক সংস্থা। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্যেও সহযোগিতার ব্যাপারটাও দেখা যায় না।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক

৫.২৫ **একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে উপজেলা পরিষদ আইনে ২৫নং ধারার সংযোজন। এ ধারায় একজন সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে**। কিন্তু তার ভূমিকা পরামর্শদাতার চাইতে বেশ কিছুটা শক্তিশালী করা হয়েছে কেননা, আইনে বলা হয়েছে, "--- পরিষদ তার পরামর্শ গ্রহণ করবে"। এর ফলে পরিষদ সদস্যদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং সংসদ সদস্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারও ঘটতে পারে। অধিকন্তু, এটা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল ধারণা ও নীতির পরিপন্থী।

৫.২৬ আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়গুলো সরকারী কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদের অধীনে প্রেষণে পাঠায়। পরিষদকে এসব কর্মকর্তার বার্ষিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা দেয়া হলেও তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR) লেখার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তাছাড়া, **অর্থ সংক্রান্ত এবং কর্মকর্তা নিয়োগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত উপজেলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ হবে** – এই মর্মে আইনে একটি ধারা যুক্ত করায় বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি বিকৃত হয়েছে।

৫.২৭ জেলা পরিষদের বিষয়ে স্থানীয় সরকার কমিশন সুপারিশ করেছে যে, শুধুমাত্র বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা ছাড়া সকল সরকারী অফিস/সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে প্রেষণে জেলা পরিষদে পাঠানো হোক। কমিশন আরও সুপারিশ করেছে যে, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে এসব কর্মকর্তার বার্ষিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা দেয়া হোক এবং তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব দেয়া হোক তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের।

৫.২৮ গ্রাম পরিষদের এখতিয়ারে কোনো সরকারী অফিস বা কর্মচারী নেই। ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারিদের কর্তব্য ও কর্মদায়িত্ব পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম এখানে কার্যকর নয়।

৫.২৯ কমিশন (পিএআরসি) তার বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার কারণে জেন্ডারভিত্তিক সমস্যাসহ স্থানীয় সরকারের সমস্যাসমূহের গভীরে যেতে পারেনি। অবশ্য, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে যেসব কৌশলের সুপারিশ করা হয়েছে তাতে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতার্পণের ব্যাপারটি কার্যকর করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয়েছে।

৫.৩০ কমিশন নিম্নবর্ণিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ করছে

ক. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১) সাতটি সরকারী অফিস/সংস্থার কার্যক্রম, কর্মচারী ও বাজেট জেলা পরিষদে ও অনুরূপভাবে নয়টি সরকারী অফিস/সংস্থার একই বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে (সংযুক্তি ৫.১ ও ৫.২)। ঐসব সরকারী অফিস/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করতে হবে।

২) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর প্রয়াস হবে কর আদায় সর্বাধিক করা এবং বিভিন্ন বিকল্প উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি করা।

৩) ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)/এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে প্রেষণে নিয়োগ করা হলে পরিষদের সামর্থ্য বাড়তে পারে।

৪) *কাজের বিনিময়ে খাদ্য* সহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

৫) অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম, প্রকল্প তৈরি এবং এগুলোর অনুমোদন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো পুরনো ও অচল নির্দেশিকাগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে।

৬) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৭) জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারে সরকারী কার্যাবলী সমন্বয় করবে। ঐ সকল এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনারত বেসরকারী সংস্থাগুলোর (এনজিও-র) প্রতিনিধিরা জেলা ও উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। এসব পরিষদের (জেলা ও উপজেলা পরিষদ) চেয়ারম্যানগণ মুখ্য সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন।

খ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১) যেসব বিষয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারী অফিস/সংস্থা (সংযুক্তি ৫.১) ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে জেলা স্তরের প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলোকে আরও জোরদার করা যেতে পারে।

২) বিভাগীয় পর্যায়ে যেসব সরকারী অফিস/সংস্থা (সংযুক্তি ৫.১) ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যেসব স্তরের উদ্বৃত্ত জনবলকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের নিজ নিজ মূল সংগঠনগুলোতে আত্মীকরন করে উপযুক্ত পদে ন্যস্ত করা যেতে পারে। অথবা, এ উদ্বৃত্ত জনবলকে জেলা স্তরের দপ্তরগুলোর সঙ্গে অথবা অন্যান্য সরকারী অফিস/সংস্থা (যাদের বাড়তি জনবলের প্রয়োজন রয়েছে) সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে।

৩) কেন্দ্রীয় পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department - LGED) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Public Health Engineering Department - PHE) - এর অফিস বিলুপ্ত করে এর যাবতীয় কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে জেলা এবং উপজেলা পরিষদে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৪) জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন এলাকায় সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কেন্দ্র হতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার সময়ে সময়ে কমিটি গঠন করে রিভিউ করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৫) সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করবে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কর্মকমিশন পরিচালিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

৬) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ ও প্রয়োগের জন্য, প্রস্তুতকৃত মডেল *সার্ভিস রেগুলেশন* বা চাকরিবিধি (নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সম্বলিত) হালনাগাদ করবে।

৭) উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্যের ভূমিকা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে তাঁকে শুধু তাঁর এখতিয়ারের অধীন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৮) সকল সরকারী অফিস/সংস্থা (হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়) তাদের বিভাগীয় প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো জেলা পরিষদের কাছে দাখিল করতে পারে। প্রতিটি জেলা পরিষদে একটি করে জেলা পরিকল্পনা ইউনিট থাকবে। এ ইউনিট জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে সেতু হিসাবে জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৯) জেলা পরিষদের মতো সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী অফিস/সংস্থা (হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়) উপজেলাভিত্তিক তাদের প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো উপজেলা পরিষদে পেশ করতে পারে।

১০) যে সকল পরিষদ সৃজনশীল কাজ করবে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত কর আদায় বৃদ্ধি করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে সরকার তাদের অতিরিক্ত বরাদ্ধ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

২য় ভাগ

বিকেন্দ্রীকরণ ও নিম্নস্তরে ক্ষমতা অর্পণ

নির্দেশিকা

৫.৩১ মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো তাদের অধীনস্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করে তা পর্যাপ্ত নয়। যেসব বিধিতে মন্ত্রণালয়গুলোর ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়গুলো নিজেরা প্রায়ই ঐ সব বিধি লঙ্ঘন করে। ১৯৯৬ সালের কার্যপ্রণালী বিধির ১ নং তফসিলে মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অতীতে বিভিন্ন সময়ে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছে – প্রায়শই নিম্নস্তরে ক্ষমতা অর্পনের প্রেক্ষাপট থেকে। এসব সংস্থাগুলোকে দু'ধরণের অর্পিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে – (১) প্রশাসনিক ও (২) আর্থিক।

৫.৩২ সংস্থাপন বিভাগের দাপ্তরিক স্মারক পত্র (নং ৭/৫৯-এসও-৭, তারিখ ৫ জানুয়ারি, ১৯৬০) ভিত্তিক ১৯৭৬ সালের সচিবালয় নির্দেশামালাতে অধিদপ্তরগুলোকে কি পরিমান প্রশাসনিক ক্ষমতা নিম্নতর স্তরে অর্পণ করা হবে সে সম্পর্কিত মৌলিক নির্দেশনা সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে অধিদপ্তর প্রধানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্মারকে এই মর্মে নির্দেশ রয়েছে যে, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনাদান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে অধিদপ্তরগুলো সকল নির্বাহী কাজ সম্পাদন করবে। অধিদপ্তর প্রধানদেরকে ১ম (প্রথম নিযুক্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা (নিযুক্তি, নিয়োগ, বদলি, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি ও আপিল সংক্রান্ত বিষয়ে) দেয়া হয়েছে। **সচিবালয় নির্দেশমালায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো অধিদপ্তরের দৈনন্দিন কাজে মন্ত্রণালয়ের কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। দাপ্তরিক বিষয়াবলী আলোচনার জন্য অধিদপ্তর প্রধানগণ মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।** তবে এ ধরণের যোগাযোগের বিষয়টি পরে সচিবকে অবহিত করার জন্য অধিদপ্তর প্রধানগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তর প্রধানগণ তাদের প্রস্তাব নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন যেখানে এগুলোর বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশের প্রয়োজন রয়েছে – এমন সব দিকগুলোর উল্লেখ থাকবে।

৫.৩৩ অধিদপ্তরগুলোকে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি সাধারণ নির্দেশনা রূপরেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা মাঝে মাঝে অর্থমন্ত্রণালয় ইস্যু করে থাকে। ১৯৮৫ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি দাপ্তরিক স্মারকে (স্মারক নং-এমএফ/ইসি-১/ (ডিপি-৪/৮৫/১৫৮, তাং- ২৯ জুলাই, ১৯৮৫) অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোকে সুনির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোকে আর্থিক ক্ষমতা দানের বিষয়টি সুষম করার লক্ষ্যে একটি আদর্শ বা 'মডেল' এই স্মারকে দেয়া হয়েছে। এতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তর প্রধানদের সুনির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতাগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক ক্ষমতার ৪৮টি বিষয় রয়েছে যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: পুনঃ উপযোজন তহবিল; অনুন্নয়ণ ব্যয় হিসাবের অধীন নতুন কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন; সরকারী সম্পত্তির নিষ্পত্তি; প্রতারণা, চুরি ইত্যাদি কারণে সরকারী অর্থের ক্ষতি অথবা মজুত উপকরণের অনুদ্ধারযোগ্য মূল্য অবলোপন; পুরনো যানবাহনের বদলে নতুন যানবাহন ক্রয়; অফিস সরঞ্জাম ও স্টেশনারি দ্রব্য ক্রয়; উপযোগ ব্যয়; কর; বেসরকারী সদস্যদের ভ্রমণ মঞ্জুরি ইত্যাদি। পরে, ১৯৯৪ সালে এই স্মারক সংশোধন করা হয়, যার ফলে অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে। ১৯৯৪ সালের ১২ এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশে নির্মাণ কাজ ও মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা ৫ কোটি টাকা থেকে ২ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়েছে। অবশ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধিদপ্তরগুলোর বাজেট প্রাক্কলন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিদপ্তরগুলো তাদের চাহিদা প্রণয়ন করে, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর আগে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যালোচনা করে চূড়ান্তকরে। সংসদ ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুমোদিত তহবিল যোগান দেয়।

নির্দেশিকা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান

৫.৩৪ সরকারী দলিলাদি (অর্থাৎ কার্যবিধি ও দপ্তর স্মারক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোর কাজ ও দায়িত্বগুলো পরিস্কার ভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। **একটি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও কর্মদায়িত্ব নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ণ, আইন প্রণয়নমূলক ব্যবস্থাদি, সংসদে মন্ত্রীর দায়িত্ব**

পালনে সহায়তা এবং শীর্ষস্তরে কর্মচারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমিত [৫]। তবে বাস্তবে প্রশাসনিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রে অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার কাছে ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি যথেষ্ট সীমিত। অধিদপ্তরগুলো যে পরিস্থিতিতে কাজ করে তা একটু ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো সমস্যা ও অন্তরায়ের জন্য সরকারীভাবে তাদের কাছে অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ তারা করতে পারে না।

৫.৩৫ ১৯৮৯ সালের মন্ত্রণালয়-অধিদপ্তর সম্পর্ক বিষয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা সমীক্ষা (পিএইসি) ওয়ার্কিং গ্রুপ ছয়টি মন্ত্রণালয়ে (কৃষি, বাণিজ্য, সংস্থাপন, অর্থ, শিল্প ও পরিকল্পনা) আঠারোটি অধিদপ্তর ও তাদের অধীনস্ত পরিদপ্তরগুলোর ওপর সমীক্ষা চালায়। ওয়ার্কিং গ্রুপ লক্ষ্য করে যে, অধিদপ্তরগুলোর কার্যকর পরিচালনের মূল অন্তরায় এবং **তাদের কাজকর্মে বিলম্বের বড় কারণ হল, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়ে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্পণ না করা**। যদিও অধিদপ্তরগুলোকে কিছু কিছু প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তবুও দেখা গেছে, এসব বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মমাফিক কিছু সিদ্ধান্ত যেগুলো নীতি সংক্রান্ত নয় এবং যেগুলো অধিদপ্তরগুলো নিজেরাই নিতে পারত। (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (খণ্ড-৩), ১৯৮৯)।

৫.৩৬ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি) অধিদপ্তর, কর্পোরেশন ও অন্যান্য অধস্তন দপ্তরে ক্ষমতা অর্পণের ওপর এক জরিপ পরিচালনা করে। তিনটি নির্বাচিত অধিদপ্তর ও একটি কর্পোরেশনের কার্যপদ্ধতি, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সম্পর্কসমূহ, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কমিটি দেখতে পায়, এই অধিদপ্তরগুলোর এখতিয়ারসমূহে মন্ত্রণালয়গুলোর ঘন ঘন হস্তক্ষেপের কারণে অধিদপ্তরগুলোর স্বায়ত্তশাসনের পরিসর যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে, সেবা প্রদানে অদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজের মানও খারাপ হয়েছে।

৫.৩৭ এই জরিপে নিম্নস্তরে ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রগুলোতে নিম্নবর্ণিত অসঙ্গতি ও অন্তরায়গুলো দেখা যায় (এআরসি ১৯৯৬) ঃ

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে খুবই সামান্য নীতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলোর সকল কার্যসম্পাদন ও বাস্তবায়নমূলক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে যার ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ণ ঘটেছে এবং অধিদপ্তরগুলোর ওপর তার বৈরী প্রভাব পড়েছে।

(খ) ছোটখাটো ও তুচ্ছ অনেক বিষয় অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলো প্রস্তাবের আকারে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছে। এর ফলে অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলো তাদের দায়িত্ব এড়াচ্ছে। অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানকে জবাবদিহি করা যায় না কেননা তাদেরকে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

(গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অনেক কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ বা কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী না হয়েও বিভিন্ন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর থেকে পাঠানো কারিগরি প্রস্তাবগুলো সরকারী নির্দেশ অমান্য করে পরীক্ষা করেন।

(ঘ) অধিদপ্তর/পরিদপ্তর থেকে প্রেরিত প্রস্তাবগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্নপর্যায়ে গ্রহণ করা হয় এবং পরে সেগুলোকে সিদ্ধান্তের জন্য এক ধাপ করে ওপরে পাঠানো হয়। এ রীতির কারণে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও উভয় প্রান্তেই নথি খোলার প্রয়োজন হয়, আর তাতে বাড়তি জনবল নিয়োগ করতে হয়।

(ঙ) **অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানদের স্বাক্ষর করা প্রস্তাবগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগে তাদের তুলনায় দুই স্তর নিচের কর্মকর্তারা পরীক্ষা করে সেসব বিষয়ে মন্তব্য করেন।**

---

[৫] মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর ভূমিকা (১৯৯৬ সালের কার্যবিধির ১নং তফসিল) নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডে সীমিত থাকবে ঃ (ক) নীতি প্রণয়ন; (খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন; (গ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল্যায়ন; (ঘ) আইন সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি; (ঙ) সংসদে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে তাকে সহায়তা; (চ) শীর্ষস্তরে কর্মী ব্যবস্থাপনা, যেমন (১) সরকারী বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সদস্য/পরিচালকের পদ মর্যাদার এবং সংযুক্ত অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোর বেলায় জাতীয় বেতন স্কেলের ৫ম স্তরের নিচের কোনো কর্মকর্তা নয়; (ছ) মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত অন্যসব বিষয় (ধারা-৪, কার্যবিধি, ১৯৯৬)।

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর কর্মকর্তারা এই রীতিকে তাদের মর্যাদার জন্য অবমাননাকর বলে মনে করেন।

(চ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ পাঠানো ও বারংবার তাগিদ দেয়ার একটা অভ্যাস রয়েছে। এই অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্য অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলোর কাজে অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারীরা নীতি প্রণয়নমূলক ভূমিকায় মনোনিবেশ না করে অনেক লঘু বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তাতেই বেশি সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন।

(ছ) বাস্তবে অধিকাংশ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রধানরা ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের কোনো পদে নিয়োগ দিতে, তাদের দক্ষতা সীমা (efficiency bar) অতিক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশ দিতে অথবা তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন না। বদলির ক্ষেত্রে প্রধানদের এখতিয়ার নবম গ্রেডের কর্মকর্তা পর্যন্ত সীমিত। এ জন্য অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা তাদের পদায়ন, বদলি ও ছুটি মঞ্জুরির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীল এবং এসব বিষয়ের তদ্বিরে তারা যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। এতে তাদের কর্তব্যে অবহেলা ঘটে।

(জ) ১৯৮৫ সালের তুলনায় উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের পরিসর বাড়লেও অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলোর আর্থিক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে। ১৯৯৪-এর ১২ এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক আদেশে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানদের নির্মাণ কাজ ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের/যোগানের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা ৫ কোটি টাকা থেকে ২ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়েছে।

(ঝ) প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সম্পর্কিত সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নিয়োগদানের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়/বিভাগের হাতে ন্যস্ত, যদিও সকল উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব হচ্ছে অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের। এ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কাজের মান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প কর্মচারীদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে।

(ঞ) অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানদেরকে যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন চাইতে হয়। এমনকি, এগুলো বিদ্যমান বিধিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও এবং অনুমোদিত সংস্থাগত কাঠামোতে এবং বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও।

৫.৩৮ বাস্তব প্রয়োগের এই হতাশাজনক চিত্রটি আইনগত কাঠামোতে (অর্থাৎ স্মারক, অধ্যাদেশ, নির্দেশ, প্রবিধান ইত্যাদি) যা পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৫.৩৯ কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে ঃ

ক. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ ঃ

১) কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ যেন তার অধীনস্ত কোন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অন্যান্য আধা-সরকারী অফিসকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে, একইভাবে কোন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর যেন তাদের অধস্তন অফিসগুলোকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপ না করে তা নিশ্চিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (পারমক) কিংবা অন্য কোনো সংস্থা, যা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে তাদের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে পারে।

২) বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জনগণকে পণ্য ও নির্দিষ্ট মানের গ্রাহকমুখী সেবা সরবরাহ প্রদানের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম তৈরি করবেন যাতে গ্রাহকদের প্রতি সংবেদনশীল হবার ও তাদের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা থাকবে। অধিদপ্তর ও তাদের অধস্তন দপ্তরগুলোকে অতঃপর প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থ সম্পদ প্রদান করতে হবে যাতে তারা জনগণকে পণ্য ও সেবার যোগান দিতে পারে।

৩) প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (পারমক) কিংবা অন্য কোনো সংস্থা, যা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, নিম্নস্তরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধিকার অর্পণের বর্তমান পরিস্থিতির একটি সমীক্ষা করে এ ব্যাপারে উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৪) সরকারী পণ্য ও সেবা যোগান দেয় এমন প্রতিটি সরকারী অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাকে তাদের এইসব পণ্য ও সেবা সরবরাহ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য বলা যেতে পারে এবং জনগণের নিকট ঐ সকল প্রতিবেদনের প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা যেতে পারে।

যে সব অধিদপ্তর ও সংস্থা জেলা পরিষদে স্থানান্তরিত হবে

মন্ত্রণালয়	অধিদপ্তর
১. শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ	১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যা) ২. পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর ৩. সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর
৩. যুব, ক্রীড়া, ও মহিলা বিষয়ক	১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২. ক্রীড়া পরিদপ্তর ৩. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

যেসব অধিদপ্তর ও সংস্থা উপজেলা পরিষদে স্থানান্তরিত হবে

মন্ত্রণালয়	অধিদপ্তর
১. শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২. কৃষি	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩. মৎস্য ও পশুসম্পদ	১. মৎস্য অধিদপ্তর ২. পশুসম্পদ অধিদপ্তর
৪.মহিলা বিষয়ক ও সমাজ কল্যাণ	১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর ২. সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর
৫. পরিবেশ ও বন	বন অধিপ্তর (সামাজিক বনায়ন)
৬. স্থানীয় সরকার	১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

অধ্যায় ৬

দুর্নীতি দমন

৬.০১ দুর্নীতি শব্দটি মানুষের কর্মকান্ডের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এবং তা অনেক ধরনের হতে পারে। সরকারী খাতে দুর্নীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা ঘুষ বা কোনো অন্যায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করলে, কারো কাছে তা চাইলে বা জোর করে আদায় করলে ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সমগ্র জনজীবন ও জনপ্রশাসনে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। দুর্নীতি রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক উভয় পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছে – এ দুই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বা উভয়ের যোগসাজশেও দুর্নীতি হয়ে থাকে। দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য অর্থের গোপন লেনদেন সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যকার কাজকর্মে নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ লেনদেন এমন সুপরিকল্পিতভাবে হয়েছে যে, তা এখন প্রায় সবার কাছেই স্পিড মানি, গ্রীজ মানি বা কিকব্যাক (*speed money, grease money,* or *kickback)* ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

৬.০২ জনগণের সাধারণ উপলব্ধি এই যে, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পরিসেবা ও আর্থিক খাতসহ জনজীবনের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলোতে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। দুর্নীতি এখন এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমসমূহ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এবং অনেক উন্নয়ন সহযোগী দুর্নীতি রোধে জরুরী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বেসরকারী খাতে দুর্নীতি

৬.০৩ দুর্নীতি কেবল সরকারী খাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত বেসরকারী খাতও দুর্নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এ দু'টি খাত এক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক। সরকারী খাতে এমন কোনো দুর্নীতি কমই সংঘটিত হয় যাতে বেসরকারী খাত সংশ্লিষ্ট থাকে না, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হোক। জনসাধারণের ধারণা যে, সরকারী দপ্তরগুলো হয়েছে দুর্নীতির উৎসস্থল। বেসরকারী খাত নিজেদের সুবিধা আদায় করতে গিয়ে সরকারী খাতকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

৬.০৪ সরকারের সঙ্গে কাজকর্মে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যিক লেনদেনে বেসরকারী খাত অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিসমূহ কর কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের প্রকৃত সম্পদ বা সঠিক আয়ের বিবরণ ঘোষণা করে না এবং কম কর পরিশোধ করে সরকারকে ফাঁকি দেয়। শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ (dividend) পরিশোধ এড়ানোর জন্য তারা প্রায়শ তাদের ব্যবসায়ের মুনাফার সঠিক হিসাব প্রকাশ করে না এবং জনসাধারণের কাছে শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে অসাধু পন্থার আশ্রয় নেয়।

৬.০৫ বেসরকারী কর্পোরেট খাত ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, বেসরকারী খাতের কোম্পানিসমূহ বড় বড় সরকারী কন্ট্রাক্ট লাভের জন্য ঘুষ দিতে চাপের সম্মুখীন হয়।

৬.০৬ আমদানি ও রপ্তানি কর্মকান্ডে ওভারইনভয়েসিং ও আণ্ডারইনভয়েসিং (over-invoicing and under-invoicing) রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মান ও পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রতারণা দেশে ও বিদেশে বাজার সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৬.০৭ অন্য যে কোনো সংগঠনের মতই আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালনার জন্য তহবিলের প্রয়োজন হয়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিসমূহের কাছ থেকে চাঁদা বা অনুদান গ্রহণ করা একটি স্বাভাবিক চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দল ক্ষমতায় গেলে এ সমর্থন বা সহায়তার জন্য তারা বহুগুণ লাভবান হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের তহবিল সংগ্রহ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হলে এবং তাদের তহবিলের উৎস ও ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ আবশ্যিক না করা হলে, নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং মনোনয়নের ব্যাপারটা তখন নিলামের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। প্রশাসন

ব্যবস্থাও তখন দুর্নীতিগ্রস্তদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী ব্যয়ের সঠিক হিসাব ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তা ঘোষণা করেন না। বর্তমানে নির্বাচনী ব্যয় যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কম বলেই প্রতীয়মান হয়। বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি পর্যালোচনা করে এ ব্যয়ের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং তারপর তা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

৬.০৮ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল–বাংলাদেশ শাখা (টিআইবি) ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে পরীক্ষামূলকভাবে দুর্নীতি বিষয়ে ২৫০০টি পরিবারে যে সমীক্ষা চালায়, তাতে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া যায়:

বক্স ৬.১ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি

পুলিশ ও আদালত

- উত্তরদাতাদের ৯৬% বলেছেন, কোনো সেবা সহায়তা পেতে হলে পুলিশকে টাকা দিতে হয়।
- আদালতে মামলায় জড়িতদের ৬৩% বলেছেন, আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনজীবীদেরকে তাদের ঘুষ দিতে হয়।
- আদালতে মামলায় জড়িতদের ৮৯% বলেছেন, অর্থব্যয় বা প্রভাব খাটানো ব্যতীত আদালতে ন্যায্য ও দ্রুত বিচার লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা

- ৭৪% বলেছেন, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিয়ম-বহির্ভূত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।
- ৪২% বলেছেন, স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ছেলে-মেয়েদের আলাদাভাবে পড়তে না দিলে ভাল ফল লাভ করা কিংবা তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য

- ৪০% জানিয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়।
- হাসপাতালের রোগীদের ৪১% বলেছেন, অতিরিক্ত অর্থ না দিলে তারা তাদের ওষুধ পেতেন না।

ব্যবসা বাণিজ্যের লাইসেন্স

- ৬৫% বলেছেন, লাইসেন্স পাওয়ার জন্য তাদের অর্থ ব্যয় কিংবা প্রভাব খাটাতে হয়েছে।

উপযোগ (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)

- ৩২% লোক অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিদ্যুৎ ও পানির বিল কমানোর ব্যবস্থা করে।
- ৪৭% লোক অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের ওপর নির্ধারিত কর কমানোর ব্যবস্থা করে।

সূত্রঃ টিআইবি

দুর্নীতির কারণ

৬.০৯ এধরনের ব্যাপক দুর্নীতির কারণ সকলের জানাটা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণও। বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে সাধারণত যেসব বিষয়কে ধরে নেয়া হয় সেগুলো হয়েছে: আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা এবং আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও শাস্তির স্বল্পতা। এছাড়া, একদিকে আইন, বিধি ও সংবিধির আধিক্য এবং অন্যদিকে সরকারী কর্মচারীদের

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থেকেও দুর্নীতির উদ্ভব ঘটছে। একচেটিয়া এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (monopoly and discretionary power) দুর্নীতিকে স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে নিতে সাহায্য করে।

৬.১০ বাংলাদেশের সরকারী খাতে অন্য যেসব কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো হয়েছে – কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করার মতো উদ্যোগের অভাব, স্বল্প বেতন এবং চাকরি জীবনে উন্নতির অপর্যাপ্ত সুযোগ। পদোন্নতির জন্য মেধার স্বীকৃতির যথাযথ নীতি অনুসরণ না করে বিধিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতিদানের ফলে কর্মচারীদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে এবং তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। এর ফলে তাদেরকে চাকরি জীবনে উন্নতির জন্য তদবির ও প্রভাব খাটানোর পথ বেছে নিতে হয়েছে।

৬.১১ কর্মচারীরা যখন দেখেন যে, ঊর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা ও শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারী পদমর্যাদাকে ব্যবহার করছেন, তখন সৎ থাকার জন্য নিজেদের উদ্বুদ্ধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেসব কর্মচারী দুর্নীতি বিরোধী, তারা এধরনের পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার অভাবে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।

৬.১২ সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের টেন্ডার মূল্যায়ন, কর নিরূপণ এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের মতো সরকারী কাজকর্মে উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা না থাকার কারণে কখনও কখনও দুর্নীতি দেখা দিতে পারে। কার্যসম্পাদন বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিধি বা পদ্ধতিসমূহও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। অসাধু কর্মচারীরা দুর্নীতি করার জন্য প্রায়ই সেগুলোর সুযোগ গ্রহণ করে।

৬.১৩ নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতেও দুর্নীতির বিস্তার ঘটতে পারে:

(ক) শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সক্রিয় অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি।

(খ) নির্বাচনের সময় ও নির্বাচনের পরে দেয়া অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, যার ফলে সরকারী ব্যয় অনেক বেশি বেড়ে যায়।

(গ) বড় বড় অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ছোটখাটো অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, যার ফলে আইনের চোখে সকলেই সমান বলে যে দাবী করা হয় সেসম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। জনসাধারণের মধ্যে তখন উন্নাসিকতা দেখা দেয় এবং তারা সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

দুর্নীতির প্রভাব

৬.১৪ দুর্নীতির কারণে অনেক দুর্বল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় দেখা দিতে পারে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক বিকাশে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৬.১৫ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষুন্ন করতে পারে। দুর্নীতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের অসমতা দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্বেতহস্তী বলে বিবেচিত যেসব বিনিয়োগ প্রকল্প শুরুর পেছনে আংশিকভাবে হলেও ঘুষের ভূমিকা রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বোঝা তৈরি হতে পারে। দুর্নীতির কারণে ঘুষের খরচটা সেবা ও পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বলে জনসাধারণকে এসবের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে।

দুর্নীতি দমনে বর্তমান ব্যবস্থাদি

৬.১৬ একথা মনে করা ভুল হবে যে, জনপ্রশাসনের মতো আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে যে দুর্নীতি রয়েছে, তার অস্তিত্বের বিষয়টি সরকারের জানা নেই। সরকারী কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে যে আচরণ বিধি রয়েছে, সততার সঙ্গে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে তা অনেকটা সেকেলে ও দুর্বল।

৬.১৭ শৃংখলা বিধি অনুযায়ী দুর্নীতি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকারী তহবিল তসরুফ ও আত্মসাৎ করা চাকরি ও ট্রেজারি বিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য। সিএণ্ডএজি-র যথাযথ নিরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী তহবিল ও সম্পদের আত্মসাত কার্যকরভাবে রোধ করা যেতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সিএণ্ডএজি-র দপ্তর খুবই দুর্বল এবং স্বল্প বেতনভুক ও অদক্ষ সহকারীদের দিয়ে এর কাজকর্ম চালানো হয়েছে। এছাড়া, এ নিরীক্ষা চালানো

হয় লেনদেন সংঘটিত হওয়ার ৪ থেকে ৬ বছর পর এবং ততোদিনে তা জবাবদিহিতার একটি হাতিয়ার হিসেবে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে।

৬.১৮ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্নীতি দমন ব্যুরো (বিএসি) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনপ্রশাসনে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করা হয়।

দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতার কারণসমূহ

৬.১৯ দুর্নীতি রোধের জন্য বিদ্যমান নানা প্রতিষ্ঠান, কার্যবিধি এবং সরকারী কর্মচারীদের আচরণ বিধিসমূহ স্বাধীনতা-পূর্ব আমল থেকেই চলে আসছে; তবে অতীতে মাঝে মাঝে এগুলো কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে।

৬.২০ বাংলাদেশে জনপ্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার অন্যতম কারণ হয়েছে জবাবদিহিতার অভাব। অন্য একটি প্রধান কারণ হয়েছে স্বচ্ছতার অভাব। অফিস-আদালতে শৃংখলার অবনতি, জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারের অভাব এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে অদক্ষতা ও ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে।

৬.২১ দুর্নীতি দমনের সরাসরি দায়িত্বে রয়েছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো, কিন্তু অদক্ষতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য এর যে দুর্নাম রয়েছে, সেজন্য মানুষের কাছে এ সংস্থার ভাবমূর্তি খুবই অনুজ্জ্বল। সংস্থাটি জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, এবং সাধারণভাবে এটি অকার্যকর বলে বিবেচিত। দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিপুল সংখ্যক মামলা সামাল দিতে, এর অভ্যন্তরে দুর্নীতির কার্যকলাপ রোধ করতে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে অক্ষম।

৬.২২ দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হয়েছে ন্যায়পাল-এর দপ্তর যা অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেমন, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে ভালভাবে কাজ করছে। যুক্তরাজ্যেও ন্যায়পাল পদ্ধতি সফল হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭(১) অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭২(২)-এ বলা হয়েছে যে, ন্যায়পাল যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং কার্যাদি সম্পাদন করবেন, সেগুলো জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেবে। এগুলোর মধ্যে থাকবে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকর্তা কিংবা বিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত কোনো পদক্ষেপ বা কাজের বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা। জনগণের অভিযোগ তদন্তের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। জনসেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নয়নে এ দপ্তরের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা দুর্নীতি রোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

৬.২৩ অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে ক্রিমিনাল জাস্টিস কমিশন (সিজেসি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার প্রধান কাজ হয়েছ পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির তদন্ত করা, প্রয়োজনবোধে সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেয়া এবং সরকারী খাতের দুর্নীতির বিষয় যারা ফাঁস করেন তাদের সমর্থন দেয়া। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীতে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, তার প্রেক্ষিতে কুইন্সল্যাণ্ডের মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। **বাংলাদেশে পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসদাচরণ, হয়রানি এবং পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পুলিশ বিভাগও তার নিজের লোকদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেসি পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়া এবং একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ব্যবস্থার অভাব পুলিশী ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহারের অন্যতম কারণ।** বস্তুত, ম্যাজিস্ট্রেসি-প্রধানের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এখন পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছ। জনমনে ব্যাপক আশংকা রয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেসির প্রাধান্য সম্বলিত ব্যবস্থা কার্যকর করা না হলে পুলিশের বাড়াবাড়ি আরো বৃদ্ধি পাবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

৬.২৪ দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন। সাধারণভাবে মতৈক্য রয়েছে যে, অন্যায়কারীকে শাস্তি দেয়া ছাড়াও এমন একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা উচিত যা অন্যায় কাজ রোধ ও নিরুৎসাহিত করবে। দুর্নীতির দমন সূচনা লগ্ন থেকেই করতে হবে। কারণ, সরকারী চাকরি ও বেসরকারী স্বার্থান্বেষীদের মধ্যে এমন অনেক পারস্পরিক বিষয় থাকে, যেগুলো থেকে এধরনের অপকর্ম বা দুর্নীতির উৎপত্তি হয়। পারস্পরিক সংযোগের এ স্থানগুলোকে কেবল আইন করে দুর্নীতি বা অনিয়মযুক্ত করা যাবে না। উভয়পক্ষের সংশ্লিষ্ট লোকদের আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব।

৬.২৫ দুর্নীতি দমনের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহকে জনপ্রশাসন কাঠামোর ভিতরেই সন্নিবেশিত করে নিতে হবে। তদারকি ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতার ক্রমবৃদ্ধি, চাকরিতে নিয়োগের সময় ও তারপর প্রতি বছর সরকারী কর্মচারীদের সম্পদের ঘোষণা দেয়া ও শ্রীলংকার মত তা জনগণের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপঢৌকন ও সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। যুক্তরাজ্যের মতো মন্ত্রী/রাজনীতিকদের জন্যও একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৬.২৬ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোও সহায়ক হতে পারে:

(ক) সুশীল সমাজের সঙ্গে আন্তঃসক্রিয় সম্পর্ক (interactive relation) গড়ে তোলা এবং সরকারী কর্মচারীদের আপত্তিকর আচরণের জন্য অভিযোগ দায়ের, দ্রুত তদন্তের পর জবাব ও প্রতিকার লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(খ) স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সততা ও জবাবদিহিতার উপর জোর দেওয়া।

(গ) একক বা অবিভক্ত দায়িত্বের (undivided responsibility) পদ্ধতি এবং ব্যর্থতার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট নাগরিক এবং সংবাদপত্রসমূহকে অবাধে তথ্য লাভের সুযোগ প্রদান।

(ঙ) সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার নাগরিক নিরীক্ষা (*citizens' audit*) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজের নিরীক্ষা হওয়া উচিত এবং এ নিরীক্ষায় মানসম্মত নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে কর্মকর্তাদের কাজ যাচাই করে দেখতে হবে।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো

৬.২৭ দুর্নীতি দমন ব্যুরো একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। ব্যুরো-র প্রধান নির্বাহী বা মহাপরিচালক (ডিজি) এবং অধিকাংশ উর্ধতন কর্মকর্তাকে প্রধানত বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক সার্ভিস থেকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। ব্যুরো নিজে কেবল কয়েক ধরনের জুনিয়র অফিসার ও স্টাফ (কনস্টেবল ও কয়েকজন পরিদর্শক ব্যতীত) নিয়োগ করে থাকে। ব্যুরো-র অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই লোকের মতো যাকে হাত বেঁধে সাতারে নামতে বলা হয়েছে।

৬.২৮ উচ্চতর পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে ব্যুরো মহাপরিচালকের সুযোগ সীমিত। সার্বিকভাবে ব্যুরো জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশকে যে দুর্নীতির স্রোত গ্রাস করছে, তা দমনের জন্য এ সংস্থার জায়গায় একটি নতুন, গতিশীল ও কার্যকর সংস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৬.২৯ ব্যুরো-র ৮টি আঞ্চলিক ও ৬৬টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর রয়েছে এবং এর উপ-পরিচালকরা হয়েছেন আঞ্চলিক দপ্তরগুলোর প্রধান। জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা এবং প্রধান কার্যালয়ের দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাগণ একই পর্যায়ের। পরিদর্শকগণ তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করেন। পদমর্যাদার দিক থেকে তারা অপেক্ষাকৃত জুনিয়র। দুর্নীতি দমন অফিসগুলোর কর্মকাণ্ড জনজীবন থেকে তুলনামূলকভাবে দূরে পরিচালিত এবং গোপন ধরনের। একারণে সংস্থাটির কাজেকর্মে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং এর পুনর্গঠন প্রয়োজন।

ব্যুরো-র কার্যপদ্ধতি

৬.৩০ নিম্নোক্ত নকশায় ব্যুরো'র কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

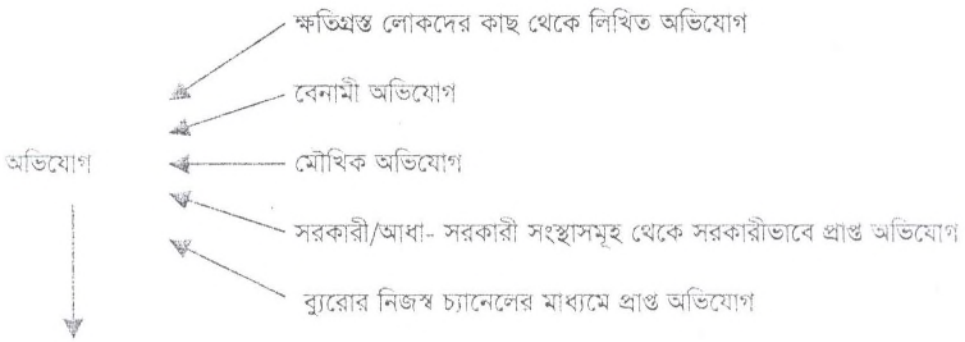

অভিযোগ বাছাই → উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমতি নিয়ে তদন্ত → উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমোদন নিয়ে এজাহার (এফআইআর) দায়ের → তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ → সরকারী কৌসুলি (পিপি)-র মতামত নিয়ে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রণয়ন → চার্জশীট প্রদান বা মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি গ্রহণ → বিচারের জন্য চার্জশীট দাখিল।

ব্যুরো-র পরিচালন সমস্যা

৬.৩১ উপরে ব্যুরো-র কার্যপদ্ধতির বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে এর পরিচালন প্রক্রিয়ার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে যত দ্রুত সম্ভব অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও নিরীহ ব্যক্তিদের অযথা হয়রানি ও অবিচার এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়া। উপরের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, ব্যুরো-র কার্যপদ্ধতিটি আমলাতান্ত্রিক ও অস্বচ্ছ। তদন্ত শুরু করা, এজাহার দায়ের ও চার্জশীট প্রদানের জন্য অনুমোদন গ্রহণ সময়সাপেক্ষ এবং এ কারণে তা মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য অনুকূল নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপের সংখ্যা যত বেশি হবে, বিলম্বও তত বেশি হবে। এর ফলে দুর্নীতি আরো বাড়বে। এক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যুরো-র ভূমিকা সীমিত এবং কোনো বিলম্ব ঘটলে সংস্থাটি এ ব্যর্থতার দায়িত্ব উচ্চতর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

৬.৩২ ব্যুরো-র বর্তমান কার্যপদ্ধতি যে সন্তোষজনক নয়, তা নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ থেকেই নিরূপণ করা যেতে পারে:

(ক) ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার গড় হার ছিল মাত্র ১৯.৪১ শতাংশ।

(খ) অপরদিকে, এ পাঁচ বছরে যাদের নামে চার্জশীট দেয়া হয়, তাদের মধ্যে বেকসুর খালাস প্রাপ্তের গড় হার ৫৬.৯৬ শতাংশ।

৬.৩৩ ব্যুরো-র দেয়া উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যুরোর তদন্ত, অনুসন্ধান, অনুমোদন গ্রহণ ও মামলা দায়ের পর্যায়সমূহে অনেক সমস্যা রয়েছে এবং একারণে প্রতি বছর মামলার সংখ্যা বাড়ছে। এ পরিস্থিতির জন্য অনেক কারণ দেখানো যেতে পারে, তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি স্তরে বিলম্ব, যার জন্য কোনো জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। তদন্তকারী কর্মকর্তার সংখ্যাল্পতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততার চাইতে বরং অনেক ক্ষেত্রে বিলম্ব ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয় বলে মনে হয়।

৬.৩৪ উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ব্যুরো-র অকার্যকারিতা ও ব্যর্থতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়েছে অভিযুক্তদের খালাস দেয়ার উচ্চ হার। বাদী পক্ষের ব্যর্থতার প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে: প্রথমত, অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের কারণে তদন্ত পর্যায়ে মামলার দুর্বল গঠন এবং দ্বিতীয়ত, আদালতে মামলার পক্ষে দুর্বল যুক্তি-প্রমাণ

উপস্থাপন, যার মধ্য দিয়ে সরকার পক্ষের কৌসুলির যোগ্যতার অভাব ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। আদালতে অন্যান্য মামলা নিয়ে ব্যস্ততার কারণে সরকারী কৌসুলিকে যথাসময়ে না পাবার কারণেও মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্ব ঘটছে।

৬.৩৫ ব্যুরো-র রেকর্ডে দেখা যায়, তদন্ত, অনুসন্ধান ও অনুমোদন গ্রহণের পর্যায়সমূহে বিলম্বের পরিমাণ ৯ বছর পর্যন্ত হওয়ার নজীরও রয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এতে ৫ থেকে ৭ বছর লেগে যায় (চৌধুরী, জুলাই, ১৯৯৩)।

ব্যুরো-র সাংগঠনিক সমস্যা

৬.৩৬ ব্যুরো-র কর্মচারী নিয়োগ, কার্যপদ্ধতি ও সাংগঠনিক কাঠামোতে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

(ক) যেসব কর্মকর্তাকে প্রেষণে ব্যুরো-তে নিয়োগ দেয়া হয়, তারা সাধারণত এ নিয়োগে খুশি হননা। জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ভাল না থাকায় তারা বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং হতাশায় ভোগেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের বাছাই করা হয় না বলে এর ফল অসন্তোষজনক হতে বাধ্য।

(খ) ব্যুরোর দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্তদের বিচার স্পেশাল জজের আদালতে অনুষ্ঠিত হয়, যারা প্রকৃতপক্ষে জেলা ও দায়রা জজ। কিন্তু ব্যুরোর মামলা ছাড়াও অন্যান্য প্রচুর মামলা তাদের হাতে থাকার কারণে স্পেশাল জজদেরকে বস্তুত ব্যুরো-র জন্য খণ্ডকালীন কাজ করতে হয়। ব্যুরো-র নিজস্ব কোনো সরকারী কৌসুলি (পিপি) নেই বলে মামলা পরিচালনাতেও সেই একই অবস্থা চলে। ব্যুরোকে জেলা ও দায়রা জজের আদালতে কর্মরত পিপি-দের উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু মামলা পরিচালনার জন্য তাদেরকে সব সময় পাওয়া যায় না।

(গ) ব্যুরো-র আধুনিক অফিস সরঞ্জাম, বিশেষ করে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার-ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা হয়েছ। ব্যুরো-তে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত ফ্যাক্স, টেলেক্স কিংবা কম্পিউটার বসানো হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের গৃহীত সাক্ষাৎকার, জিজ্ঞাসাবাদ বা জবানবন্দী অডিও বা ভিডিও পদ্ধতিতে রেকর্ড করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

(ঘ) ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তারা লোকজনকে হয়রানি করেন বলে যে অভিযোগ রয়েছে, তা বন্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এ সংস্থায় বস্তুত কোনো কার্যকর তদারকি বা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই।

তদন্তকারী কর্মকর্তার মান

৬.৩৭ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্তকারী কর্মকর্তাদের পরিদর্শক বলা হয় – যারা নিম্নপদ থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ঐ অবস্থানে পৌছেন। এদের কেউ কেউ কনস্টেবল হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। এদের দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং সাধারণত এদেরকে পুলিশ বিভাগ থেকে নেওয়া হয়, যে **বিভাগকে ইতোমধ্যেই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যুরোর পরিদর্শকরা অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাকে হয়রানি করার জন্য প্রায়শ তাদের দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন, তাদেরকে দুর্নীতি দমন মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দেন।** সুশীল সমাজ ও খোদ ব্যুরোর যেসব লোকজনের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে, তারা এই পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল)।

৬.৩৮ কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক. অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১) **ন্যায়পাল নিয়োগ** - বিষয়ক কমিশনের চতুর্থ সুপারিশে প্রযোজনীয় জনবল ও অবকাঠামোসহ ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি ও দপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রস্তব করা হয়েছে।

২) কমিশনের ছাব্বিশতম অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশে নিম্নোক্ত কাঠামো অনুযায়ী **একটি নতুন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের** কথা বলা হয়েছে:

(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান হবেন একজন কমিশনার (সচিব পদমর্যাদার), তাকে সহায়তা করবেন দুজন অতিরিক্ত কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)। সৎ, দক্ষ ও বিবেকবান কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তিন বছর মেয়াদের জন্য কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারদের নিয়োগ করা হবে। এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র গুরুতর অসদাচরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদেরকে বদলি বা অপসারণ করা যাবে।

(খ) কমিশন চুক্তিভিত্তিতে যোগ্য তদন্তকারী অফিসার এবং মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে।

(গ) সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার যেকোনো কর্মচারী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ বেসরকারী খাতের যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের পূর্ণ ক্ষমতা এ কমিশনের থাকবে।

(ঘ) কমিশনের দুটি বিভাগ থাকবে:

(ক) পরিচালন (অপারেশনাল) বিভাগ এবং (খ) প্রতিরোধ (প্রিভেন্টিভ) বিভাগ। পরিচালন বিভাগের দায়িত্ব হবে তদন্ত এবং বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিরোধ বিভাগ জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাবে এবং অন্যান্য কৌশলগত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) **দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।** এ পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যাবলী ও ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্তি ৬.১ এ দেওয়া হয়েছে।

(চ) কমিশনকে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যেমন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তদন্ত শুরু ও এজাহার পেশ করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে।

(ছ) কমিশন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং এ বিভাগ এ ব্যাপারে সকল সহায়তা প্রদান করবে।

(জ) সদর দপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারকে সভাপতি করে দুর্নীতি দমন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে এসব কমিটি গঠিত হতে পারে। কমিটিসমূহ সময় সময় তাদের নিজ নিজ এলাকায় দুর্নীতি রোধের জন্য পরিষদের কাছে সুপারিশ পেশ করবে। এসব কমিটিকে উপদেষ্টা পরিষদের এখতিয়ারের বাইরে সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন দেয়ার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

খ. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১) পরিহারযোগ্য বিলম্ব এড়িয়ে অচিরেই ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

২) একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য বিকল্প স্থান ও উৎস থেকে সরকারী সেবা গ্রহণের সুযোগ নাগরিকদের দিতে হবে।

৩) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যে ক্ষেত্রেই সম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে কমাতে ও পরিহার করতে হবে। অনুমোদিত ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের নীতিগুলির পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে।

৪) প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দুর্নীতি দমন আইনগুলিকে দৃঢ় ও সংহত করতে হবে। দুর্নীতির অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে আইনগত যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করার লক্ষ্যে গঠিত আইন কমিশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বলা যেতে পারে।

৫) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে তার সংক্ষুদ্ধতা নিরসনের জন্য সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিলের সত্যায়িত কপি সরবরাহ করতে হবে।

৬) অসদুপায়/দুর্নীতির সুযোগ কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারের উচিত সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর (যেমন, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ) একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বেসরকারী কোম্পানি গঠনের সুযোগ দেওয়া।

গ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সকল সরকারী কর্মচারীর জন্য একটি আধুনিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে। অনুরূপভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্বাচিত কর্মকতাদের (elected officials) জন্য আচরণ বিধি তৈরি করতে পারে।

২) সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়/বেসরকারী খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জন্য একটি আচরণবিধি গ্রহণে সম্মত করাতে পারেন যা লঙ্ঘিত হলে তাদেরকে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

৩) সকল আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার এবং এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার রাজনৈতিক দলসমূহের চাঁদা সংগ্রহ ও অনুদান গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করতে পারেন'। সরকার জাতীয় সংসদে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ীও নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে তহবিল প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারেন ।

৪) দুর্নীতি দমনে একটি স্বাধীন কমিশন (Independent Commission Against Corruption- ICAC) গঠন করা যেতে পারে, যাতে একজন চেয়ারম্যান (একজন বিশিষ্ট নাগরিক), তিনজন পূর্ণকালীন সদস্য (সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক, একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা) এবং তিন জন খণ্ডকালীন সদস্য (মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও সিএণ্ডএজি) থাকবেন। পদমর্যাদা ও অবস্থান নির্বিশেষে দেশের যেকোনো কর্মকর্তা ও নাগরিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের পূর্ণ ক্ষমতা আইসিএসি-র থাকবে। কোনো কর্মকর্তা বা নাগরিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করার পর আইসিএসি পরবর্তী কার্যপন্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে (অর্থাৎ, মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিল/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশের ব্যাপারে এগিয়ে যাবে কিনা সে বিষয়ে)।

নির্বাচন কমিশনের ন্যায় আইসিএসি একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। আইসিএসি গঠিত হলে তারা নিজেরাই তাদের লোক নিয়োগ করবে। এ কমিশন প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রতিযোগিতামূলক বেতনে চুক্তিভিত্তিতে এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করবে এবং দেশের দুর্নীতি পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। বর্তমান দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আত্মীকরনের বিষয়ে আইসিএসি -সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আইসিএসি-র দুটি প্রধান কাজ থাকবে– দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতির তদন্ত করা এবং জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে দুর্নীতি রোধ করা।

৫) **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অসদাচরন এবং দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য একটি ফৌজদারী বিচার কমিশন (Criminal Justice Commission-CJC) গঠন করা যেতে পারে।** একজন চেয়ারম্যান (সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের একজন বিচারক) এবং ৪ জন খণ্ডকালীন কমিশনারকে নিয়ে সিজেসি গঠন করা যেতে পারে। নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারে আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে এমন একজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে খন্ডকালীন কমিশনারদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। অন্য তিনজন হতে পারেন এমন ব্যক্তিত্ব যাদের সমাজ বিষয়ে আগ্রহ ও যোগ্যতা রয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত একজনের কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। সিজেসি-র এখতিয়ার বা কার্যপরিধি হবে প্রধানত নিম্নরূপ:

   (ক) পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করা,

   (খ) পুলিশ সার্ভিসের ফৌজদারি প্রশাসনের মনিটরিং, পর্যালোচনা এবং কারাগার সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং

   (গ) যেসব ফৌজদারী বিচার কাজ পুলিশ কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থা কার্যকরভাবে বা যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে পারবে না, সেগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ।

৬) নাগরিকদেরকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ এবং দক্ষ ও স্বচ্ছ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনে এগিয়ে যেতে হবে।

৭) নাগরিকদের অযথা বিড়ম্বনা ও এ কারণে নানা ধরণের অপব্যবহার এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সরকার তার অমৌল (non-core) কাজ/কর্মতৎপরতাসমূহ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিতে পারেন।

উপদেষ্টা কাউন্সিল (বোর্ড)

১. কমিশনের দায়িত্ব/কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন/তদারকির স্বার্থে

(১) দুর্নীতি দমন ব্যুরোর বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে আইনের আওতায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা যেতে পারেঃ

ক) সুপ্রীম কোর্টের আপীল/হাইকোর্ট বিভাগের একজন কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি অথবা সরকারের একজন কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা	চেয়ারম্যান
খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য-সচিব, পদাধিকারবলে	সদস্য
গ) একজন বিশিষ্ট আইনজীবী	সদস্য
ঘ) বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)/বেসরকারী খাতের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
ঙ) হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী/বিশেষজ্ঞ একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট (Chartered Accountant) বা একজন এমবিএ	সদস্য
চ) একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ/নাগরিক	সদস্য
ছ) কমিশনার	সদস্য-সচিব

(১) উপ-অনুচ্ছেদ (১) -এর দফা (ক) এবং (গ) থেকে (চ) -এ উল্লেখিত প্রতিনিধিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(২) উক্ত কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত পরিপত্র/আদেশ/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদির অধিকতর সংশোধন করে নিম্নরূপ করা যেতে পারেঃ-

ক) এ কাউন্সিল সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সদস্য, অন্য কোন সাংবিধানিক পদধারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পর্যালোচনাক্রমে প্রকাশ্য অনুসন্ধানসহ এজাহার দায়ের বা মামলা রুজুর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট সুপারিশ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

খ) সরকারের যুগ্ম-সচিব ও তদুর্ধ্ব এবং আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০/- ১৪,৩০০/টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রকাশ্য অনুসন্ধানসহ এজাহার দায়ের বা মামলা রুজুর বিষয়ে এ কাউন্সিল অনুমতি প্রদান করবে। তবে, বর্তমানের ন্যায় অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, ইউপি

চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রকাশ্য অনুসন্ধান এবং এজাহার দায়ের বা মামলা রুজুর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

গ) এ কাউন্সিল নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত শেষে চার্জশীটের মঞ্জুরী ও মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবে:

১) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের প্রাক্তন এবং বর্তমান সদস্য, মন্ত্রীবর্গ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়াম্যান ও সদস্য এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা সাংবিধানিক পদধারী অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

২) সকল সরকারী কর্মকর্তা যারা ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯,৫০০/- ১২,১০০/- টাকা স্কেলে অথবা তদূর্ধ্ব বেতনক্রমে এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে অনুরূপ বেতনক্রমে (করেসপন্ডিং স্কেল) অথবা তদুর্ধ্ব বেতনক্রমে নিযুক্ত।

৩) সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য/চেয়ারম্যান/গভর্ণর/ট্রাস্টি যে নামেই তারা অভিহিত হোন না কেন।

উপরোল্লিখিত (গ) (১) - (৩) ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) যে কোন গণকর্মচারী বা নাগরিক বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাদেরকে উপরে উল্লেখ করা হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কাউন্সিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

ঙ) এ কাউন্সিল সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সকল সরকারী, আধা-সরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত না হলে সমাপ্তকৃত তদন্ত পর্যালোচনা করবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ/তদন্ত প্রমানিত না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এককভাবে উপদেষ্টা কাউন্সিলকে দেয়া যেতে পারে।

চ) উপরে উল্লেখিত সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং জারীকৃত সকল পরিপত্র/আদেশ/প্রজ্ঞাপন বাতিল করে গেজেটের মাধ্যমে নতুন পরিপত্র/আদেশ/প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ, গণকর্মচারী ও অন্য যে কোনো ব্যক্তির সম্পদ ও দায় দেনা সম্পর্কিত হিসাব বিবরণী দাখিলসহ অন্যান্য বিষয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/আদেশ -এ উল্লেখিত এখতিয়ার কতিপয় ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রেখে সংযুক্ত ১টি পরিপত্র এবং ১টি আদেশ জারী করা যেতে পারে।

ছ) প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

জ) কমিশনার তার গৃহীত সকল কার্যক্রম কাউন্সিলকে অবহিত করবে।

প্রস্তাবিত পরিপত্র

বাংলাদেশ গেজেটের ১ম খন্ডে, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখের পরিপত্র নং ২১.৪০.৪.১.০.১১.৯৯-৩৯৭(৫০) বাতিল করে গণকর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ গোপন অনুসন্ধান, প্রকাশ্য অনুসন্ধান ও মামলা রুজুর এখতিয়ার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে:

বিষয় ঃ গণকর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান ও মামলা রুজু বিষয়ক এখতিয়ার।

ক্রমিক নং	বিষয়/কার্যক্রম	গণকর্মচারীর তালিকা	বর্তমানে এখতিয়ার	প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১।	গোপন অনসন্ধানের অনুমতি	সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সকল সরকারী, আধা-সরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী।	মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন
২।	প্রকাশ্য অনুসন্ধানের অনুমতি	(ক) সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সদস্য, অন্যকোন সাংবিধানিক পদধারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।	প্রধানমন্ত্রী	উপদেষ্টা কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী।
		(খ) সরকারের যুগ্ন-সচিব ও তদূর্ধ্ব এবং আধা-সরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০-১৪,৩০০ টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।	মুখ্য সচিব	উপদেষ্টা কাউন্সিল
		(গ) অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং অন্যান্যর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।	মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন
৩।	এজাহার দায়ের বা মামলা রুজু	(ক) সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সদস্য, অন্যকোন সাংবিধানিক পদধারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে মামলা রুজু।	প্রধানমন্ত্রী	উপদেষ্টা কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী।
		(খ) সরকারের যুগ্ন-সচিব ও তদূর্ধ্ব এবং আধা-সরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০-১৪,৩০০ টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু।	মুখ্য সচিব	উপদেষ্টা কাউন্সিল
		(গ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (যুগ্ন-সচিবের নীচে) এবং আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০-১৪,৩০০ টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেল এর নিম্ন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনার, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু।	মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রস্তাবিত আদেশ

বাংলাদেশ গেজেটের ১ম খন্ডে, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৮ই আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখের পরিপত্র নং ২১.৪০.৪.১.০.১১.৯৯-৩৯৬ বাতিলক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ, গণকর্মচারী ও অন্য যে কোন ব্যক্তির সম্পদ ও দায়দেনা সম্পর্কিত হিসাব বিবরণী দাখিল, এজাহার দায়ের, চার্জসীট দাখিল ও মামলা প্রত্যাহারের এখতিয়ার নিম্নবর্ণিতভাবে পুনঃনির্মারণ/নির্ধারণ করা যেতে পারে ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়/কার্যক্রম	গণকর্মচারীর/অন্যান্য নাগরিক	বর্তমানে এখতিয়ার	প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১।	সম্পদ বিবরণী প্রদানের নোটিশ জারী	(ক) জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭-এর ৯,৫০০-১২,১০০ টাকা অথবা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেল ও তদূর্ধ্ব স্কেলের কর্মকর্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সম্পদ ও দায় দেনার হিসাব বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারীর অনুমোদন।	প্রধানমন্ত্রী	উপদেষ্টা কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী।
		(খ) জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭-এর ৯,৫০০-১২,১০০ টাকা অথবা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেলের নীচের সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সম্পদ ও দায় দেনার হিসাব বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারীর অনুমোদন।	মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	উপদেষ্টা কাউন্সিল
		(গ) সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, সকল কর্মচারা ও অন্য যেকোন ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সম্পদ ও দায় দেনার হিসাব বিবরণী নোটিশ জারীর অনুমোদন।	প্রধানমন্ত্রীর সচিব	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন
২।	এজাহার দায়ের বা মামলা রুজু	(ক) সাবেক রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সদস্য, অন্য কোন সাংবিধানিক পদধারী, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন।	প্রধানমন্ত্রী	উপদেষ্টা কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী।
		(খ) সরকারের যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব এবং আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০-১৪,৩০০ টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের বেতনভুক্ত ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন।	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালায়।	উপদেষ্টা কাউন্সিল
	এজাহার দায়র বা মামলা রুজু	(গ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিবের নীচে) এবং আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেল এর ১২,৯০০-১৪,৩০০ টাকা বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সমপর্যায়ের স্কেল এর নিম্ন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনার, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন।	মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন
৩।	চার্জশীটের মঞ্জুরী ও.মামলা প্রত্যাহারের অনুমোদন	১. ৩নং কলামের ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মচারী ব্যতীত বাংলাদেশ রেলওয়েসহ যেকোন সরকারী অফিসে কর্মরত অথবা সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা অলবা অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল ৩য় অথবা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।	বিভাগীয় কমিটি	অপরিবর্তিত
		২. ৩নং কলামের উপরোক্ত ১নং ক্রমিকে বর্ণিত যে কোনও অফিসে মাষ্টার রোল অথবা ওয়ার্ক চার্জড অথবা কন্টিজেন্ট স্টাফ হিসাবে কর্মরত ব্যক্তি।	-ঐ-	-ঐ-

		৩. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অর্ন্তগত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং পৌরসভার কমিশনারবৃন্দ।	-ঐ-	-ঐ-
		৪. নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সচিবালয়/অধিদপ্তরগুলিতে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মচারী ঃ	দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন
		(ক) বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগসমূহ।		-ঐ-
		(খ) সংসদ সচিবালয়।		-ঐ-
		(গ) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়।		-ঐ-
		(ঘ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।		-ঐ-
		(ঙ) মহা হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষকের কার্যালয়।		-ঐ-
		(চ) সরকারের পরিদপ্তরসমূহ যার প্রধান পরিচালক অথবা মহাপরিচালক যাই হোক না কেন।		-ঐ-
		(ছ) সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং অধীনস্থ কার্যালয়ের সদর দপ্তর।	-ঐ-	-ঐ-
		(৫) ৩নং কলামের উপরোক্ত ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত অফিসসমূহে মাষ্টার রোল বা ওয়ার্ক চার্জড অথবা কন্টিজেন্ট স্টাফ হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।	-ঐ-	-ঐ- -ঐ-
		(৬) সরকারের সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা।	-ঐ-	-ঐ-
		(৭) সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারগণ এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানবৃন্দ।	-ঐ-	-ঐ-
		(৮) সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা যারা ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯,৫০০- ১২,১০০ টাকা স্কেলের নীচের বেতনক্রমে নিযুক্ত অথবা সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রচলিত অনুরূপ বেতনক্রমের (করেসপন্ডিং স্কেল) নীচের বেতনক্রমে নিযুক্ত।	মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	উপদেষ্টা কাউন্সিল
৪।	চার্জশীটের মঞ্জুরী ও মামলা প্রত্যাহারের অনুমোদন।	(৯) সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর সকল কর্মকর্তা (৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ব্যতীত)। তবে উক্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান/গভর্ণর/ট্রাস্টি যে নামেই তারা অভিহিত হন না কেন তাঁরা ব্যতীত।	মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	উপদেষ্টা কাউন্সিল
		(১০) সকল সরকারী কর্মকর্তা যারা ১৯৯৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯,৫০০-১২,১০০ টাকা স্কেলে অথবা তদূর্ধ্ব বেতনক্রমে এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে অনুরূপ বেতনক্রমে (করেসপন্ডিং স্কেল) অথবা তদূর্ধ্ব বেতনক্রমে নিযুক্ত।	প্রধানমন্ত্রী	উপদেষ্টা কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী
		(১১) সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থানীঠ কর্তৃপক্ষ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য/চেয়ারম্যান/গভর্ণর/ট্রাস্টি যে নামেই তারা অভিহিত হন না কেন।	-ঐ-	-ঐ-
		(১২) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের	-ঐ-	-ঐ-

প্রাক্তন এবং বর্তমান সদস্য, মন্ত্রীবর্গ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্য কোন ব্যক্তি যারা সাংবিধানিক পদধারী অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।		
(১৩) যে কোন গণকর্মচারী যাদের নাম এই কলামে (৩নং কলাম) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।	প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	উপদেষ্টা কাউন্সিল
(১৪) বাংলাদেশের অন্য যে কোন নাগরিক যার নাম উপরের ১-১৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত হয়নি।	মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো	কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন

অধ্যায় ৭

অপচয় হ্রাস ও অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার মান উন্নয়ন

৭.০১ সরকারী সংস্থাসমূহে দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত একটি বিষয় হয়েছে অপচয়। কমিশনকে এর কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য এবং অপচয়কারী খাতসমূহ চিহ্নিত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে অপচয় রোধ ও জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা যায়। প্রায় সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানেই যে অপচয় হয়েছে, সে ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন। সরকার এই বিষয়গুলো নিরসনে আগ্রহী এবং সেজন্য এগুলোকে অপরিহার্য জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রেখেছেন।

৭.০২ **অপচয় দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতি; এর মধ্য দিয়ে অদক্ষতা, অসাধু নানা পন্থা, দুর্বল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার অভাব প্রতিফলিত হয়।** সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে অপচয়ের প্রধান কারণগুলো নকশা ৭.১ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অপচয়ের উৎপত্তি হয় শৈথিল্যের পরিবেশ, দায়িত্বের স্বল্পষ্টতা, দুর্বল নেতৃত্ব ও স্বচ্ছতার অভাব থেকে। ঝামেলাপূর্ণ ও দুর্বোধ্য নানা পদ্ধতি, সেকেলে নিয়মকানুন, পণ্যসামগ্রীর হিসাব-বিবরণী ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব এবং সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবহারে দুর্বলতার কারণে প্রশাসনিক সংস্থা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান– সর্বত্র অপচয় বা অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটে যায়েছে।

অপচয়ের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

৭.০৩ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন অনুযায়ী সকল সরকারী খাতে অপচয়ের ধরন ও বৈশিষ্ট্যে তারতম্য দেখা যায়। অপচয়ের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর কয়েকটি হয়েছে: আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সরকারী পণ্য ও সেবা সংগ্রহ, সরকারী চাকরিতে প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, মানব সম্পদ পরিকল্পনা ও পেশাগত উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সরকারী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।

আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সরকারী মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ

৭.০৪ ব্যাংক, উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, প্রস্তুতকারী সংস্থা, কৃষি সংস্থা, জন-উপযোগমূলক সংস্থা (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস), মাল্টি-মডাল পরিবহন ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশে মোট ১৭৩টি স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত এবং রাষ্ট্রমালিকানাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই লোকসানজনক এবং এগুলো অযোগ্য ব্যবস্থাপনা; স্বল্প দক্ষ, রাজনীতিতে জড়িত জঙ্গী কর্মচারী; অযৌক্তিক ওভারটাইম ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদানের সমস্যায় ভারাক্রান্ত। এদের কোনো স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতাও নেই।

৭.০৫ উপযোগমূলক যেসব কোম্পানি গ্রাহকদের সেবা প্রদান করছে, সেগুলো দুর্বল পরিচালনা ব্যবস্থাপনা, চুরি, ও দুর্নীতির কারণে বিপুল পরিমাণ লোকসান দিয়েছে। তারা গ্রাহকদের দেয়া অর্থের বিনিময়ে কাঙ্খিত সেবা দিয়েছে না এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রার্থীদের প্রচুর দুর্ভোগও পোহাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহও এরকম ও ভিন্ন প্রকৃতির নানা সমস্যার সম্মুখীন, বিশেষ করে সেকেলে প্রযুক্তি, চলতি মূলধনের ঘাটতি ও কম উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির কারণে। এর ফলে বর্তমান বাজার অর্থনীতির পরিবেশে সেগুলো অলাভজনক এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

অপচয়ের দুষ্টচক্র

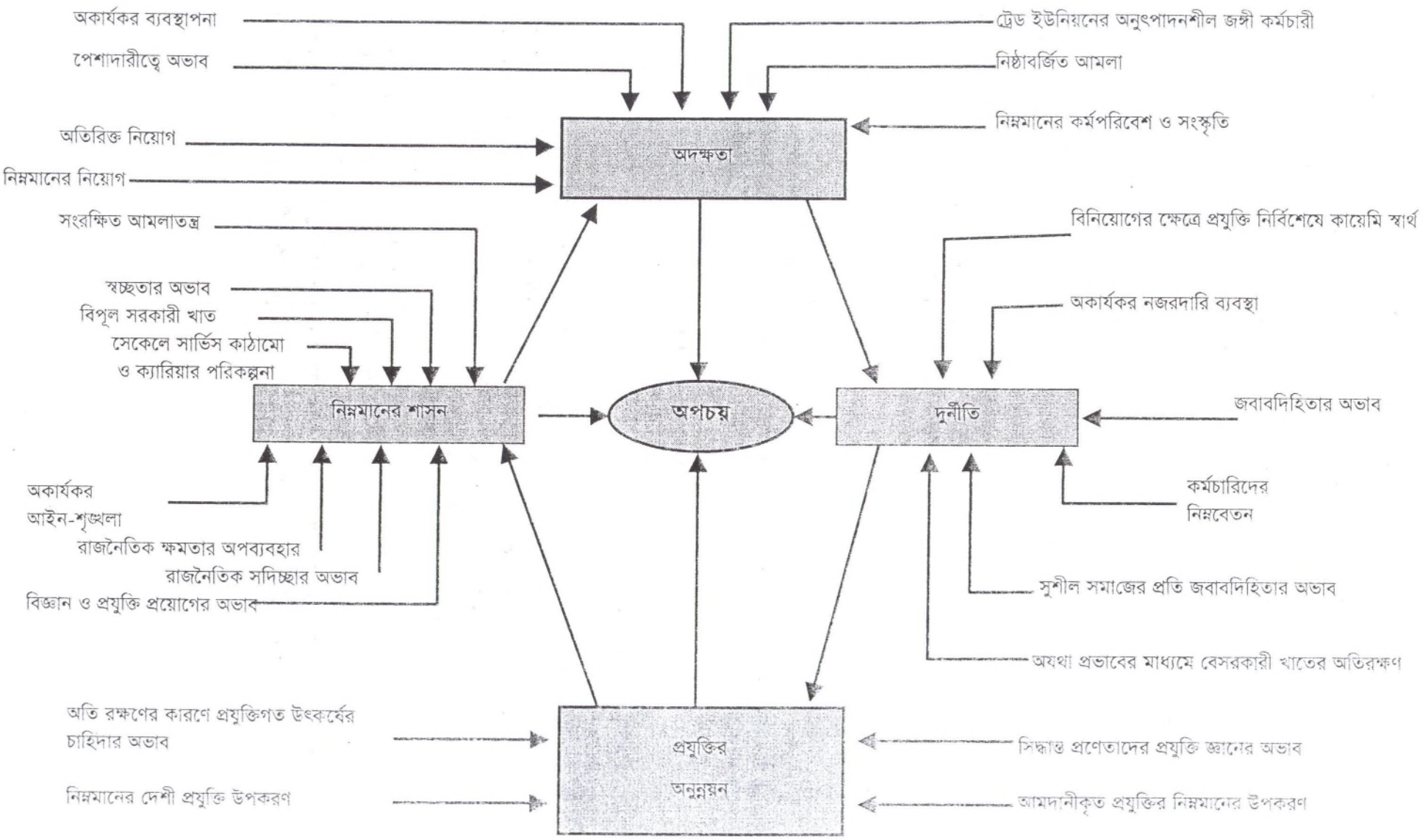

৭.০৬ উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (ডিএফআই) ও রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (এনসিবি)সমূহ ব্যাপক খেলাপি ঋণের কারণে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় এবং ব্যাপক হারে এসব প্রতিষ্ঠানে তহবিল আত্মসাতের ঘটনা ঘটতে থাকায় এগুলো জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আচরণ থেকে ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে তাদের সম্ভাব্য যোগসাজশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ডিএফআই ও এনসিবিসমূহের দুর্বল কর্মসম্পাদন ও লোকসানের প্রধান কারণ হয়েছে জবাবদিহিতার অভাব এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব। বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নেয়া নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ থেকে এখনও কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যায়নি।

৭.০৭ ডিএফআই ও এনসিবি কর্তৃক প্রকল্পের দুর্বল মূল্যায়ন, ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে উদ্যোগের অভাব এবং ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিবেচনার প্রভাব থাকায় এমন অনেক অলাভজনক শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয় যেগুলো পরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের গৃহীত ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। অবশ্য, অব্যাহত লোকসান সত্ত্বেও ডিএফআই ও এনসিবিসমূহকে সরকারী ভর্তুকি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এর ফলে প্রতি বছর সরকারী তহবিলের আরো অপচয় হয়েছে।

৭.০৮ অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন সত্ত্বেও দেশের বিদ্যমান পরিবেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে না। উচ্ছৃঙ্খল ও রাজনীতিতে জড়িত জনবল, দুর্নীতি এবং বিরোধ নিস্পত্তিতে বিচার বিভাগের মন্থরতা ইত্যাদি নানা ঝুঁকির কারণে তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এটিও এক ধরনের অপচয় এবং সুযোগ সদ্ব্যবহারের ব্যর্থতা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন

৭.০৯ সরকারী খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হচ্ছে অপচয়ের আরেকটি ক্ষেত্র। এমন অসংখ্য প্রকল্প রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় অথবা অকার্যকর ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, কিংবা যতটা ভাবা হয়েছিল, ততটা উপকারী বা লাভজনক হচ্ছে না। কোনো কোনো সময় প্রকল্পের নকশায় এবং যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়, তাতে অন্তর্নিহিত অনেক দুর্বলতা থেকে যায়। এই দুর্বলতা এসব প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। কার্যকর ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছ পদ্ধতি ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে পাওয়া তহবিল অব্যবহৃত থেকে যায়। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলার অভাব এবং সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রাধান্য দেয়ায় এসব প্রকল্প প্রায়ই টেকসই হয় না। একই কারণে প্রতিপক্ষীয় (কাউন্টারপার্ট) তহবিলের লভ্যতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিশ্চিত না করেই এসব প্রকল্প অনেকটা তাড়াহুড়া করেই অনুমোদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের ফলে প্রকল্প ব্যয় প্রায়শই বেড়ে যায় এবং সরকারী তহবিলের আরো অপচয় হয়। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সরঞ্জামাদিও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে কিংবা গুদামে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনে ত্রুটির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কিংবা দাতাদের দেয়া শর্তাবলী পূরণে দেরী হওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক বেশি সময় লেগে যায় এবং সরকারী তহবিলের অপচয় হয়।

শিক্ষা মঞ্জুরি

৭.১০ বেসরকারী খাতের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদেরকে তাদের মূল বেতনের ৮০% পর্যন্ত মঞ্জুরি দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য যদিও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়া, দুর্ভাগ্যবশত এরকম অভিযোগ রয়েছে যে, শিক্ষামঞ্জুরি গ্রহণকারী বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না করায় এই মঞ্জুরি পাওয়ার যোগ্য নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মঞ্জুরি অসাধু পন্থায় গ্রহণ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে, অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মঞ্জুরি পাওয়ার শর্তাবলী পুরোপুরি পূরণ করছে বলে দেখানো হলেও বাস্তবে তা করেনি। বন্টনকৃত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সদ্ব্যবহার হয় না এবং তা সরকারী তহবিল আত্মসাতের সামিল। এছাড়া মঞ্জুরি গ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষা ও পাঠদানের মান ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানের অনেক নিচে। বিভিন্ন বছরে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের বিপরীতে মঞ্জুরিকৃত টাকার পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৭.১

শিক্ষাখাতে মঞ্জুরী

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ			মোট
	স্কুল	মাদ্রাসা	কলেজ	
১৯৮৭-৮৮	১৫৬.০৭	৮৬.১৮	২৮.৩৫	২৭০.৬০
১৯৮৯-৯০	১৮৬.৪৯	১০০.২৩	৩৫.৬২	৩২২.৩৪
১৯৯২-৯৩	২৭৩.৪০	১৪৪.০৬	৫৮.৯৩	৪৭৬.৩৯
১৯৯৪-৯৫	৩৫৯.৩২	১৮৩.২২	৯২.৫৬	৬৩৫.১০
১৯৯৬-৯৭	৪১০.২১	২০৬.২৮	১২০.০৪	৭৩৬.৫৩
১৯৯৭-৯৮	৫২৭.০০	২৬৮.৫৮	১৬৯.৮৪	৯৬৫.৪২

সূত্র ঃ ব্যানবেজ (BANBEIS) ১৯৯৮, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কাজের বিনিময়ে খাদ্য মঞ্জুরি

৭.১১ "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে শ্রমের মূল্য পরিশোধের জন্য খাদ্যশস্যের (গম) আকারে মজুরি প্রদানের একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। পল্লী এলাকায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করার এবং সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য "শিক্ষার জন্য খাদ্য" কর্মসূচিতেও খাদ্যশস্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচীর কার্যকারিতা সম্পর্কেও গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কেননা, বিভিন্নভাবে এই খাদ্যশস্যের অপব্যবহার ও আত্মসাৎ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ওঠানো-নামানো ও বিতরণের সময় খাদ্যশস্যের অপচয় হয় বলে দাবী করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভুয়া ব্যক্তিদের কাছে বন্টনের মিথ্যা হিসাবও দেখানো হয়।

৭.১২ গুদামজাতকরণ ও পরিবহনকালীন খাদ্য শস্য অপচয়ের হার নিচে উল্লেখ করা হল :

গুদামজাতকরণে অপচয়	:	৬ মাস পর্যন্ত ০.৫০%
		১২ মাস পর্যন্ত ০.৭৫%
পরিবহন অপচয়	:	ট্রাকযোগে ০.১২৫%
		নদীপথে ০.১২৫-০.৪০%
		গরুর গাড়িতে ০.১২৫-০.৫০%
		রেলযোগে ০.৫০%
		অভ্যন্তরীণ সমুদ্র পথে ০.৫০%

৭.১৩ প্রকল্প এলাকার প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এমন রাজনীতিক বা ব্যক্তিদের দ্বারা "বিশেষ প্রকল্পের" নামে খাদ্যশস্যের অপব্যবহারও সাধারণ ব্যাপার। অভিযোগ রয়েছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মীরা ও স্কুল শিক্ষকরা খাদ্য কর্মসূচিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেন। তাই এই মঞ্জুরি থেকে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠি উপকৃত হয় না। এজন্য, খাদ্য শস্যের অপচয় হচ্ছে এবং "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" ও "শিক্ষার জন্য খাদ্য" কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জন সুদূর পরাহত থেকে যাচ্ছে।

সিস্টেম লস ও লিকেজ

৭.১৪ সিস্টেম লস হলো অদক্ষতা, চুরি ও ছিঁচকে চুরি ঢাকার একটা পোষাকী উপায়। উপযুক্ত পরিকল্পনা, সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং -এর অভাবেই সিস্টেম লস ও লিকেজের দ্রুত প্রসার ঘটছে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সিস্টেম লস ও লিকেজ মূলত ঘটে থাকে সরবরাহ প্রক্রিয়ায় দূর্বলতা, অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষন এবং বাহ্যিক ত্রুটির কারণে।

গবেষণা ও উন্নয়ন মঞ্জুরি

৭.১৫ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএণ্ডডি) সংস্থাসমূহকে মঞ্জুরি হিসেবে প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্ধ দিচ্ছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি খাতের কয়েকটি সংস্থা ব্যতীত অন্য গবেষণা সংস্থাগুলো থেকে বিনিময়ে তেমন কোনো সুফলই পাওয়া যাচ্ছে না। বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার *বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার* (Intellectual Property Rights) সংক্রান্ত নীতির প্রেক্ষাপটে এসব অধিকাংশ সংস্থার গবেষণা কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে গবেষণার বেশকিছু ক্ষেত্রে 'ওভারল্যাপিং'-ও রয়েছে (অর্থাৎ তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ধরনের গবেষণা করছে)।

৭.১৬ গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোতে কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাব থাকায় এগুলো থেকে প্রত্যাশিত সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। গবেষণার ফলাফল মূল্যায়নের জন্য কোনো জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই; মঞ্জুরি প্রদানের বিষয় বিবেচনার সময় ব্যয়/সুফল বিশ্লেষণ করা হয় না। গবেষণা কর্মকাণ্ড তদারকির কোনো ব্যবস্থা সংস্থাসমূহ নিজেরাও যেমন নেয় না, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও তেমনি নেয়া হয় না। প্রযুক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বিকাশ ও উন্নয়ন অর্জনের জন্য সরকারের লক্ষ্য বহুলাংশে অপূর্ণ থেকে যায়, এবং এতে সরকারের দুর্লভ সম্পদের আরো অপচয় হয়।

পণ্য ও সেবা সংগ্রহ

৭.১৭ সরকারী সংস্থাসমূহ প্রতিবছর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য ও সরঞ্জাম ক্রয় করছে। এসব সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি টেণ্ডার প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে, যদিও তা সব সময় স্বচ্ছ নয়। কি পরিমাণ পণ্য ও সরঞ্জাম প্রয়োজন সে ব্যাপারে কোনো যথাযথ বিশ্লেষণ বা পরিকল্পনা দেখা যায় না, এবং লাগসই প্রযুক্তির বিষয়টি খুব কম সময়ই বিবেচনায় আনা হয়। টেণ্ডার কারচুপি, দুর্নীতি কিংবা কোনো কোনো সময় জরুরী চাহিদার নামে শেষমুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের মধ্যেও অপচয় পরিলক্ষিত হয়। পণ্যসামগ্রীর হিসাব-বিবরণী ও নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতার ফলে অপচয় হয়ে থাকে এবং ত্রুটিপূর্ণ রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবের কারণে ক্রয়কৃত সামগ্রী ও সরঞ্জামের বিতরণ ও ব্যবহারের সঠিক হিসাব পাওয়া দুরূহ হয়ে পরে।

অফিস সময়ের অপচয়

৭.১৮ **অফিসের পুরো সময়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করাটা আসলেই একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।** অফিসের ভিতর সামাজিক কর্মকাণ্ড চালানো এখন প্রশাসনিক সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে অফিসে কাজের সময়ের অপচয় হচ্ছে। কর্মচারীদের মধ্যে দাপ্তরিক শৃংখলা বলবৎ না করার জন্য এবং জবাবদিহিতা বা সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের কোনো পদ্ধতি না থাকায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে; **ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা এবং ঘন ঘন সভা-সমাবেশ ও কর্মবিরতির ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে।**

৭.১৯ **সরকারী কর্মকর্তারা তাদের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অফিসের বাইরে কাটান।** মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদলগুলোতে প্রায়শ প্রচুর সংখ্যক কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারী তহবিলের অপচয় হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তারা সেমিনার, কর্মশালা ও শিক্ষা সফর উপলক্ষে বিদেশে যাচ্ছেন। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কর্মকর্তাদের এধরনের অনুপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট খরচ সম্পদের অপচয় মাত্র, বিশেষ করে এথেকে রাষ্ট্র কতটা লাভবান হচ্ছে, অথবা আদৌ হচ্ছে কিনা এই আলোকে যদি বিষয়টি দেখা হয়। একইভাবে **কর্মকর্তারা প্রচুর আন্তঃমন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দাপ্তরিক সভায় যোগ দিচ্ছেন, যেগুলো থেকে কোনো কার্যকর ফল পাওয়া যাচ্ছে না।**

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অপচয়

৭.২০ প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়ন ছাড়াই প্রেষণের মাধ্যমে সরকারী সংস্থাসমূহের প্রধান কিংবা পরিচালক/বোর্ড সদস্যের পদ পূরণের বর্তমান পদ্ধতিটি অপচয়ের একটি কারণ, যেহেতু এদের অনেকের যোগ্যতা মানসম্মত না হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। এধরনের নিয়োগের ফলে সংস্থার

কর্মকর্তারা মনে করেন যে, তারা তাদের চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে তাদের দক্ষতা ব্যাহত হয়।

৭.২১ **সরকারী কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি/নিয়োগদানের ফলে কেবল তাদের দক্ষতাই হ্রাস পায় না, তাদের কর্ম-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।** এর ফলে মানব সম্পদের অদক্ষ ব্যবহারই শুধু হয়। কর্মকর্তারা তাদের অঘোষিত রাজনৈতিক আনুগত্যের জন্য ভাল পদে নিয়োগ লাভ করতে পারেন অথবা নানাভাবে শাস্তিও পেতে পারেন।

৭.২২ সরকারী চাকরিতে অযোগ্য ও প্রেরণাহীন লোক দিয়ে কোনো পদ পূরণ করা হলে তা মানব সম্পদ অপচয়ের কারণ হতে পারে। কাজের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও যথাযথ জনবল পরিকল্পনা না থাকলে চাকরির সঙ্গে প্রার্থীর দক্ষতা ও জ্ঞানের অমিল দেখা দেয় এবং প্রার্থী এমন পদে নিযুক্ত হন যার জন্য তিনি হয়তো প্রস্তুত নন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী লোক নিয়োগের বা 'ওভার-এমপ্লয়মেন্ট'-এর ঘটনা ঘটে। **বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা** এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে **প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার** কারণে বর্তমানে এমন সব কর্মকর্তা-কর্মচারী তৈরি হচ্ছেন, যারা দক্ষ জনসেবা প্রদানের চাহিদা মোকাবেলায় প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বস্তুত, যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তার অনেকটাই শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করছে; সরকারী সংস্থাসমূহকে তা প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণমূলক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি সম্পদের আরেক ধরনের অপচয়।

সরকারী চাকরির সুযোগ সুবিধা

৭.২৩ *যানবাহন:* মন্ত্রণালয়সমূহ ও সরকারী খাতের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ সরকারী কাজের জন্য বরাদ্দকৃত যানবাহন তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ধরনের কাজ দাপ্তরিক শৃংখলা নষ্ট করে, দুর্নীতি উৎসাহিত করে এবং সরকারী তহবিলের অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, সরকারী যানবাহনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বর্তমানে প্রতি কিলোমিটারে ১.০০ টাকা হারে আদায়ের যে নিয়ম রয়েছে, তা দিয়ে যানবাহন পরিচালন ব্যয়ের এমনকি ৫% মেটানোও সম্ভব হয় না। এই ব্যবস্থা সরকারী সম্পদের অপচয়।

৭.২৪ বর্তমানে যেসব কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক সরকারী ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি পাওয়ার যোগ্য, তারা এজন্য মাসে মাত্র দু'শ টাকা দিচ্ছেন। অথচ অবচয়, জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং একজন চালকের বেতন ও ওভারটাইমসহ এধরনের একটি গাড়ি বাবদ মাসিক খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা। সরকারী **সংস্থাসমূহের যানবাহনের বহর সরকারের বাজেটের উপর একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।**

৭.২৫ *টেলিফোন* : অফিসে ও বাসায় দুজায়গাতেই সরকারী টেলিফোনের অপব্যবহার হচ্ছে, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে কল সংখ্যার কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। মোবাইল সেটের সহজলভ্যতার ফলে এধরনের অপব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২৬ *আবাসন ব্যবস্থা* : সরকারী খাতের কর্মচারীদের আবাসন প্রদানের নীতির কারণে বিপুল পরিমাণ সরকারী তহবিল আটকা পড়ছে। ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে যে নিম্ন হার বজায় রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবাসনের ব্যবস্থা করা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক প্রমাণিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহায়ন কর্মসূচিতে বেসরকারী খাত বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে এবং যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় ব্যক্তিমালিকাধীন বাসস্থান সহজলভ্য হচ্ছে।

সরকারী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

৭.২৭ সরকারী খাতের বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দখলে বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে। এসব সংস্থার সম্ভাব্য ভবিষ্যত চাহিদা বিবেচনায় রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এরকম কয়েকটি সংস্থা হচ্ছে – বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লুডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লুটিএ) এবং অন্য অনেক সরকারী বিভাগ ও সংস্থা। **অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, যেমন ভাসমান লোকজন জোর করে**

এসব জমিতে উঠে পড়ছে, বিভিন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দলিল করে জমি দখল করছে, ভাড়া অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে, ইত্যাদি।

৭.২৮ জমির অব্যবস্থাপনার কারণে সরকারী সংস্থার রাজস্বক্ষতির কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন থেকে। রেলওয়ের প্রায় ৬২,০০০ একর জমি রয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ২০,০০০ একর ব্যবহৃত হচ্ছে। রেলওয়েকে তাই সারা দেশে প্রায় ৪০,০০০ একর জমির দেখাশোনা করতে হচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য সিএণ্ডএজি-র বিশেষ নিরীক্ষা রিপোর্টে রেল কর্তৃপক্ষের ভূমি প্রশাসনে অব্যবস্থাপনার যে চিত্র তুলে ধরা হয়, তাতে নিম্নোক্ত রাজস্ব ক্ষতি দেখানো হয়েছে :

বক্স ৭.১

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি প্রশাসনে অব্যবস্থাপনা

- জমি বিক্রয়লব্ধ অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ	ঃ	৩৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা।
- রেলওয়ের জমি ব্যবহারের জন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কাছে অনাদায়ী পাওনা	ঃ	১৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।
-রেলওয়ের জমির বিপরীতে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ	ঃ	৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।
-অননুমোদিত ব্যক্তিদের নামে রেলওয়ে জমির অবৈধ রেকর্ডভুক্তির ফলে ক্ষতির পরিমাণ	ঃ	৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

৭.২৯ রেলওয়ের মতো বিভিন্ন সরকারী সংস্থার ভূসম্পত্তি ব্যবস্থাপনাও খুব দুর্বল। এসব সরকারী সংস্থার অনেকগুলো ভূসম্পত্তির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ তো দূরের কথা, নিজেদের মালিকানার যথাযথ রেকর্ডপত্রও সংরক্ষণ করছেনা, অথচ তাদের ভূসম্পত্তির প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসও রয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ সংস্থায় এধরনের লোক না থাকায় জমি হাতছাড়া হচ্ছে ও রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের প্রধান কর্মকাণ্ড নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকেন বলে ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা প্রায়শ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য অসাধু পন্থা গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে, দালান কোঠা, অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, অফিস সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, রেলওয়ের বগি ও সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, ষ্টোর সামগ্রী ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ বা ব্যবহার না করায় সরকারী তহবিলের ক্ষতি হচ্ছে।

অর্থের বিনিময় প্রাপ্ত সেবা

৭.৩০ অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবা বা "ভ্যালু ফর মানি" (ভিএফএম) হচ্ছে ব্যয়িত অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার মান এবং/কিংবা পরিমাপের একটি ব্যবস্থা। তাই, হাসপাতালসমূহ, পিডিবি, ওয়াসা, বিটিটিবি, ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ বিমান, বিআইডব্লুটিসি, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বিআরটিসি-র মতো সরকারী খাতের সেবাদানকারী সংস্থাসমূহ যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করছে, তাদের ক্ষেত্রে ভিএফএম মূল্যায়ন ব্যয় সাশ্রয় উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হতে পারে। অনুরূপভাবে আয়কর, কাস্টমস, পাসপোর্ট, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগসহ যেসব সরকারী অফিসে জনগণ সরাসরি সেবা গ্রহণের জন্য যান সেগুলোর দেয়া সেবার মান ও সময়নিষ্ঠতার ব্যাপারে ভিএফএম বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা যেতে পারে। ভিএফএম ধারনাটি নিচের নকশার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবার
ব্যালেন্সশীট

নকসা ৭.২

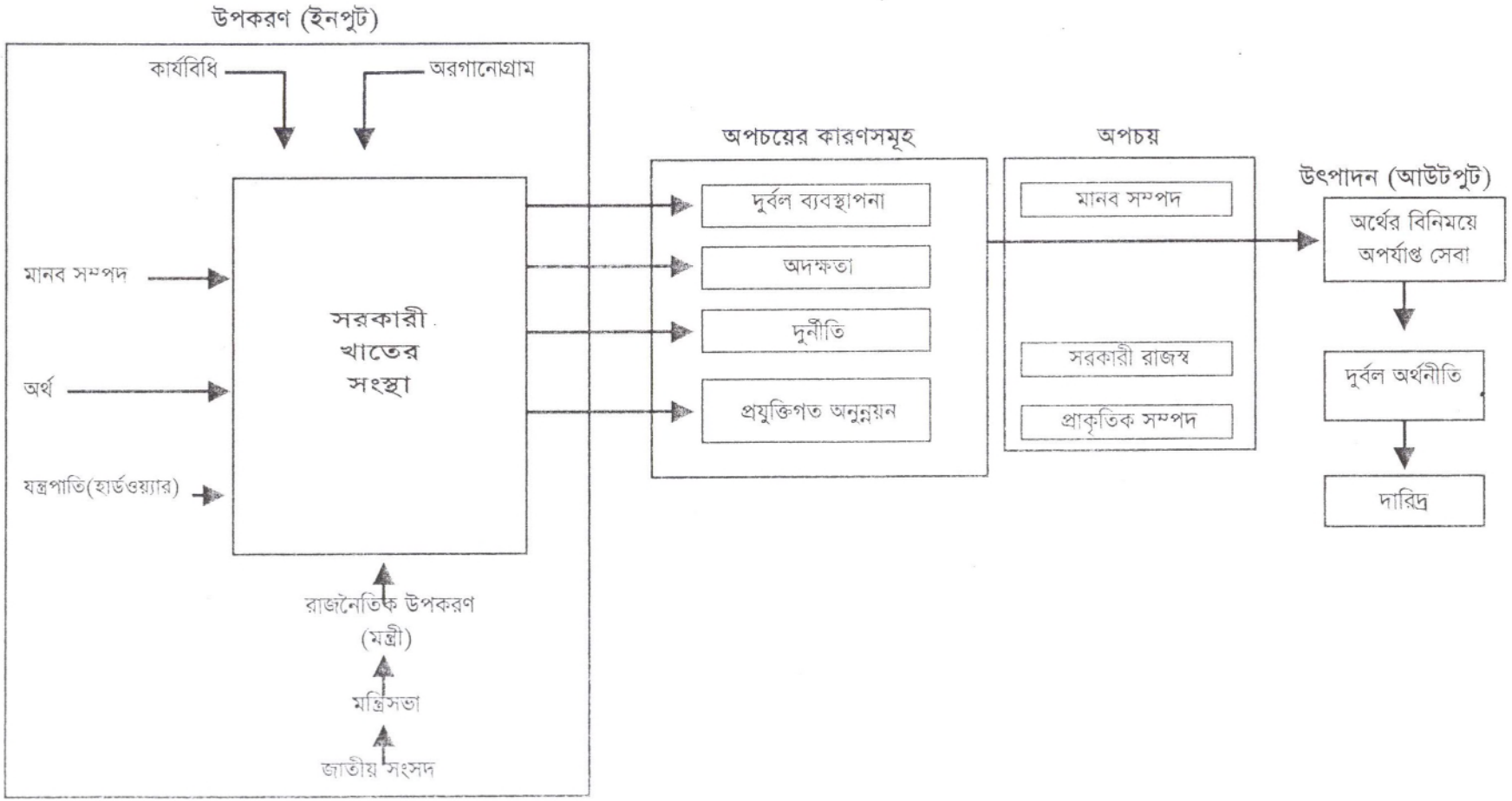

৭.৩১ ভিএফএম সরকারী খাতের সংস্থাসমূহের আর্থিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। সিএণ্ডএজি কর্তৃক ভিএফএম পরীক্ষার লক্ষ্য হবে সরকারী সম্পদ ব্যবহারে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কতটা দক্ষ ও ব্যয়সাশ্রয়ী, সে সম্পর্কে সরকারী হিসাব কমিটিকে নিরপেক্ষ তথ্য সরবরাহ করা।

৭.৩২ সরকারী খাতের সেবা প্রদানকারীদেরকে তাদের ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি হওয়া উচিত, কিন্তু জবাবদিহিতার কোনো কার্যকর পদ্ধতি না থাকায় সরকারী কর্মকর্তারা দক্ষ বা কার্যকর হতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন না; কাজেই তারা সেবা প্রদানে "অর্থের বিনিময়ে **প্রাপ্ত** সেবা" ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারছেন না। বর্তমানে ভোক্তাদের জন্য ভিএফএম নিশ্চিত করার কোনো কার্যকর পদ্ধতি নেই। অর্থের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সেবা লাভের জন্য ভোক্তাদের যে দাবী রয়েছে, তা উৎসাহিত ও সমর্থন করার জন্য আমাদের সমাজে কোনো কার্যকর নাগরিক নজরদারি সংস্থা নেই।

বক্স ৭.১

অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেবা: সরকারী হাসপাতাল ও হাসপাতালের অপরিহার্য বিষয়াদি

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী হাসপাতালগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের এবং একারণে তাদের প্রদত্ত ভিএফএম খুবই অপ্রতুল। সার্বিকভাবে হাসপাতালগুলোর পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, সর ামগুলো অতি-ব্যবহৃত এবং সেগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নেই; সেবিকা ও অন্যান্য এ্যাটেনডেন্টরা অমনোযোগী, ডাক্তারদের আচরণ প্রায়ই বন্ধুসুলভ নয়। হাসপাতালের নোংরা বেডগুলোকে সংক্রমণের উৎসই বলা যায়। ভেতরের বাতাস ভারী ও দুর্গন্ধময়। ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত সরবরাহের ফলে প্রায়শ রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত হয়। হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ হতাশাজনক এবং অবস্থা রোগীদের জন্য অনুকূল নয়। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনাও দুর্বল এবং অ-জবাবদিহিমূলক। হাসপাতালগুলোর জন্য কার্যসম্পাদনের কোনো নির্ধারিত মান নেই এবং হাসপাতালের ডাক্তাররা যে সেবা প্রদান করছেন, তার মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরও কোনো লক্ষ্য নেই। এর ফলে, রোগীদের যথাসময়ে মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানের জরুরী প্রয়োজনীয়তা তারা খুব কমই উপলব্ধি করেন। অনেক ডাক্তার বরং **হাসপাতালের বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের প্রতি অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন**। হাসপাতালে নিয়মমাফিক যে কতর্ব্য তাদের রয়েছে তার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

৭.৩৩ কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে :

ক. অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১) বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয়ের জন্য **''প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী সেবা নগদায়ন''** বিষয়ক অষ্টম সুপারিশে কমিশন সুপারিশ করেছে যে, যেসব কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য গাড়ি পাওয়ার যোগ্য, তাদেরকে নিজেদের জন্য গাড়ি ক্রয় করতে চার লাখ টাকা করে ঋণ এবং তাদেরকে সার্বক্ষণিক সরকারী গাড়ি দেয়ার পরিবর্তে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার থেকে ৮,০০০ টাকা ভাতা দেয়া যেতে পারে।

২) **''প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব দূরীকরণে''** বিষয়ক কমিশনের উনত্রিশতম সুপারিশে বলা হয়েছে যে, এ ঠিকাচুক্তিতে (on contract) দেয়া সম্ভব এমন সব ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ন্যূনতম পর্যায়ে কমানোর জন্য ঐসব কাজ ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা উচিত। এধরণের শনাক্ত ক্ষেত্রগুলি হ'ল কর্মচারী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও গাড়ি সংগ্রহ, প্রকল্প কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ, জরিপ, গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, ইত্যাদি।

খ. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১) কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাব নিরীক্ষণ কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরীক্ষাকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তরকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজনবোধে, অনিষ্পন্ন হিসাব নিরীক্ষণ কাজসমূহ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রাইভেট অডিট ফার্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর হিসাব যথাসময়ে নিরীক্ষা করা জরুরী; একই সঙ্গে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২) **যেসব স্থানে প্রাইভেট বাসাবাড়ি সহজলভ্য নয় সেসব স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মান বন্ধ করতে হবে।** সরকারী ব্যয় হ্রাস ও সরকারী তহবিলের অপচয় এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) **বিভিন্ন খাতে (যেমন, বিদ্যুৎ , পানি, ইত্যাদি) অযৌক্তিক 'সিস্টেম লস' বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।**

৪) বেসরকারী খাত যেসব ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকর ভাবে পরিবহন সেবা প্রদান করতে সক্ষম, সেসব ক্ষেত্রে পরিবহন পুলের বাসগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে বা ইজারা দিয়ে এই খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করা এবং সরকারী সংস্থাসমূহের এধরনের কর্মকাণ্ড হ্রাস করা উচিত।

৫) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য সহ বিশেষ প্রকল্প হিসেবে শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি ঠিক করা যেতে পারে।**

৬) **অবিলম্বে একটি ব্যাপকভিত্তিক ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন (Consumer Protection Act) প্রণয়ন করতে হবে** এবং যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি এই আইনের ভেতরে সন্নিবেশিত থাকবে। এব্যাপারে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভোক্তা সংরক্ষণ আইনের খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং আইনটি বলবৎ করা যেতে পারে।

৭) প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন প্রতিটি সরকারী সংস্থার জন্য একটি করে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে, জমি খাতে আরও অপচয় বন্ধ করা। এছাড়াও এসব টাস্কফোর্স জমির ব্যবহার ও মূল্য সম্পর্কে রিপোর্ট দেবে এবং এক্ষেত্রে আর কোনো ক্ষতি বা অপচয় বন্ধ করার উপায় ও পন্থা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করবে। অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সরকারী সম্পদের যথাযথ তালিকা তৈরি এবং এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮) গুরুর অপেক্ষায় রয়েছে ও নতুন - উভয় ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প ভালোভাবে মূল্যায়ন করে যেগুলি বস্তুনিষ্ঠ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেশি কেবল সেগুলিই গ্রহণ করতে হবে। সরকারী সম্পদের অপচয় এড়ানোর লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রকল্প ডিজাইন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের লভ্যতা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলি নিরসনে জরুরী প্রয়াস চালাতে হবে।

গ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১) বাজার সম্ভাব্যতা ও সামর্থ্যের আওতায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসওই) দ্রুত বেসরকারীকরণ করতে হবে।

২) পণ্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) জন্য বর্তমান বিধিবিধান ও পদ্ধতিকে হালনাগাদ ও স্বচ্ছ (transparent) করতে হবে। সরকারী সংস্থাসমূহ যাতে সরঞ্জাম সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় কমাতে পারে, সেজন্য কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে যথাযথ ইনভেন্ট্রি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৩) সরকারী খাতের হাসপাতালগুলোকে ক্রমান্বয়ে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারে শেয়ার বিক্রি করা যেতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার বেসরকারী খাতকে দেওয়া যেতে পারে।

৪) রেলওয়ের যেসব রুট ও সার্ভিস আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে এবং আরো ট্রেন সার্ভিস বেসরকারীকরণ, কিংবা লীজ বা চুক্তিভিত্তিতে চালানো যেতে পারে।

৫) সরকারী মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রাহক প্রদত্ত সকল প্রকার *ব্যবহার ফি* (users' fee) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।

৬) পর্যায়ক্রমে সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধার নগদায়ন করতে হবে।

অধ্যায় ৮

সংসদীয় পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ

৮.০১ আইন পরিষদের একটি *নজরদারি কাজ* (watchdog function) হচ্ছে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ। সংসদের উপর অর্পিত দায়দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে এ বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা যে, নির্বাহী বিভাগ আইন পালন করছে, সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করছে এবং জনগণের প্রকৃত সমস্যাবলী নিরসনের চেষ্টা চালাচ্ছে। বেশির ভাগ শিল্পোন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশে আইন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের পর্যবেক্ষণ কাজ তারা কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।

৮.০২ মার্কিন কংগ্রেসের পর্যবেক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের বিস্তারিত একটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কর্মসূচি ও নীতির উপর "অব্যাহত সজাগ দৃষ্টি (continuous watchfulness)" রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। বস্তুত, কমিটি পদ্ধতিটি নির্বাহী বিভাগের ক্ষেত্রে *কংগ্রেসীয় শক্তির অবলম্বন* হিসেবে কাজ করে আসছে। এ কমিটি কংগ্রেস সদস্যদেরকে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, কুশলতা ও ব্যাপকতর স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে নেতৃত্ব গড়ে তোলার অনন্য সুযোগ এনে দিচ্ছে। কমিটি পদ্ধতির কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য এবং প্রশাসনের তরফ থেকে যে কোনো অসহযোগিতা মোকাবেলার জন্য মার্কিন কংগ্রেস কয়েকটি পদক্ষেপ নির্ধারণ করেছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে সমন জারির ব্যবস্থা যা তামিল না করলে এমনকি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা যায়।

৮.০৩ ব্রিটিশ পদ্ধতিতেও সরকার এ বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, কমন্স সভাকে কার্যকর করতে হলে এর কমিটি পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং **নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করে দেখার জন্য পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে অধিক দায়িত্ব দিতে হবে**। জার্মানীতে প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ, সরকারী বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাজেটে সংশোধনীর প্রস্তাব দেয়ার জন্য পার্লামেন্টের কয়েকটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে।

৮.০৪ বিভিন্ন দেশের এ আইন পরিষদগুলো জনগণের কাছে জবাবদিহিতা ও দায়িত্বসচেতনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধি, পদ্ধতি ও রীতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন, আইন প্রণয়ন ও সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ

৮.০৫ সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে কমিটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদীয় পর্যবেক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা নিম্নরূপ:

> ৭৬ (১) জাতীয় সংসদ তার সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করবে:
>
> (ক) সরকারী হিসাব কমিটি;
>
> (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং
>
> (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।
>
> ৭৬ (২) দফা (১) এ উল্লেখিত কমিটিসমূহ ছাড়াও, সংসদ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে, এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে–
>
> (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবে;
>
> (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করতে পারবে;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবে এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করতে পারবে;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৮.০৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ ও ২৪৮ ধারায় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যপদ্ধতির বিধান রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে স্থায়ী কমিটিসমূহের কাজের ব্যাপারে কার্যপ্রণালী বিধির, বিশেষ করে সংবিধানের ৭৬(২)(গ) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা নিয়ে, কিছুটা যুক্তিতর্কের অবতারণা হয়েছে।

৮.০৭ ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের জনপ্রশাসন পদ্ধতি শুধু যে স্ববিরোধী আচরণের শিকার হয়েছে তাই নয়, বরং গোপনীয়তা ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অভাবের জন্যও এটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারী সেবামূলক খাতগুলোতে, যথা-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপযোগমূলক সেবা, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় যে নিম্ন মান দেখা যাচ্ছে তাতে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত সেবা এবং জনগণের অভিযোগের কার্যকর নিরসনের অভাবই প্রতিফলিত হচ্ছে।

৮.০৮ এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে কেবল আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যই নয়, বরং জনগণের চাহিদা ও অভিযোগ পূরণ এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংসদকে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার জন্য একে শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। প্রধান প্রধান গণতান্ত্রিক দেশগুলোর আইন পরিষদের অভিন্ন বৈশিষ্টগুলো অর্জনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রচেষ্টা নিতে পারে।

৮.০৯ সংসদীয় পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন কলাকৌশল রয়েছে। সংসদ যে সব পদ্ধতির মাধ্যমে তার পর্যবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে মুলতবী প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও বাজেট আলোচনা। পার্লামেন্টে সম্প্রতি প্রবর্তিত প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব এক্ষেত্রে একটি সঠিক পদক্ষেপ।

৮.১০ **বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি সংসদীয় পর্যবেক্ষণে একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে**। সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ৪৬, যার মধ্যে ৩৮টির কাজ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। এগুলোর ভিতরে ৩৫টি হচ্ছে স্থায়ী কমিটি। এ ছাড়া রয়েছে সরকারী হিসাব কমিটি (PAC), সরকারী কর্মদায়িত্ব (undertaking) কমিটি (PUC) ও প্রাক্কলন কমিটি (EC)।

৮.১১ **বর্তমানে মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদীয় কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান হচ্ছেন সরকারী ও বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যরা এবং তা অতীতে অনুসৃত পদ্ধতি থেকে উন্নত একটি পদ্ধতি**। তবে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিগুলোর পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকলেও, বাস্তবক্ষেত্রে এগুলো এখনো পুরোপুরি কার্যকর হতে পারেনি।

৮.১২ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণের পরও একথা বলা যায় যে, কমিটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদীয় পর্যবেক্ষণে কাংখিত ফল পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে কমিটি পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ চালু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর হ'ল, এবং এ কারণে এ পদ্ধতি কার্যকরভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিয়ে এর কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

৮.১৩ নজরদারীর বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেয়াটাই যথেষ্ট নয়। পর্যবেক্ষণ কাজের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সকল নজরদারী ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো– যা বাস্তবে ঘটছে না। উদাহরণস্বরূপ, **স্থায়ী কমিটিসমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশ নিয়ে সংসদে সাধারণত আলোচনা হয় না**। সংসদীয় কমিটি যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার কাছে পাঠানো কোনো বিষয়ের উপর রিপোর্ট পেশ না করে এবং এ জন্য সংসদ সুনির্দিষ্টভাবে সময় বৃদ্ধি না করে, তাহলে তা হবে কমিটির জন্য একটি ব্যর্থতা। এ ধরনের রিপোর্টের উপর সংসদে পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক হতে পারে। সংসদীয় কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এবং এ কাজ করার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তদন্তের ফলাফল সংসদে বিতর্কের জন্য লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।

স্থায়ী কমিটিসমূহের মাধ্যমে সংসদীয় তদন্তের উদ্দেশ্য কাউকে ভয় দেখানো নয়, এবং কমিটি কোনভাবেই নির্বাহীর ভূমিকা নিয়ে সরকারকে আদেশ-উপদেশ দিবেনা। কোন 'সুপার মিনিস্ট্রি' হয়ে দাঁড়ানোর কোনো উদ্দেশ্যও এর থাকা উচিত নয় বরং কমিটির লক্ষ্য হচ্ছে সরকার ও এর বিভিন্ন সংস্থার উপর কার্যকর নজরদারিত্ব গড়ে তোলা। কমিটিসমূহ পূর্ণাঙ্গ বিতর্কের মধ্য দিয়ে সংসদে– এবং সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে– সরকারের কর্মকাণ্ড, নীতি ও কর্মসূচি, বিশেষ করে এর সাফল্য ও ব্যর্থতা তুলে ধরবে। এ ছাড়া অহেতুক তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সংসদের মূল্যবান সময় অপচয় না করে বরং অর্থপূর্ণ আলোচনার জন্য কমিটির রিপোর্টসমূহ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ব্যবহার করা যায়।

৮.১৪ সংসদ সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়, কাজেই সংসদের গুণগত অবস্থান নির্ভর করে সংসদ সদস্যদের গুণাবলীর উপর। সম্মিলিত সদস্যদের চাইতে সংসদ যে উন্নততর হবে, এমনটি ভাবা যায় না। নির্বাচনী প্রতিযোগীতায় রাজনৈতিক দলসমূহ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মননে ও মেধায় উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের মনোনয়ন না দিয়ে বরং অর্থ ও পেশীশক্তির অধিকারী প্রার্থীদেরকেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে : অথচ সংসদই আবার সরকারের ভাল-মন্দ কাজগুলো জাতির কাছে তুলে ধরে। সংসদেরই উচিত সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য জনমতের নেতৃত্ব দেয়া। তাই, সংসদীয় গুরুদায়িত্ব পালন করার সামর্থ্যই সদস্যদের উৎকর্ষের নিদর্শন হওয়া উচিৎ। জাতীয় স্বার্থেই উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন সংসদ সদস্যদের প্রয়োজন এবং সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সেরা লোকদের বাছাই ও রাজী করানোর মাধ্যমে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোই শুধু এধরনের সংসদ গঠন করতে পারে।

৮.১৫ সংসদ সদস্যদের প্রধান কাজ হচ্ছে সংসদীয় বিতর্ক ও অন্যান্য সংসদীয় কাজে অংশগ্রহণ। সংসদীয় বিতর্কের মান সম্পর্কে অবশ্য যত কম বলা যায়, ততই ভাল : সংসদ সদস্যদের বিতর্ক ও অন্যান্য কাজের নিম্নমানের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব। প্রতি সদস্যকে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত একজন সহকারী, একটি কম্পিউটার, একটি অফিস এবং কিছু তহবিল দেয়া যেতে পারে যাতে তিনি বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ ও উপযুক্ত সারসংক্ষেপ তৈরি করতে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন।

সংসদীয় পর্যবেক্ষণের প্রধান অন্তরায়সমূহ

৮.১৬ বাংলাদেশে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ড জোরদার করার ক্ষেত্রে প্রধান যে সব অন্তরায়ের কথা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে পদ্ধতিগত বলা যায়, অর্থাৎ এদের সূত্রপাত নির্বাহী বিভাগ-আইন সভা সম্পর্কে এবং পর্যবেক্ষণ কমিটিসমূহের কাজ ও আচরণে।

৮.১৭ পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালন পদ্ধতির ভিতর থেকেই, বিশেষ করে আইন সভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে। সংসদকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাহী বিভাগের ব্যয় ও কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নির্বাহী বিভাগের অসহযোগীতা।

৮.১৮ কোনো বিশেষ ত্রুটি বা অব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয়ের কে জবাবদিহি হবেন সে ব্যাপারে দায়িত্ব নিরূপণ ও চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধাসমূহের কারণে সংসদীয় পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে।

৮.১৯ স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সহযোগিতার ধরণ সব সময় খোলামেলা এবং সহায়ক নয়। মন্ত্রণালয়গুলো তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কমিটিসমূহের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ পছন্দ করে না এবং সাধারণতঃ সংসদ সদস্যদেরকে কোন তথ্য সরবরাহ করতে অনীহা প্রকাশ করে। অনেক নথি 'গোপনীয়' বলে শ্রেণীবদ্ধ করায় সেগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দেখতে পারেন। সরকারের অসহযোগিতা ও গোপনীয়তার কারণে প্রায়ই সংসদের পর্যবেক্ষণ কাজ ব্যাহত হয়। অপরদিকে, বিশেষ করে নবাগত সংসদ সদস্যদের অভিজ্ঞতার অভাবও পর্যবেক্ষণ কাজের জন্য একটি অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত। সরকারের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের যথাযথ *ওরিয়েন্টেশন* (orientation) এর উত্তরণে সহায়ক হতে পারে।

৮.২০ প্রশাসনের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের পরিবেশে সংসদীয় পর্যবেক্ষণ কাজ কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। মন্ত্রণালয়সমূহের উচিত সংসদীয় পর্যবেক্ষণকে জবাবদিহিতার একটি মানসম্মত চর্চা হিসেবে বিবেচনা করা, এবং

মন্ত্রীদেরও উচিত মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকাণ্ডের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব নেয়া ও পর্যবেক্ষণ কাজে সহায়তাদানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করা।

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাব

৮.২১ সরকারী হিসাব কমিটি (পিএসি) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিরীক্ষা রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা করে দেখার পর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ সংসদের কাছে রিপোর্ট পেশ করলেও সাধারণত সংসদের ভিতরে এ রিপোর্টের বিষয়ে কোনো বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে, এসব রিপোর্ট নির্বাহী বিভাগের উপর কোনো কাংখিত প্রভাব রাখতে পারে না। হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্টসমূহে রেলওয়ে, পিডিবি ও বিটিটিবি-র ব্যাপারে সিএণ্ডএজি-র সুপারিশসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো গত কয়েক বছর ধরে পিএসি-র পরীক্ষা নিরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে। হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্টগুলো আবার ৫ থেকে ৬ বছর আগের অনিয়ম সংক্রান্ত, এবং অধিকাংশ আপত্তি এতো তুচ্ছ ধরনের যে এসব রিপোর্ট সংসদীয় পর্যবেক্ষণের জন্য পিএসি-র ভূমিকার ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসছে না।

৮.২২ পিএসি-র সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না।

৮.২৩ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পিএসি-র কাজের মান নির্ভর করে প্রধানত সিএণ্ডএজি'র কাজের মানের উপর। নিরীক্ষা আপত্তিগুলোর কাজ যদি নিম্ন স্তরের কর্মচারীদের দিয়ে করানো হয় এবং আপত্তিগুলোর যদি যথেষ্ট ভিত্তি না থাকে, তা হলে স্তূপীকৃত আপত্তির ব্যাপারে পিএসি-র পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। **সিএণ্ডএজি-কে হিসাব নিরীক্ষা কাজে অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করতে হবে, আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধির দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে হবে এবং সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করতে হবে।** হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিগুলো সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হতে হবে, এবং এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রশ্ন সম্পর্কিত হতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিএণ্ডএজি-কে যথাযথ নিরীক্ষার কাজে এবং পিএসি-র কাছে ফলপ্রসূ রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। এ **গুরুদায়িত্ব পালনে সিএন্ডএজিকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে।**

৮.২৪ স্থায়ী কমিটিসমূহের কর্মকাণ্ড, বাজেট এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজের গভীরে প্রবেশ না করে, মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের কতিপয় নিয়মিত কাজকর্মের পর্যালোচনার (review) মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার পর কমিটিসমূহ প্রায়শ তাদের রাজনৈতিক মনোভাব ও স্বার্থের উপর নির্ভর করে রুটিন মাফিক মন্তব্য-বক্তব্য প্রদান করে এবং কখনো কখনো নাটকীয়তার আশ্রয় নেয়। অথচ, পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসনকে জনপ্রতিনিধিদের কাছে এবং জাতির কাছে অনেক বেশি দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করে তোলা।

৮.২৫ অন্য যে কোনো কমিটি বা সংস্থার মতো সংসদীয় কমিটিরও আলোচ্যসূচি এবং ওয়ার্কিং পেপার নিজেদের করা প্রয়োজন, এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। পর্যবেক্ষণ সংস্থা হিসেবে কমিটিকে এমন সব বিষয় বেছে নিতে হবে, যেসব ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থাসমূহ ব্যর্থ হচ্ছে এবং জনগণের দুর্ভোগ বাড়ছে কিংবা সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে। কমিটির সভায় ফলপ্রসূ আলোচনার আগে এসব বিষয়ের উপর অনুসন্ধান, পর্যাপ্ত তথ্য, এবং সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

৮.২৬ সংসদ চাইলে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গঠিত কোনো কমিটির নিকট প্রেরণ করতে পারে। কমিটি সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে সংসদীয় তদন্তকাজ পরিচালনা এবং বিষয়ের ধরন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে পারে। এ সমীক্ষার জন্য তহবিল ও জনবলসহ যে সম্পদ প্রয়োজন হবে, তা সংসদ সচিবালয় সরবরাহ করতে পারে। প্রতিটি কমিটি একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এর কাজ এবং লিখিত রিপোর্ট চূড়ান্ত করতে পারে। তারপর এ রিপোর্ট একটি পূর্ণাঙ্গ বিতর্কের জন্য সংসদে পেশ করা যেতে পারে। এ রিপোর্টে বিষয়টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরার ফলে বিতর্কটি তথ্যসমৃদ্ধ এবং অর্থবহ হতে পারে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সংসদীয় বিতর্কের মান উন্নত হবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৮.২৭ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হতে হবে। কমিটির কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ কিংবা দলিলপত্র উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লে, কমিটি এ ধরনের ব্যক্তিকে এর সামনে

উপস্থিত হওয়ার জন্য কিংবা দলিলপত্র উপস্থাপনের জন্য বলতে পারে। সরকার কেবল এ কারণ দেখিয়ে কোন নথি বা দলিল উপস্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন যে, এটি প্রকাশ পেলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। যেসব দলিলের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলো সরবরাহে সরকারের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সমীচীন নয়। অধিকাংশ দলিলই এ ধরনের। এ ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে যে, **কমিটির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে সরকারের সহযোগিতা, পরিপক্ক রাজনৈতিক চর্চার বিকাশ এবং কমিটির সদস্যদের মানের উপর। কমিটি ব্যবস্থায় সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারী হিসাব কমিটি (PAC) ও সরকারী আন্ডারটেকিং কমিটি (PUC) -এর মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে বিরোধীদলীয় সদস্যগনের মধ্য থেকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।** অধিকন্তু, **নারী-পুরুষ ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে মহিলা এমপিদের মধ্য থেকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়।**

৮.২৮ সংসদীয় কমিটির বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, কমিটিসমূহ তাদের পর্যবেক্ষণের মাত্রা লংঘন করছে। একটি ক্ষেত্রে কমিটি এক ব্যক্তির নেয়া ব্যাংক ঋণের তফশিল পুনঃনির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ জারী করেছে। ঋণ হচ্ছে ব্যাংক ও গ্রহীতার মধ্যকার একটি বিষয় এবং ঋণ ও ঋণদান বিধির ভিত্তিতে চুক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আবশ্যিকভাবে একটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপার। কমিটির এ জাতীয় বিষয়ে জড়িয়ে পড়া সমীচীন হয়নি বলে মনে হয়। অন্য একটি কমিটিকে সরকার দলিলপত্র হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। যে সব দলিল চাওয়া হয়েছিল, সেগুলো প্রকাশ পেলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের ক্ষতি হবে কি না এবং এ করনে সেসব দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে কিনা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়।

পর্যবেক্ষণ অবকাঠামো সুবিধার অভাব

৮.২৯ বাংলাদেশের জনপ্রশাসন হচ্ছে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এ ধরনের বিভিন্নমুখী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত করা ও তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সংসদ প্রচুর বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। সংসদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে গড়ে না তুললে এবং সরকারী কর্মকাণ্ড ও বাড়াবাড়ির বিষয়ে যথাযথ তদন্ত না হলে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো দূরের কথা, পর্যালোচনার কাজ সম্পন্ন করাও দুষ্কর হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলসহ পর্যাপ্ত দাপ্তরিক সমর্থন না থাকায় কমিটিসমূহের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

৮.৩০ উপরি-উক্ত পর্যালোচনান্তে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করছেঃ

ক. স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১. তথ্য সংগ্রহ ও সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য তাঁদের প্রত্যেককে একটি অফিস, একটি কম্পিউটার, একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগত সহকারী এবং কিছু তহবিল দিতে হবে। ব্যক্তিগত সহকারী সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের মেয়াদকালের জন্যই নিযুক্ত হবেন। এছাড়া সরকার পরিচালনার কাজ, সংসদীয় কার্যপদ্ধতি ও বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে পরিচিতি ও প্রশিক্ষণে সংসদ সদস্যদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. সংসদীয় কমিটিগুলোর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি কমিটির সাচিবিক সহায়তা লাভ এবং প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও তহবিল থাকতে হবে। সংসদে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো সাধারণত তাদের লিখিত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংসদে পেশ করবে।

৩. প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তত একজন করে মহিলা এমপিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

খ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

সরকারি হিসাব কমিটি (PAC) ও সরকারি আন্ডারটেকিং কমিটি (PUC) -র মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সংসদে বিরোধী দলীয় এমপিদের নিযুক্ত করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৯

বেসরকারী বিনিয়োগ সহজীকরণ

৯.০১ বাংলাদেশে বেসরকারী বিনিয়োগের বর্তমান চিত্রটি সন্তোষজনক নয়। প্রচলিত নীতিসমূহের দূরূহতা, দুর্বল বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, এদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ এখনো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তবে শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর বাজারটিও বিশাল। এদেশের শ্রম শক্তিকে সহজেই প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এখানে অনেক ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোও গড়ে উঠছে।

৯.০২ বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) তাদের সাম্প্রতিক *বাংলাদেশ ২০২০* এর উপর রিপোর্টে একবিংশ শতাব্দীতে দেশটির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহের একটি মূল্যায়ন করেছে। রিপোর্টে 'অভ্যন্তরীণ বাজারকে' একটি সম্ভাবনা হিসেবে দেখানো হলেও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে 'দুর্বল প্রশাসন', 'অসম্পূর্ণ নীতি সংস্কার' ও 'দুর্বল আর্থিক খাত' -এর উল্লেখ করা হয়েছে (বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য, ১৯৯৮)। বিশ্ব ব্যাংক এবং স্থানীয় ও বিদেশী উভয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে এ উদ্বেগ রয়েছে।

বর্তমান নীতি ব্যবস্থা এবং শিল্প তৎপরতার পর্যালোচনা

৯.০৩ ১৯৮২ সনের নতুন শিল্প নীতি (এনআইপি)'র মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়। ঐ সময় থেকে পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে শিল্প নীতিসমূহকে উদারভিত্তিক করায় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় বেসরকারী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এ সময়ে উদারভিত্তিক বাজার অর্থনীতি রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসেবে বজায় থাকে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিল্প বিনিয়োগের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নীতি পর্যায়েও প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৯.০৪ সরকারের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান হারে নিয়ন্ত্রণমূলক থেকে প্রসারমূলক তৎপরতায় পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে বিনিয়োগ অনুমোদন পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে, আমদানী পদ্ধতি উদারভিত্তিক ও শুল্ক কাঠামো যৌক্তিক করা হয়েছে, এবং পরিমাণগত বিধিনিষেধ হ্রাস করা হয়েছে। উদার নীতিব্যবস্থা ও আকর্ষণীয় প্রেরণামূলক সুযোগ সুবিধা তৈরি করে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) হার অনেক বেশি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৯.০৫ নীতির ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগ সত্বেও আধুনিক শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১৯৮০'র দশক থেকে শতকরা ৪ থেকে ৬ ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও, যেমন ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ সালে, উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির হার উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তৈরি পোশাক ও ঔষধ শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন, মূল্য সংযোজন ও উৎপাদিত পণ্য বৃদ্ধির হার কমে এসেছে (আইপিএস, ১৯৯৯)। অবশ্য প্রায় একই সময়ে এফডিআই'র পরিমাণ ১৯৯১-৯২ সনের ২ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৭-৯৮ সালে ৩ শত ৪৪ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে (আজিজ উল্লাহ, ১৯৯৮)। তবে এই উপাত্তে কেবল মাত্র বিনিয়োগ বোর্ডে (বিওআই) নিবন্ধনের সংখ্যাই দেখানো হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা বরং ভিন্ন, যা নিবন্ধনে বর্ণিত অংকের চেয়ে কম।

বর্তমান প্রেরণামূলক ব্যবস্থাদি

৯.০৬ বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সনের শিল্প নীতিতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের, বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের, জন্য কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থা রেখেছেন। এর প্রধান দিকগুলো হ'ল:

ক) বিদেশী উদ্যোক্তারা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মতই কর রেয়াত, রয়েলটি পরিশোধ, কারিগরী কুশলতা সম্পর্কিত ফী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

খ) বিদেশী উৎস থেকে বিনিয়োগকৃত পুঁজি, লভ্যাংশ ও ডিভিডেণ্ড স্বদেশে সম্পূর্ণ পুনঃপ্রেরণের অনুমতি দেয়া হবে।

গ) বিদেশী বিনিয়োগকারীরা স্বদেশে পুনঃপ্রেরণযোগ্য ডিভিডেণ্ড বা আয় পুনরায় এখানে বিনিয়োগ করতে পারবেন যা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ) বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীরা তাদের বেতনের শতকরা সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ পর্যন্ত বাইরে পাঠাতে পারবেন এবং তাদের সঞ্চিত অর্থ ও অবসরলব্ধ সুবিধাদি পুরোপুরি স্বদেশে পুনঃপ্রেরণের সুবিধা ভোগ করবেন।

ঙ) বিনিয়োগকারী কোম্পানী বা যৌথ উদ্যোক্তাদের সুপারিশে বিদেশী নাগরিককে দেয়া কার্যানুমতি কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য হবে।

চ) সম্ভাব্য বিদেশী বিনিয়োগকারী ও তাদের অনিবাসী কর্মচারীদের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা দেয়া হবে।

ছ) বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারী বিদেশীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

জ) নতুন প্রক্রিয়া ও পণ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝ) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও বিধান অনুযায়ী বিনিয়োগের নিশ্চয়তা বিধান ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে।

ঞ) কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ শুল্কমুক্ত আমদানী করতে দেয়া হবে।

ট) বিদেশী ঋণের জন্য সুদের উপর কর অব্যাহতি দেয়া হবে এবং স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপরও কর অব্যাহতি দেয়া হবে।

নীতি ব্যবস্থার মূল্যায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক

৯.০৭ বিনিয়োগকারীরা মনে করেন যে, সরকারী নীতিসমূহ কাগজে কলমে অতি চমৎকার হলেও আসল সমস্যা হয় এগুলোর বাস্তবায়নে। নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন পর্যায়ে নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো পৌঁছানোর মধ্যে বরাবরই অনেক বিলম্ব হয়ে যায়।

৯.০৮ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামর্থগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (এআরসি) ১৯৯৬ সনের রিপোর্টে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার (যেমন বিওআই, বিইপিজেডএ, বিএসসিআইসি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইত্যাদি) কার্যক্রম সহজতর করা এবং সার্বিক নির্দেশনা ও মনিটরিং -এর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ বিশেষজ্ঞ ইউনিট না থাকার কথা উল্লেখ করেছে।

৯.০৯ বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান — বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই) ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বিইপিজেডএ) বিভিন্ন পরিচালন সমস্যায় ভুগছে। এসব সমস্যা অংশত বাহ্যিক কারণে, যেমন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক সৃষ্ট বাধা-বিপত্তির জন্য, এবং অংশত অভ্যন্তরীণ কারণে– যেমন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

৯.১০ বিওআই'র নেতৃত্বে যদিও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন এবং একে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনও দেয়া হয়েছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রতি তা সাড়া দানে ব্যর্থ হচ্ছে। বিওআইকে শিল্প অধিদপ্তরের একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্করণ বলে মনে হতে পারে। সেজন্য প্রতিষ্ঠানটি যদি ইপ্সিত সাফল্য অর্জন করতে চায়, তাহলে এর গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা দেয়ার জন্য একে একটি গতিশীল ও কার্যকর সংস্থায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।

৯.১১ বিওআই'র একটি বড় সমস্যা হ'ল এই যে, এটি বিভিন্ন সরকারী সংস্থার উপর নির্ভরশীল যা প্রায়শই বিনিয়োগ-পূর্ব বিলম্বের জন্য দায়ী। যেমন, শুরুতেই নতুন বিনিয়োগ নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র

পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বিওআই'তে কোনো প্রকল্পের নিবন্ধন করানোটা কোনো ব্যাপার নয়, প্রকল্পের বাস্তবায়নই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। বিওআই'কে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৮৯ সালে একটা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে একই স্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা লাভে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" অর্থাৎ "এক ধাপে সকল সেবা" ব্যবস্থা চালু করা হয়। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় নয়টি সংস্থা কাজ করছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটিটিবি, তিতাস গ্যাস, ডেসা, পরিবেশ অধিদপ্তর, এনবিআর, ওয়াসা, পিডিবি এবং আরইবি। বিওআই এসব সংস্থার সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া অনেক পরিচালন সমস্যাও রয়েছে। যেমন, বিওআই'র পক্ষে একজন বেসরকারী বিনিয়োগকারীর বিদ্যুতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত মাঝারি পর্যায়ের (৫০ কিলোওয়াটের কম) হলে তার ব্যবস্থা করা অনেক সহজ। কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে কার্যস্থলের ২ কিলোমিটারের মধ্যে গ্যাসলাইন না থাকলে নতুন বিনিয়োগকারীকে সহায়তা করার কোনো উপায় বিওআই'র নেই।

৯.১২ বিওআই ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থায়ন সংস্থা, ব্যাংক এবং বিসিক এর মত অন্যান্য সম্পূরক সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের কাজকে সন্তোষজনক বলা যায় না।

৯.১৩ বিওআই পরিচালিত জরিপ ও অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, পৃষ্ঠপোষক সংস্থাগুলোর সঙ্গে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও অপর্যাপ্ত মনিটরিং ও তদারকীর কারণে তা তেমন একটা কাজে আসে না। নিবন্ধনের পর শিল্প বা অন্যান্য প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, অথবা কতটা হচ্ছে সে রেকর্ড রাখার মত কোনো ফলো-আপ করা হয় না। বিওআই'র উপাত্ত ভিত্তিটি খুবই দুর্বল। প্রতিবেদন প্রদান ও তথ্যগ্রন্থনার অবস্থাও খারাপ।

৯.১৪ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালোগ (সিপিডি) "শাসন ব্যবস্থায় সংকট" শীর্ষক এক সাম্প্রতিক প্রকাশনায় উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি বলতে গেলে নেই। বস্তুত বিওআই, বিইপিজেডএ এবং অন্যান্য সহায়তাদানকারী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রশাসকদের কাজের জন্য জবাবদিহিতার কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা নেই। বিওআই এবং বিইপিজেডএ তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সময়সীমা মেনে চলা ও প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা উন্নয়নে বাধ্য নয়।

৯.১৫ এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবা দানকারী বিভিন্ন সংস্থার কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহার ও সম্পদ আত্মসাতের মত দুর্নীতিমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। **বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উপর যেসব বড় সমস্যা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, দুর্নীতিকে তার অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসেবা কার্যক্রমে দুর্নীতিমূলক কাজের বিস্তার বাংলাদেশে সুশাসনের পথে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক।**

আইনগত

৯.১৬ আইগত কাঠামো উন্নয়নে একটা শুভ সূচনা করা হলেও এফডিআই এবং অভ্যন্তরীণ শিল্প বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের মত আইন এখনো প্রণালীবদ্ধ করা হয়নি (আবদুর রব, ১৯৯৪)। আদালতে মামলার নিষ্পত্তি সময় সাপেক্ষ। ১৯১১ সনের প্যাটেন্ট ও ডিজাইন অ্যাক্ট, ১৯৪০ সনের ট্রেড মার্ক অ্যাক্ট ও ১৯৬২ সনের কপিরাইট অর্ডিন্যান্সের মত বাণিজ্যিক আইনগুলো খুবই সেকেলে। অনেক বিনিয়োগকারী সহজলভ্য আইনগত তথ্য সম্বলিত বইয়ের অনুপস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করেন।

৯.১৭ সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র প্রায় ৩২টি কনভেনশন অনুমোদন করেছেন। আইএলও-র কনভেনশন ভিত্তিক শ্রম আইনে যেসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো বাস্তবে কাজ করছেনা এবং শেষ পর্যন্ত তা নিয়োগকারীর বিপক্ষে যাচ্ছে। **রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংযোগ থাকার কারণে যে ক্ষতিকর ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা চলছে তার বিরুদ্ধে কদাচিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।** মূলত এ সমস্যাটি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার সমস্যা। বিদ্যমান শ্রম আইনের আধিক্য, এবং সে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ঐসব আইনের আওতা পরস্পর প্রবিষ্ট হওয়ায় সমস্যাটি আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি ব্যাপক ও হালনাগাদ শ্রমবিধি তৈরি হলে বিষয়গুলো আরো স্বচ্ছ হবে এবং শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে মামলার সংখ্যা কমে আসবে।

শ্রম সংক্রান্ত সমস্যাবলী

৯.১৮ শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, **শিল্প শ্রমিকরা এত বেশি সহিংস ও ধর্মঘটপ্রবণ যে, দেশী-বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জনের একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার উপর কমপক্ষে পাঁচ বছরের স্থগিতাদেশ আরোপের প্রস্তাব দিচ্ছেন** । শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ঘন ঘন কাজ বন্ধ হয়, যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয় এবং ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়ে। এর ফলে উৎপাদন এবং উৎপাদন দক্ষতার ক্ষতি হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ঘেরাও-এর রাজনীতি প্রায়ই তাদের অসঙ্গত দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে শিল্পপতিদের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে।

৯.১৯ **যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) প্রতিনিধি (সিবিএ)রা কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপের মত অবৈধ তৎপরতায় লিপ্ত হয়** । তারা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটান এবং নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালান। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক সংযোগ থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ কোনো দন্ডমূলক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়। ধর্মঘট ডাকার আগে তারা সাধারণত আইনগত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে না এবং এভাবে অবৈধ ধর্মঘটে লিপ্ত হয় ও তা করে পারও পেয়ে যান। এ চিত্র সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বেসরকারী খাত এই অশুভ তৎপরতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারে না।

সামাজিক

৯.২০ সশস্ত্র অপরাধী চক্র অর্থ আদায়ের জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং মুক্তিপনের জন্য অপহরণের আশ্রয় নেয়। জাতীয় দৈনিকগুলোতে ছিনতাই ও মুক্তিপণের ঘটনা নিয়মিত ছাপা হয়। এমনকি বিদেশী উৎপাদন কোম্পানীগুলোও তাদের ব্যবসা স্বার্থ রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী দলগুলোকে অর্থ দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

জেন্ডার ভিত্তিক সমস্যাবলী

৯.২১ বাংলাদেশে বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রসহ উৎপাদন শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যেই নারীর জন্য কর্ম সংস্থানের ক্রমবর্ধমান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে, বিভিন্ন শিল্প খাতে, বিশেষ করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায়, তরুণী ও অবিবাহিতা নারী শ্রমিকরা কম বেতন পায়। বাস্তবে সস্তা শ্রমের চাহিদার জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধা-দক্ষ শ্রমিকের নিম্নতম পর্যায়ে নারী শ্রমিকদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মহিলারা ফ্যাক্টরি আইনে প্রদেয় বেতন ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন না। এর কারণ হল, নারী শ্রমিকের স্থিতিশীল সরবরাহ, তথ্যের অভাব, দর কষাকষির কম ক্ষমতা এবং অনেক বেসরকারী শিল্পে ফ্যাক্টরি আইন ও শ্রম আইনের নামমাত্র প্রয়োগ। **শিল্প খাতে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্তরালভাবে আইনগত ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হলে তা একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে** । পারিশ্রমিক ও মৌলিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক অসমতা দূর করার অর্থ এই নয় যে, বেসরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরং শ্রমিকের স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবন নিশ্চিত করা গেলে তা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয়হ্রাসের পথ সুগম করবে।

অস্থিতিশীল স্টক মার্কেট

৯.২২ শেয়ার বাজারের দালাল ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রতারণামূলক কারসাজির ফলে পোর্টফলিও বিনিয়োগ ভাল কাজ করেনি। শেয়ার বাজারের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটি এন্ড একচেঞ্জ কমিশন -এর দুর্বলতা ও অযোগ্যতার জন্য বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে দৃঢ়ভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে তা সক্ষম নয়। ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজার যখন হঠাৎ ফুলে উঠল, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক বিনিয়োগকারীর কপাল পুড়ল অথচ বিদেশী পোর্টফলিও বিনিয়োগকারীরা এই সাজানো জুয়ায় বিপুল মুনাফা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। সিকিউরিটি বাজারে ১৯৯৬-৯৭ সনের এ আঘাত দেশের বিকাশমান অর্থনীতিকে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং হাজার হাজার সাধারণ বিনিয়োগকারীর আস্থা নষ্ট করে ফেলে। উন্নতির কোনো আশু লক্ষণ না থাকায় বাজারে এখন হতাশা বিরাজ করছে। ১৯৯৬ সালে যে সূচক ২০০০ এর কোঠা অতিক্রম করেছিল তা ১৯৯৯ সনের শেষে ৪৮৭-তে নেমে আসে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বত্র এই ক্ষতের ছাপ দৃশ্যমান।

৯.২৩ এ পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে দুটি স্টক একচেঞ্জ বাজার (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও আধুনিকায়ণের অভাবকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দূরপাচ্যের অনেক সিকিউরিটি বাজার ব্যবস্থাপনার তুলনায় বাংলাদেশ এখনো প্রারম্ভিক অবস্থায় রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় জাল শেয়ার সার্টিফিকেট বিক্রি ও অন্যান্য ধরনের জালিয়াতির মত অপরাধমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশী-বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীরাই সিকিউরিটি বাজারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

৯.২৪ উপরে আলোচিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ

১) **ভ্রমণ কর পরিশোধ সহজীকরণ সংক্রান্ত ৫ম আন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।** এর ফলে বিদেশ ভ্রমণে যাওয়া বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীসহ বাংলাদেশী যাত্রীদের ভ্রমণ কর প্রদানের একটি ভোগান্তিমূলক প্রক্রিয়ার অবসান হয়েছে।

২) বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধি, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি প্রয়োগ (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ১৮) সংক্রান্ত এ সুপারিশে বিনিয়োগকারীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার অনেকগুলোর প্রতিকারের জন্য বিদ্যমান বিধি-প্রবিধিসমূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩) আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কতিপয় ব্যবস্থা শীর্ষক ২৫তম সুপারিশে আইন-শৃংখলার উন্নতির লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা পরিদর্শন ও সরকারী কৌসুলীর জবাবদিহিতাসহ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ রিপোর্টের দ্বিতীয় খন্ডে এসব অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

খ) স্বল্প-মেয়াদী সুপারিশ

১) বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) **শ্রমিক ইউনিয়ন/সিবিএগুলোর সকল অবৈধ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ রোধ ও অসদুপায় অবলম্বনের বিষয়ে প্রচলিত আইনের আওতায় কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।**

৩) **শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছাকাছি এলাকায় মহিলা কর্মচারী/শ্রমিকদের জন্য আবাসন, তাদের শিশুদের স্বল্প ব্যয়ে দিবাপরিচর্যা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থাসহ মহিলাকর্মীদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করতে পারেন।**

৪) বিনিয়োগ সম্পর্কিত যেসব আইন এখনও হালনাগাদ করা হয়নি, বর্তমানের আবশ্যকতার আলোকে সেগুলোকে অনতিবিলম্বে হালনাগাদ করতে হবে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রচলিত জটিল পদ্ধতির অচিরে সুরাহা করতে হবে।

৫) বিনিয়োগ বোর্ডে (বিওআই) নয়টি সংস্থা প্রদত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One Stop Service) কার্যকর করার জন্য টিম সদস্যদেরকে কৌশলগত ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল সংস্থা থেকে দ্রুত ব্যবস্থাপনা সহায়তা দেয়ার প্রয়োজন হবে।

৬) **অনাদায়ী ঋণের ব্যাপকতা, পুঁজির অপ্রতুলতা ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের বিরুদ্ধে গ্রহণ করার মতো ব্যবস্থার অভাব যথাশীঘ্র সম্ভব দূর করার জন্য চলমান ব্যাংকিং সংস্কার কার্যক্রমকে নিরলসভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।**

৭) সরকার শিল্প উন্নয়ন, কর সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা এবং আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রচারের মত অনেক কাজ চুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত করতে পারেন।

৮) সরকারী অথবা বেসরকারী মালিকানাধীন সকল শিল্পাঞ্চল/শিল্প এলাকাকে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে বিদ্যুত, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য উপযোগমূলক সেবা দেয়ার জন্য মিনি-ইউটিলিটি কোম্পানী গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।

গ) দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১) বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে দেশে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করার জন্য বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল ও উন্নত করে তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে হবে।

২) লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ ও ব্যবসা সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ই-ট্রেড ও ই-কর্মাস প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

অধ্যায় ১০

সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১০.০১ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধিতে "কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নার্থে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে 'এফিসিয়েন্সী ইউনিট' ও মন্ত্রনালয়সমূহে 'এফিসিয়েন্সী সেল' সহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সুপারিশ করার" কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ দাখিল করলেই তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় না। **প্রশাসনিক সংস্কার একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া যার মধ্যে অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট পর্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন - প্রতিবেদন পস্তুতকরণ ও দাখিল, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনে পুনঃ প্রনয়ন এবং পরিশেষে অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন ইত্যাদি।**

১০.০২ বিভিন্ন দেশে সংস্কার বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন বাস্তবায়নে উচ্চ মাত্রায় নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, **প্রায় সব দেশই সরকারের মূলকাঠামোর আওতায় সংস্কার বাস্তবায়নার্থে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্থাপন করে থাকে।**

১০.০৩ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এ বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করেছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'এফিসিয়েন্সী ইউনিট' ও 'এফিসিয়েন্সী সেল' স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে নাই। কিন্তু সংস্কার বাস্তবায়নার্থে কমিশন তার অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশে একটি **জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (পারমক)** স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে।

১০.০৪ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে, যথা - **Towards Better Govt. in Bangladesh** -এ প্রধানমন্ত্রীর অফিসে একটি 'এফিসিয়েন্সি ইউনিট' ও ৬টি প্রধান মন্ত্রনালয়ে 'এফিসিয়েন্সী সেল' গঠন করতে বলা হয়েছিল। একটি এফিসিয়েন্সি ইউনিট গঠনের প্রজ্ঞাপনও জারী করা হয়েছিল। কিন্ত তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বিশ্ব ব্যাংকের Govt. That Works : Reforming the Public Sector -এ প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ৩-৪ বছর মেয়াদী একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, 'National Commission for Reforming Government (NCRG)' গঠন করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদনে স্থায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। **অত্র কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রায় ৫০টি গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও চালিয়ে নেয়ার জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।** তাছাড়া আইন কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট ও ব্যয়বরাদ্দ সংক্রান্ত সংস্কার কর্মসূচী (RIBEC) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী দাতাগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাকালে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, অতীতের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত প্রায় একুশটি প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকার দরুন তা সার্বিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিকভাবেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক সংস্কার একটি জটিল, দীর্ঘমেয়াদী ও দূরুহ প্রক্রিয়া। সময় ও প্রযুক্তির কারণে কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও আবার একই কারণে কয়েক যুগ পরে তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রশাসনিক সংস্কার ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বিষয় ভিত্তিক ও সেক্টর ভিত্তিক সকল পক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে করা প্রয়োজন যাহা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছাড়া জটিল ও অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।

১০.০৫ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলের (region) দেশসমূহে পরিচালিত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

পাকিস্তান

১০.০৬ ১৯৫০ -এর দশক থেকে পাকিস্তানে প্রশাসনিক সংস্কারের উপর অনেক কমিশন/কমিটি গঠিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ১৯৯৭ সনের আগষ্ট মাসে সর্বশেষ যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, তা হ'ল "**Commission on Administrative Restructuring**"। এই কমিশন বিগত এপ্রিল '৯৯ মাসে মন্ত্রিসভার নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিশন একটি দীর্ঘস্থায়ী কমিশন বলে প্রতীয়মান হয়, কারণ এর মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট

রেজোলিউশনে কোন কিছু বলা নাই। শুধু মেয়াদ ব্যতীত এই কমিশনের কার্যপরিধির সাথে আমাদের কমিশনের কার্যপরিধির অনেকটা সামঞ্জস্য রয়েছে। এ কমিশনের কার্যপরিধির আওতায় সিভিল সার্ভিস সংস্কার রয়েছে এবং কমিশনকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটরিং (monitoring) করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ কমিশন ছাড়া পাকিস্তানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন বা বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় "**Good Governance Group**" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী। এর মেয়াদও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

ভারত

১০.০৭ ভারত প্রশাসনিক সংস্কারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সেখানে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ রয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension -এর আওতায় **Department of Administrative Reforms and Public Grievances** নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কাজ করছে। এই মন্ত্রনালয়/বিভাগ ১৯৮৫ সালে গঠিত হয়েছে এবং এর সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এই বিভাগের কাজ হল সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সহায়তাকরন। তা ছাড়া এ বিভাগ মন্ত্রনালয়/বিভাগের জন্য performance standard বা কার্য্যসম্পাদনের মানদন্ড এবং সেবাধর্মী সকল প্রতিষ্ঠনের জন্য citizen's charter বা নাগরিক সেবা সনদ প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ এ সকল ক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মালয়েশিয়া

১০.০৮ মালয়েশিয়ায় প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য বিগত তিন দশক পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সাথে সংযুক্ত করে **Malaysian Administrative Modernization and Planning Unit (MAMPU)** -নামে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। MAMPU -এর মূল কাজ হল সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন করা। MAMPU -এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। এ পরিষদে সিভিল সমাজ, ব্যক্তি ও সরকারী খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ রয়েছেন। এ উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন চীফ সেক্রেটারী । মালয়েশিয়ায় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে MAMPU বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

জাপান

১০.০৯ জাপানে ১৯৮১ সন থেকে গঠিত বিভিন্ন কমিটি/কমিশন কর্তৃক পেশকৃত প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রতিবেদনে যে সকল সুপারিশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল সুপারিশ ১৯৯৭ সনে জাপানী মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে অনুমোদন করে। ১৯৯৮ সনে পার্লামেন্টে আইন পাশের মাধ্যমে অনুমোদিত সুপারিশসমূহ ২০০১-২০০৩ সনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য **Headquarters for Administrative Reform** নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ **সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সাথে সংযুক্ত করে জাপানী মন্ত্রিসভার সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা হয়েছে। এ সংস্থার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী** । একজন executive permanent secretary -কে এ সংস্থার অফিস-প্রধান করা হয়েছে এ সংস্থায় কাজ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ১৩০ জন দক্ষ অফিসারকে পদায়ন করা হয়েছে। ।

যুক্তরাজ্য

১০.১০ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল উন্নত দেশেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ চলছে। যুক্তরাজ্যে প্রায় দু'দশক পূর্বে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে কেবিনেট অফিসের অধীনে 'এফিসিয়েন্সি ইউনিট' (efficiency unit) গঠন করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বেসরকারী খাতের অত্যন্ত দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে মূলতঃ এ ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। এ ইউনিটের মূল কাজ ছিল প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিখাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করে উন্নয়নে অংশগ্রহন করতে পারে। প্রায় নয় বছর কাজ করার পর এ ইউনিট তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ সময়ের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কারমুখী করে গড়ে তোলা হয় এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে

কার্যসম্পাদনের জন্য budgetary mechanism প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এ সকল প্রতিষ্ঠান নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে সক্ষম। তাই 'এফিসিয়েন্সি ইউনিট' তুলে দেয়া হয়।

১০.১১ বর্তমানে Cabinet Office যুক্তরাজ্যের **Modernising Government Programme** নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করেছে। Cabinet Office -এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন এর প্রধান। ১৯৯৭ সালে জুন মাসে এর কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং সরকার আধুনিককরন সম্পর্কিত শ্বেতপত্র (A White Paper on Modernising Government) তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। সম্প্রতি white paper টি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে আগামী ২০০০ সনের পরে প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ও নাগরিকদের সেবা প্রদান (organisation, management and delivery of public service) এর উপর দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অধীনে Cabinet Office & Treasury সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করছে।

নিউজিল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়া

১০.১২ নিউজিল্যান্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল দেশে শুধু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, পররাষ্ট্রনীতি ও সাধারন নীতি নির্ধারনী বিষয় ছাড়া প্রায় সকল সেবাধর্মী বিষয় ব্যক্তি খাতের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। **এমন কি এ সকল দেশে প্রশাসনিক সংস্কার কোন কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল।**

১০.১৩ নিউজিল্যান্ড সরকার প্রধানতঃ চারটি প্রধান আইন (acts) -এর মাধ্যমে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। মূলতঃ আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহন করে সংস্কারের উদ্দেশ্য যথা- বেসরকারীকরণ, সরকারের আয়তন ছোট করা, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রণীত চারটি আইন নিম্নরূপ ঃ

(ক) **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এ্যাক্ট ১৯৮৬** - সরকারী মালিকানাধীন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠনসমূহ (যেমন, বিদ্যুত, কয়লা, টেলিযোগাযোগ, পোষ্টাল সার্ভিস এবং অন্যান্য) আধা-ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানী কাঠামোতে পুনর্গঠন করা।

(খ) **রাষ্ট্রীয় খাত এ্যাক্ট ১৯৮৮** - রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের মঞ্চ গড়ে তোলা।

(গ) **সরকারী আর্থিক এ্যাক্ট ১৯৮৯** - অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'আউটপুট ধারনা' এবং সঠিক হিসাব ব্যবস্থাসহ সরকারী খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি স্থাপন করা।

(ঘ) **চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এ্যাক্ট ১৯৯১** - শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রনবিহীন করে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগপ্রাপ্তদের উপর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের দায়িত্ব অর্পন করা। **বিদ্যমান সরকারী কর্মচারীদেরকে স্থায়ী ভিত্তির পরিবর্তে চুক্তির ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হয়।**

এ দু'টি দেশে গত এক দশক ধরে বাস্তবায়ন কর্মসূচী চালু থাকলেও সংস্কার কর্মসূচী এখনো চলছে।

যুক্তরাষ্ট্র

১০.১৪ উত্তর আমেরিকার দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও প্রশাসনিক সংস্কার হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের সংস্কারের লক্ষ্যে '**National Performance Review (NPR)**' নামে একটি কর্মসূচী গ্রহন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আল-গোরকে এর দায়িত্ব প্রদান করেন। আল-গোর ৩৮৪ টি সুপারিশ সম্বলিত NPR -এর একটি প্রতিবেদন প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেন। পরবর্তীকালে NPR একটি সংস্থা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় "**National Partnership for Reinventing Government**" । প্রাথমিক পর্যায়ে ফেডারেল সরকারের ২৫০ জন সরকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী ও স্থানীয় বিষেশজ্ঞ নিয়ে এর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এ সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের গৃহীত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

১০.১৫ দক্ষিন আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। বিশেষভাবে ব্রাজিল ও বলিভিয়ায় নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

কমনওয়েলথভুক্ত স্বাধীন দেশসমুহ (CIS)

১০.১৬ রাশিয়া ও কমনওয়েলথভুক্ত স্বাধীন দেশ সমূহে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পরপর সংস্কার বিষয়ে প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন গঠিত স্বাধীন কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বেসরকারীকরন ও প্রশাসনে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য

১০.১৭ ওমান, কুয়েত, মিশর, লেবানন, মরক্কো ও তিউনিসিয়াসহ অনেকগুলো আরব দেশে বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে যার প্রধান একজন কেবিনেট মন্ত্রী। মুক্ত অর্থনীতির আলোকে, বেসরকারী খাতের ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে অনেক সরকারী খাতকে বেসরকারী খাতে রূপান্তর করা হচ্ছে। সরকারী মালিকানাধীন অনেক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরন করা হয়েছে এবং এ সকল সংস্থার তদারকীতে যে সকল মন্ত্রণালয় নিয়োজিত ছিল তাদের কার্য্যাবলীতেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আফ্রিকা

১০.১৮ আফ্রিকার অনেক দেশে বিশেষ করে দক্ষিন আফ্রিকা, উগান্ডা, ঘানা, জিম্বাবুয়েতে প্রশাসনিক সংস্কারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ সকল দেশে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। নিয়মিতভাবে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিন আফ্রিকাতে একটি পাবলিক সার্ভিস ও প্রশাসন বিভাগ এবং উগান্ডাতে পাবলিক সার্ভিস মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১০.১৯ উপরোল্লিখিত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে প্রশাসনিক সংস্কারের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে ঃ

- প্রায় সকল দেশেই প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে;
- প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়া একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে; এবং
- এ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সরকারের প্রধান নির্বাহীর অফিসের সাথে সংযুক্ত।

১০.২০ উপরের বৈশিষ্ট্য থেকে অনুভূত হয় যে, বিশ্বের চলমান প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বর্তমান কমিশন যে সকল অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ প্রণয়ন করছে সে সকল সুপারিশ বাস্তবয়নের জন্য একটি কার্যপদ্ধতি (modality) বের করা হয়েছে। তা হ'ল ক্রমান্বয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অনুমোদনের পর কমিশনের সহযোগিতায় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনে তা বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু কমিশনের চুড়ান্ত প্রতিবেদনে যে সকল সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে, সে সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রণীতব্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যদি কোন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকে, তবে অতীতের একুশটি প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের মত এবারও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাবার গুরুতর সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বাস্তবে এ কমিশনের প্রতিবেদনটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নিজের বলে মনে করবে না। ফলে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি অবহেলিত হতে পারে। কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রণীতব্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নকালে কোন সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা প্রণয়নের জন্যও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি বর্তমান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকে, তবে প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে ইতিমধ্যেই অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং সংগৃহীত বই পত্র, গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনসমূহ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হারিয়ে যেতে পারে। আবার বর্তমান কমিশনের মেয়াদ এবং প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আরম্ভ হওয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান (time-gap) সৃষ্টি হলেও একই অবস্থা হতে পারে। বর্তমান কমিশনের মেয়াদ আগামী নভেম্বর, ২০০০ সালে শেষ হয়ে যাবে।

কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রণীতব্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সরকারে নাই। তাই কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রণীতব্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্বাপ্রেক্ষিত (prerequisites) রয়েছে এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.২১ বিষয়টির জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করে, **"প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা"** সংক্রান্ত কার্যপত্র কমিশনের বিগত ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গঠিত সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিশন/কমিটির প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাবে কোন প্রতিবেদনের সুপারিশই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। সংস্কারের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যথা - ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য -এর সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং আমাদের দেশে সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রণীত কর্মসূচী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ প্রসংগে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, যেহেতু বাস্তবায়নের বিষয়সমূহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর ন্যস্ত, সেহেতু মূলতঃ সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং (monitoring) এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এ কমিশন একটি ফ্ল্যাট (flat) বা সাংগঠনিকভাবে সমান্তরাল ধরনের প্রতিষ্ঠানের মত অর্থ্যাৎ আমলাতান্ত্রিক এবং শ্রেণী কাঠামো বহির্ভূত পেশাধারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে এবং এর কাজের পরিবেশ ও পদ্ধতি সার্বক্ষণিক পরামর্শধর্মী হবে। এ কমিশনের নাম "Public Administration Reform Monitoring Commission (PARMOC)" বা "জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন" রাখার পক্ষে সকলে একমত হন। এ কমিশনের মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর রাখার পক্ষেও সকলে মত ব্যক্ত করেন।

১০.২২ প্রস্তাবিত কমিশনে বর্তমান কমিশনের ন্যায় বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে রাখা যেতে পারে বলে সকলে একমত হন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি এবং সিভিল সমাজের একজন প্রতিনিধিকেও প্রস্তাবিত কমিশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সর্বমোট ১৬ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করা যেতে পারে। তার মধ্যে সদস্য-সচিবসহ ৩ (তিন) জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ১৩ (তের) জন খন্ডকালীন সদস্য থাকবেন। সরকারী মাঝ পর্যায়ের ৬ (ছয়) জন অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'কোর গ্রুপ' (core group) বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সহায়তাকারী বা প্রসেস ফেসিলিটেটর (process facilitator) হিসাবে কাজ করবেন। এ সকল 'প্রসেস ফেসিলিটেটর' প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে মনোনিত দু'জন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন। তবে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে কাঠামোটি চূড়ান্ত করা হবে।

১০.২৩ রেজোলিউশন বা আইনের মাধ্যমে এ কমিশনের সদস্য-সচিবকে সকল আর্থিক, জনবল ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন সচিবের অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করার পক্ষে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিশন নিজেই নিজের বাজেট প্রস্তুত করতে পারবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী তা খরচ করতে পারবে। বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত জনবলের বেতন ভাতাদিসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার বহন করবে। প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বেতন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা বহন করবে। প্রস্তাবিত কমিশন বর্তমান কমিশনের কারিগরী প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরী সাহায্য গ্রহন করতে পারবে।

১০.২৪ যেহেতু কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন সময় সাপেক্ষ, সেহেতু কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে **PARMOC** -এর বিস্তারিত প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় (অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ নং ২৮, ভলিউম-২)। এ সুপারিশটির সাথে একমত পোষন করা হয়, যা নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

কমিশনের সুপারিশ ঃ

১। নাম

জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন (Public Administration Reform Monitoring Commission বা সংক্ষেপে PARMOC)

২। কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন

প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশন বর্তমান কমিশনের ন্যায় এস আর ও -এর মাধ্যমে একটি রিজলিউশন দ্বারা অথবা আইনের মাধ্যমে গঠিত হতে পারে, যেখানে কমিশনের আর্থিক, জনবল ও সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত ক্ষমতা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা, কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলীর ব্যপ্তি, কার্যপরিধি, কর্মপদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতা এবং চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে**। কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত রাখার উদ্দেশ্য হলো সরকারের প্রধান নির্বাহীর সহিত সংযোগের প্রতীক বজায় রাখা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ত্বরান্বিত করা। তা ছাড়া এর ফলে সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের আগ্রহ (commitment) প্রকাশ পাবে।

৪। কমিশনের গঠন

কমিশনের প্রধান হিসাবে একজন পূর্ণমন্ত্রী বা পূর্ণমন্ত্রীর পদমর্যদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য সংখ্যা হবে সদস্য-সচিবসহ মোট তিন (৩) জন। উচ্চ শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং সরকারী চাকুরীর (public service) সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন এ রকম সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। সরকারের একজন সচিব সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন। পদাধিকার বলে ছয় জন সদস্য থাকতে পারেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ সংসদ সদস্য, এনজিও, ব্যক্তিখাত, একাডেমিয়া (academia), প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সমাজ থেকে নিয়োগ করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান ব্যতীত সদস্যগনের সংখ্যা ষোল (১৬) জনের অধিক হবে না - তিন (৩) জন পূর্ণকালীন (সদস্য-সচিবসহ) এবং তের (১৩) জন খন্ডকালীন *(কমিশনের গঠন তালিকা ও প্রাতিষ্ঠানিক চার্ট সংযুক্ত - সংযুক্তি - ১০.১ ও ১০.২)*।

৫। কমিশনের প্রধান

উচ্চ শিক্ষিত, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম, প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সম্মানিত একজন ব্যক্তিত্ব কমিশনের প্রধান হবেন এবং তিনি একজন পূর্ণমন্ত্রী বা পূর্ণমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন হবেন। কারণ সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের জন্য এবং সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংস্কারের সমন্বয় রাখার লক্ষ্যে কমিশনে একজন পূর্ণমন্ত্রী বা পূর্ণমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে থাকা প্রয়োজন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যদের চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে।

৬। লক্ষ্য

প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নতুন জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা (New Public Management) প্রবর্তনে ও সকল স্তরের সরকারী সংস্থাসমূহের (public agencies) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৭। উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীর ফলাফল অর্জনে একটি দক্ষ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। কমিশনের মূল কাজ হবে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান, বাস্তবায়ন মনিটরিং (monitoring), সংস্কার অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং ফলাফল নির্ণয় করা। তাছাড়া সংস্কার কর্মসূচী চালিয়ে নেয়ার প্রয়োজনের জন্য সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা। প্রণীত সুপারিশ বাস্তবায়নকালে কোন সংশোধনী প্রয়োজন পরলে, তা সংশোধনের দায়িত্ব পালন করা। নিম্নে কমিশনের কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে দেয়া হ'ল ঃ

১) সংস্কার প্রক্রিয়ায় মন্ত্রনালয়/বিভাগকে সরাসরি সহায়তা করা

২) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা

৩) সুপারিশ বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা বা অসুবিধা উদ্ভুত হলে, তা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা

৪) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত সংস্কার প্রক্রিয়ায় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা

৫) বাস্তবায়নকালে সুপারিশের কোন অংশ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা সম্পাদন করা

৬) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য যথাযথ, প্রতিনিধিত্বমূলক ও সৌহার্দ্যপূর্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা

৭) প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও জনবল সুষমকরনের চলতি ধারা চালু রাখা

৮) সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ প্রনয়নে সহায়তা করা

৯) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা

১০) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন সময় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (periodic evaluation exercise) পরিচালনা করা এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা

১১) সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি নির্নয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা (review) পরিচালনা করা এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা

১২) সংস্কার বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা এবং ফলাফল নির্নয় করা

১৩) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ন অন্যান্য সকল প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করা

৮। কার্যক্রম পদ্ধতি

যে সংস্থার সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে, কমিশন সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে দুঞ্জন মধ্য পর্যায়ের অফিসারকে প্রেষনে কমিশনে নিয়ে আসবে। কোন দপ্তর ও পরিদপ্তরের ক্ষেত্রে এ দুঞ্জন অফিসারের একজন মন্ত্রনালয় থেকে ও আরেকজন দপ্তর/পরিদপ্তর হতে নিয়ে কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত রাখা হবে। প্যারা ৯ -এ উল্লেখিত কোর গ্রুপের সদস্যগন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থার সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করবেন। কাজ শেষে উক্ত দুঞ্জন কর্মকর্তা তাদের স্ব স্ব অফিসে ফেরত যাবেন।

৯। কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সদস্যগন ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী থাকবে যারা কমিশনে কাজ করবে।

জনবল ঃ কমিশনে ৬ (ছয়) জন উচ্চ শিক্ষিত, উদ্যোগী, দক্ষ এবং প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে অভিজ্ঞ মাঝ পর্যায়ের অফিসার 'কোর গ্রুপ' হিসাবে বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা থেকে আগত/সম্পৃক্ত অফিসারদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করবে। এ সকল 'প্রসেস ফেসিলিটেটর' প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে সম্পৃক্ত দু'জন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন। কোর গ্রুপের অফিসারগন সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষনে প্রসেস ফেসিলিটেটর হিসেবে কাজ করবে।

১০। আর্থিক ক্ষমতা

বর্তমান কমিশনের ন্যায় এস আর ও -এর মাধ্যমে একটি রিজলিউশন দ্বারা অথবা আইনের মাধ্যমে কমিশনের সদস্য-সচিবকে সকল আর্থিক, জনবল ও সম্পদ ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন সচিবের অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। কমিশন নিজেই নিজের বাজেট প্রস্তুত করবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী তা খরচ করতে পারবে।

১১। কমিশনের মেয়াদ

কমিশনের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। এর পর উক্ত সময়ে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে চুড়ান্ত মেয়াদ নির্ধারন করা যেতে পারে।

১২। কমিশনের অর্থায়ন

বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত জনবলের বেতন ভাতাদিসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবে। প্রেষণে নিযুক্ত/সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বেতন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা বহন করবে। বর্তমান কমিশনের কারিগরী প্রকল্পের ন্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে দাতা সংস্থাগুলোর নিকট থেকে এ প্রতিষ্ঠান কারিগরী সাহায্য গ্রহন করতে পারবে।

১৩। কমিশনের কার্যপদ্ধতি

ক) যেহেতু কমিশন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তাকারী ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিংকারী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করবে, সেহেতু কমিশন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন সর্ম্পকীয় সকল প্রতিবেদন পরীক্ষা- নিরীক্ষা করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তি তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে;

খ) মন্ত্রনালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তরসহ ও অন্যান্য সকল সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারী অর্থে পরিচালিত এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিখাতের যে কোন প্রতিষ্ঠান হতে তার জনবল, কর্মপরিধি, বিধি, প্রক্রিয়া সংস্কার সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি চাইতে পারবে এবং উক্তরূপ সকল প্রতিষ্ঠান কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদা মোতাবেক সকল দলিল ও তথ্যাদি সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে;

গ) উপরোক্ত (খ) এ উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে আলোচনার জন্য কমিশন যে কোন সময় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে এবং উক্তরূপ কর্মকর্তাগণ কমিশনের আমন্ত্রণে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন;

ঘ) সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও, মহিলা সংস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি, একাডেমিয়া, পেশাজীবি ও সর্বস্তরের নাগরিকের সাথে পরামর্শক্রমে চিঠিপত্র, প্রশ্নমালা, সেমিনার, উন্মুক্ত আলোচনা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কার বাস্তাবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর মতামত গ্রহণ করতে পারবে;

ঙ) কমিশনের কার্যাবলী শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কারিগরী প্রকল্পের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ করতে পারবে;

চ) আইন কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও ব্যয়বরাদ্দ সংক্রান্ত সংস্কার কর্মসূচী (RIBEC), স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন খাতে সংস্কার বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী ইত্যাদিসহ কার্যপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও কাজের সমন্বয় করতে পারবে;

ছ) কমিশনের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে;

জ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনে বা জটিলতা দূরীকরনার্থে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে;

ঝ) কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

১৪। রিপোর্ট পেশ

সংস্কার কর্মসূচীর অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশন প্রধানমন্ত্রীর নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। তবে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর্যায় বা অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তা বৎসরের যে কোন সময় করতে পারবে।

প্রস্তাবিত কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের গঠন তালিকা

চেয়ারম্যান ঃ ১ (এক) জন

পূর্ণকালীন সদস্য ঃ ৩ (তিন) জন

খন্ডকালীন সদস্য ঃ ১৩ (তের) জন

পদাধিকার বলে

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব

৩। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি)

৪। অর্থ সচিব

৫। সংস্থাপন সচিব

৬। রেক্টর, বিপিএটিসি

প্রতিনিধিত্বকারী

১। পার্লামেন্ট সদস্য ঃ ২ (দুই) জন (একজন সরকারী দল এবং অন্য জন বিরোধী দলের হতে পারে)

২। বেসরকারী খাত ঃ ১ (এক) জন

৩। এনজিও ঃ ১ (এক) জন

৪। শিক্ষা/গবেষনা ঃ ১ (এক) জন

৫। সিভিল সমাজ ঃ ১ (এক) জন

৬। মহিলা প্রতিনিধি ঃ ১ (এক) জন

জনপ্রশাসন সংস্কার মনিটরিং কমিশনের চার্ট

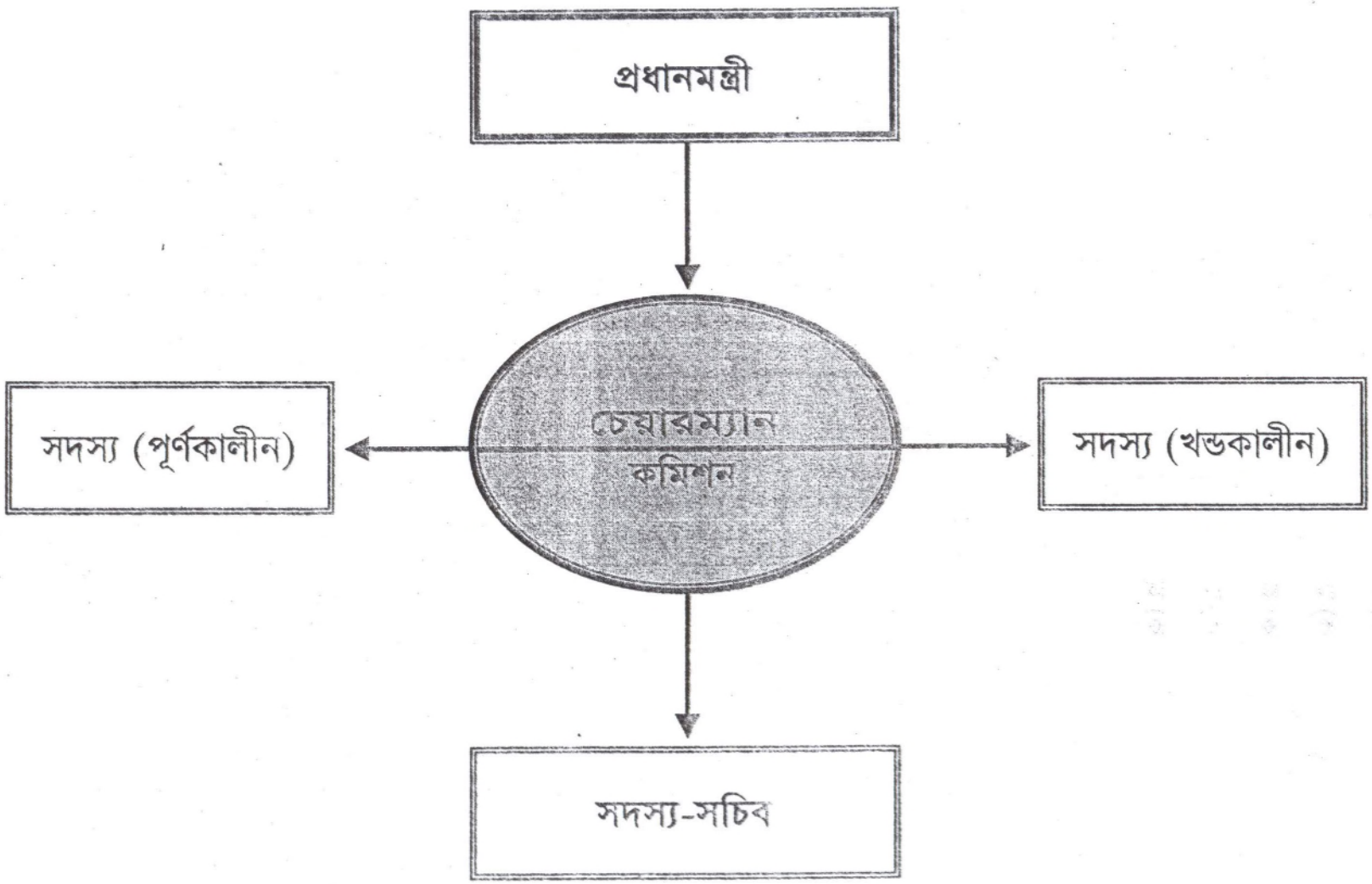

LIST OF REFERENCES

1. Ahmed, S.G., *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka 1986.
2. Aziz, U.M., *Board of Investment: An Overview and Reform Prescriptions*, Monograph BPATC, Savar, Dhaka, 1998.
3. Centre for Policy Dialogue, *Crisis in Governance,* Dhaka: UPL, 1997.
4. Chaudhury, M.A., *Civil Service in Pakistan*, Dhaka: NIPA, 1963.
5. Chawdhury, N.N. and Rahman, M.H., *Bangladesh Institutional Review*, 1999.
6. Chowdhury, M.N., *Public Administration in Bangladesh: Institutional Reorganisation and Manpower Rationalisation,* [paper presented at the International Conference on Administrative Reforms for Development of Bangladesh (organised by PARC)], Dhaka, 14-16 March 1999.
7. Department of Constitutional Development, South Africa, *Guidelines for a Local Economic Regeneration Study,* Pretoria, 1999.
8. Goodnow, H.F., *Civil Service of Pakistan: Bureaucracy in New Nation*, Karachi, Oxford University Press.
9. Government of Bangladesh, *Constitution of the People's Republic of Bangladesh,* 1972.
10. Government of Bangladesh, *Industrial Policy,* Dhaka, 1999.
11. Government of Bangladesh, *Local Government (Gram Parishad) Act 1997,* Dhaka, 1997.
12. Government of Bangladesh, *Local Government (Union Parishad) (Amendment Act 1993,* Dhaka, 1983.
13. Government of Bangladesh, *Local Government (Union Parishad) (Amendment) Act 1997,* Dhaka, 1997.
14. Government of Bangladesh, *Local Government (Union Parishad) Ordinance 1983,* Dhaka, 1983.
15. Government of Bangladesh, *Matin Committee Report*, Dhaka, 1989.
16. Government of Bangladesh, *Oli Ahmed Committee Report*, Dhaka, 1995.
17. Government of Bangladesh, *Pay and Services Commission*, Dhaka, 1976.
18. Government of Bangladesh, *Policy Research: A Review of Administrative Reforms With Women's Development (WID) Implications*, PLAGE, Ministry of Women and Children Affairs, Dhaka, 2000.
19. Government of Bangladesh, *Public Administration Efficiency Study*, Ministry of Establishment, Dhaka, 1989.
20. Government of Bangladesh, *Report of Administrative Reorganisation Committee Letter of Transmittal*, Dhaka, 1996.

21. Government of Bangladesh, *Report of the Administrative and Service Reorganisation Committee*, Dhaka, 1973.

22. Government of Bangladesh, *Rules of Business 1996*, Dhaka, 1996.

23. Government of Bangladesh, *Strengthening Public Administration Training in Bangladesh*, Ministry of Establishment, The Commonwealth Secretariat, 1998.

24. Government of Bangladesh, *Towards Better Government in Bangladesh*, Dhaka, 1993.

25. Government of Bangladesh, *Upazila Parishad Act 1998*, Dhaka, 1998.

26. Hoque, Shamsul A.N., *Administrative Reforms in Pakistan*, Dhaka: NIPA, 1970.

27. Khan M.M., *Reorganisation of Government Offices and Autonomous Bodies for Decentralisation in Bangladesh* [paper presented at the International Conference on Administrative Reforms for Development of Bangladesh (organised by PARC)], Dhaka, 14-16 March 1999.

28. Khan, M.M., *"Reform for Decentralised Development: Bangladesh's Experiment with Major Administrative Reforms/ Reorganisation in the '80s"*, in Khan, MM and Thorp, JP (Ed) Bangladesh: Society Politics and Bureaucracy, Dhaka: Centre for Administrative Studies, 1984.

29. Khan, M.M., *"Reorganisation of Government offices and Autonomous Bodies for Decentralisation in Bangladesh"*, Proceedings of the International Seminar on Administrative Reform for Development of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, 14 - 16 March 1999.

30. Khan, M.M., *Administrative Reforms in Bangladesh*, Dhaka: UPL, 1998.

31. Maheshwari, S.R., *Administrative Reforms in India*, New Delhi, 1981.

32. Makharita R., *Mission Report*, PARC, 1999.

33. Ministry of Establishment, *Public Administration Efficiency Study*, (funded by the USAID), Dhaka, 1989.

34. Nigro, F. and Nigro, L.G., *Modern Public Administration*, NY: Harper and ROW Publishers Ltd., 1997.

35. Obaidullah, ATM., *Bangladesh Public Administration: Study of Major Reforms*, Constraints, and Strategies, Dhaka: Academic Press and Publishers Ltd, 1999.

36. Rab, Abdur, *Regulatory Constraints to Industrial Development in Bangladesh and Recent Deregulations*, Project Report, Ministry of Industries (GOB) and USAID, Dhaka, 1994.

37. The World Bank and Bangladesh Centre for Advanced Studies, *Bangladesh 2020: A Long Run Perspective Study*, Dhaka: UPL, 1998.

38. The World Bank, *Government That Works: Reforming the Public Sector*, Dhaka: UPL, 1996.

39. UNDP, *Reform on the Public Administration Sector Study in Bangladesh*, 1993.

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-২০৫১(কম-সি)—১০০ বই, ২০০৭।